তারীখে মিল্লাত (২য় খণ্ড)

খেলাফতে বনু উমাইয়্যা

[তথ্যনির্ভর কিতাবাদির আলোকে
খোলাফায়ে বনু উমাইয়্যার গ্রহনযোগ্য ইতিহাস]

মূল
কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
এম,এম

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শায়খুল হাদীস
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মীরপুর, ঢাকা।

আল কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ঢাকা ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন -৭১৬ ৫৪৭৭ মোবাইল ০১৭১৬৮৫৭৭২২

e-ilm.weebly.com

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
বাসা নং ২১৭, ব্লক ত
মীরপুর - ১২, পল্লবী, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৭ ইং

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ২০০টাকা মাত্র।

কম্পোজ
আলকাউসার কম্পিউটারস

প্রিন্টিং ঃ
মেসার্স জননী প্রিন্টার্স

e-ilm.weebly.com

সূচীপত্র

হযরত আমীর মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযি.

রাজনৈতিক দল ----------১০
খারিজী সম্প্রদায় ----------১১
যিয়াদ ইবনে আবীহি ----------১৩
কুফার গভর্নরী লাভ ----------১৭
হুজর বিন আদীকে হত্যা ----------১৭
যিয়াদের মৃত্যু ----------২০
মুগীরা ইবনে শো'বা ----------২০
উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ----------২৩
মিশরের গভর্নরী ----------২৪
হিজাজের গভর্নর ----------২৪
বিজয় ----------২৫
কনসটান্টিনোপল আক্রমণ ----------২৬
আফ্রিকা বিজয় ----------২৭
ইয়াযিদের মনোনয়ন ----------২৮
আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যুঃ ----------৩৪
একটি জরুরী কথা ----------৩৬
মু'আবিয়ার পরিবার ---------- ৪০
মু'আবিয়া রাযি. এর চরিত্র ---------- ৪০
শাসন ব্যবস্থা ---------- ৪১
জীবন যাপনঃ ---------- ৪২
ইয়াযিদের বাই'আত অনুষ্ঠান ---------- ৪৩
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা---------- ৪৫

প্রথম ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া
(৬০ হিঃ - ৬৪ হিঃ)

খিলাফত লাভঃ ----------৪৬
ইমাম হুসাইন ও ইবনে যুবায়ের রাযি. -------৪৭
এর ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণে অস্বীকৃতিঃ ------ ৪৭
হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর
মক্কা অভিমুখে যাত্রাঃ----------৪৮
মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা॥----------৪৯
কুফা থেকে আহবান পত্র ----------৪৯
হযরত মুসলিম ইবনে আকীল রাযি. এর কুফা গমন ৫০
উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কুফা গমন ----------৫১
হানীর গৃহে মুসলিম ----------৫২
হানীর গ্রেফতার ----------৫২
শাহী মহল অবরোধ ----------৫২
মুসলিমের গ্রেফতার ও শাহাদাত লাভ ----------৫২
ইমাম হুসাইন রাযি. এর কুফা গমনে দৃঢ় প্রত্যয় - ৫৪
ও শুভাকাংখীদের উপদেশ----------৫৪
ইমাম হুসাইন রাযি. এর কুফা অভিমুখে যাত্রা ---- ৫৫
প্রতিবন্ধকতা---------- ৫৬
কারবালায় অবস্থান ---------- ৫৮
পানি বন্ধ করে দেওয়া ---------- ৫৯
যুদ্ধের তাকিদ ---------- ৫৯
শাহাদাতের সকাল ---------- ৬১
হযরত হুসাইন রাযি. এর পদতলে হুর ইবনে ইয়াযিদঃ ৬৩
হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদত লাভ ----------৬৩
আহলে বাইতের কাফিলার সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা ঃ৬৫
আহলে বাইতের মদীনায় প্রত্যাবর্তন ---------- ৬৬
হুসাইন রাযি. ও ইয়াযিদ ---------- ৬৭
হাররার ঘটনা ----------৬৯
মক্কা অবরোধ ---------- ৭৩
বিজয় ----------৭৪
আফ্রিকা বিজয় ---------- ৭৪

e-ilm.weebly.com

খোরাসান বিজয় ----------৭৬
সিজিস্তান বিজয় ---------- ৭৬
ইয়াযিদের মৃত্যু ---------- ৭৬
ইয়াযিদের সন্তান ---------- ৭৬
দ্বিতীয় মু'আবিয়া ---------- ৭৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি.

(৬৪ হিঃ --৬৫ হিঃ) ৭৯

ইরাক ----------৮০
সিরিয়া ----------৮১
দামেশকের জামে মসজিদে শোরগোল --------৮২
জাবিয়ার সম্মেলন ও মারওয়ানের মনোনয়ন ----৮২
মারজে রাহাতের যুদ্ধ ----------৮৩
মারওয়ানের মিশর দখল ----------৮৩
মারয়ানের মৃত্যু ---------- ৮৩
মারওয়ানের পরিচিতি ----------

আবুদল মালেক বিন মারওয়ান

(৬৫ হিঃ -৮৬ হিঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.

(৬৪ হিঃ - ৭৩ হিঃ)

তাওয়াবীনদের উত্থান ----------৮৫
মুখতার সাকাফীর উত্থান----------৮৬
মুখতারের কুফা দখল ----------৮৮
মুহাম্মদ বিন হানীফাকে গ্রেফতার ঃ ----------৯০
ইবনে যিয়াদকে হত্যা ----------৯১
মুখতারের সাথে আরববাসীদের বৈরীতা ------- ৯২
হযরত আলী রাযি. এর আসন ---------- ৯২
মুস্'আব ও মুখ্তারের মুকাবিলা ---------- ৯৩
আবদুল মালিকের ইরাক আক্রমণ ---------- ৯৫
মক্কা অবরোধ ---------- ৯৬
হাজ্জাজের ইরাক গমন---------- ৯৮
ইবনে জারুদের উত্থান ----------১০০
রাতবীলের বিদ্রোহ ----------১০১
ইবনে আশআসের উত্থান ----------১০২
তাসতারের যুদ্ধ ----------১০৩
জাবিয়ার যুদ্ধ----------১০৪
দীরে জমাজিমের যুদ্ধ ----------১০৪
শা'বী ও আ'শা ----------১০৫
ইবনে আশআসের মৃত্যু ----------১০৬
খারেজিদের উত্থান----------১০৭
আযরাকিয়াদের উত্থান----------১০৮
মুহাল্লাবকে সংবর্ধনা ----------১১৩
কাতারীর হত্যা ----------১১৪
সালেহ ও শাবীবের গণ্ডগোল ----------১১৪
পূর্বাঞ্চল বিজয় ----------১১৮
মুহাল্লাবের মৃত্যু ----------১১৯
মুহাল্লাবের বংশধরের অপসারণ ----------১২০
আফ্রিকা বিজয় ----------১২১
উত্তরাঞ্চল বিজয় ----------১২৪
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ----------১২৪
আবদুল মালিকের মৃত্যু ----------১২৫
আবদুল মালিকের উত্তরসূরী ----------১২৬
আবদুল মালিকের চরিত্র ----------১২৬
কাবাগৃহ পনঃ নির্মানঃ ----------১২৮
ইসলামী মুদ্রার প্রচলন ----------১২৯
প্রথম ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক ----------১৩০
বিজয় ----------১৩০
মুহাম্মদ বিন কাশেম ----------১৩০
দেবল বিজয় ----------১৩২
মূলতান বিজয় ----------১৩৪

e-ilm.weebly.com

কুতাইবা ইবনে মুসলিম ঃ ----------১৩৫
বুখারা বিজয় ----------১৩৭
নিযাকের বিদ্রোহ ও হত্যা ----------১৩৮
সমরকন্দ বিজয় ----------১৩৯
চীন আক্রমন ও খাকানের সাথে সন্ধি স্থাপন --১৪১
মূসা বিন নাসাইর ----------১৪২
কায়রোয়ানের দরবারে জুলিয়ান ঃ ----------১৪৫
তারিকের স্পেন অভিমুখে যাত্রা ---------- ১৪৬
সামনে অগ্রযাত্রা ---------- ১৪৯
কর্ডোভা বিজয় ---------- ১৪৯
মারসিয়া বিজয় ---------- ১৫০
টলোডো বিজয় ---------- ১৫১
মূসার স্পেন আগমন ---------- ১৫২
কারমুনা বিজয় ---------- ১৫২
আশবেলীয়া বিজয় ---------- ১৫২
মেরিডা বিজয় ---------- ১৫২
আশবেলিয়ার বিদ্রাহ ---------- ১৫৩
মূসা ও তারিকের সাক্ষাত ---------- ১৫৩
স্পেনের অবশিষ্টাংশ বিজয় ---------- ১৫৪
ইউরোপ বিজয়ের এক রঙ্গিন চিত্র ---------- ১৫৪
স্পেন থেকে মূসার প্রত্যাবর্তন ---------- ১৫৪
মাসলামা বিন আবদুল মালেক ---------- ১৫৬
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ---------- ১৫৬
হাজ্জাজের মৃত্যু ---------- ১৫৬
ওয়ালীদের মৃত্যু ---------- ১৫৮
ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের চরিত্র ----- ১৫৮

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক
(৯৬ হিঃ –৯৯ হিঃ)

মুহাম্মদ বিন কাশেমকে হত্যা ----------১৬১
কুতাইবা বিন মুসলিমকে হত্যা ---------- ১৬১
মূসা বিন নুসাইরের মৃত্যু ---------- ১৬২
বিজয় ---------- ১৬৩
কোহিস্তান ও জুরজান বিজয় ---------- ১৬৩
কনস্টান্টিনোপল বিজয় ---------- ১৬৪
খেলাফত লাভ---------- ১৬৫
সুলাইমানের মৃত্যু ---------- ১৬৬
সুলাইমানের চরিত্র ---------- ১৬৬
তিন নেতার বিষয় ---------- ১৬৭
হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ.--------- ১৬৯
খিলাফতের বাই'আত অনুষ্ঠান ----------১৭০
শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন ----------১৭১
শাসন কর্তাদের জবাবহীতা---------- ১৭২
ফাদাক দখল মুক্ত করে দেওয়া----------১৭৪
জায়গীর সমূহ ফেরৎ দান ----------১৭৫
হযরত আলী রাযি.কে গালাগালি করা বন্ধ ঘোষণা ১৭৫
আভ্যন্তরীণ ও খারিজিদের বিদ্রোহ---------- ১৭৬
ওফাত ---------- ১৭৮
হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের চরিত্র ------ ১৭৮

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক
১০১ হিঃ-১০৫ হিঃ ১৮৩

মুহাল্লাব পরিবারের বিদ্রাহ ও তাদের ধ্বংস ----- ১৮৫
সাগাদের পতন ---------- ১৮৬
খাযারের পতন ---------- ১৮৭
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ---------- ১৮৭
ইয়াযিদের মৃত্যু ----------

হিশাম বিন আবদুল মালিক
(১০৫ হিঃ –১২৫ হিঃ)

ইরাক ও খোরাসানে বিদ্রোহ ----------১৮৮
মুসলিম বিন সাঈদ ----------১৮৮
আসাদ বিন আবদুল্লাহ----------১৮৯

e-ilm.weebly.com

আশরাস ----------১৯০
কামরাজার ঘটনা ----------১৯১
জুনাইদ বিন আবদুর রহামন ----------১৯১
শোবের ঘটনা ---------- ১৯১
আসেম বিন আবদুল্লাহ---------- ১৯৩
হারেছ বিন সুরাইজের বিদ্রোহ---------- ১৯৩
আসাদ বিন আবদুল্লাহ কাসারী ----------১৯৪
খাকানকে হত্যা ----------১৯৪
নছর বিন সায়্যার ---------- ১৯৫
কুরসুলকে হত্যা---------- ১৯৫
আমোনিয়া ও আজারবাইজান ---------- ১৯৬
এশিয়া ছোট---------- ১৯৮
হযরত যায়েদ বিন আলী রাযি. এর শাহাদত ১৯৯
আব্বাসীদের আহবান ---------- ২০১
উত্তারাধিকারী মনোনয়ন ---------- ২০৩
হিশামের মৃত্যু ---------- ২০৩
হিশাম বিন আবদুল মালিকের চরিত্র ------- ২০৪

দ্বিতীয় ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক

১২৫ হিঃ—১২৬ হিঃ

ইয়াহইয়া বিন যায়েদের উত্থান ও শাহাদত লাভ ২০৮
ইয়াযিদের বিদ্রোহ ---------- ২০৮
ওয়ালীদকে হত্যা ----------

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক, ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

(১২৬ হিঃ —১২৭ হিঃ।)

সাধারণ বিদ্রোহ ----------২০৯
ইরাক ও খোরাসানে বিদ্রোহ ----------২১০
ইয়াজিদ বিন ওয়ালীদের মৃত্যু ----------২১১
ইবরাহীমের মনোনয়ন ও ক্ষমতাচ্যুত --------২১১

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান

১২৭ হিঃ—১৩২ হিঃ

আবদুল্লাহ বিন মু'আবিয়ার উত্থান ---------- ২১২
সিরিয়ার বিদ্রোহ ঃ ---------- ২১২
সুলাইমান বিন হিশামের বিদ্রাহ ----------২১৩
ইরাকে খারিজীদের উত্থান ---------- ২১৩
ইয়ামান ও হিজাজে খারিজীদের উত্থান --------- ২১৫
খোরাসানে পূর্ব শত্রুতার উত্থান ----------২১৬
আবু মুসলিম খোরাসানী ---------- ২১৬
আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রকাশ্য আহবান -------
আরব গোত্র সমূহের ঐক্য ও মতবিরোধ ------- ২১৮
আবু মুসলিমের মার্ভ দখল ---------- ২১৮
খোরাসান ও ইরাক দখল ---------- ২১৯
মারওয়ানের অক্ষমতা ---------- ২১৯
ইরাক দখল ---------- ২২০
আব্বাসী খলিফার সিংহাসনে আরোহন -------- ২২০
ভাগ্য নির্ধারনী যুদ্ধ ---------- ২২০
মারওয়ানের পলায়ন ও হত্যা ---------- ২২১

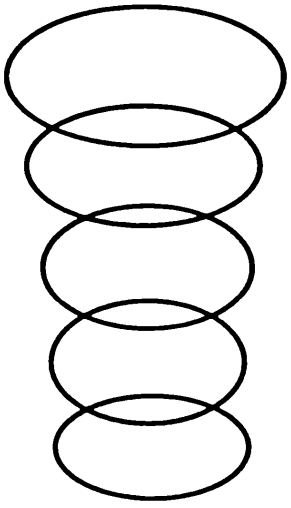

e-ilm.weebly.com

উমাইয়াদের বংশ তালিকা

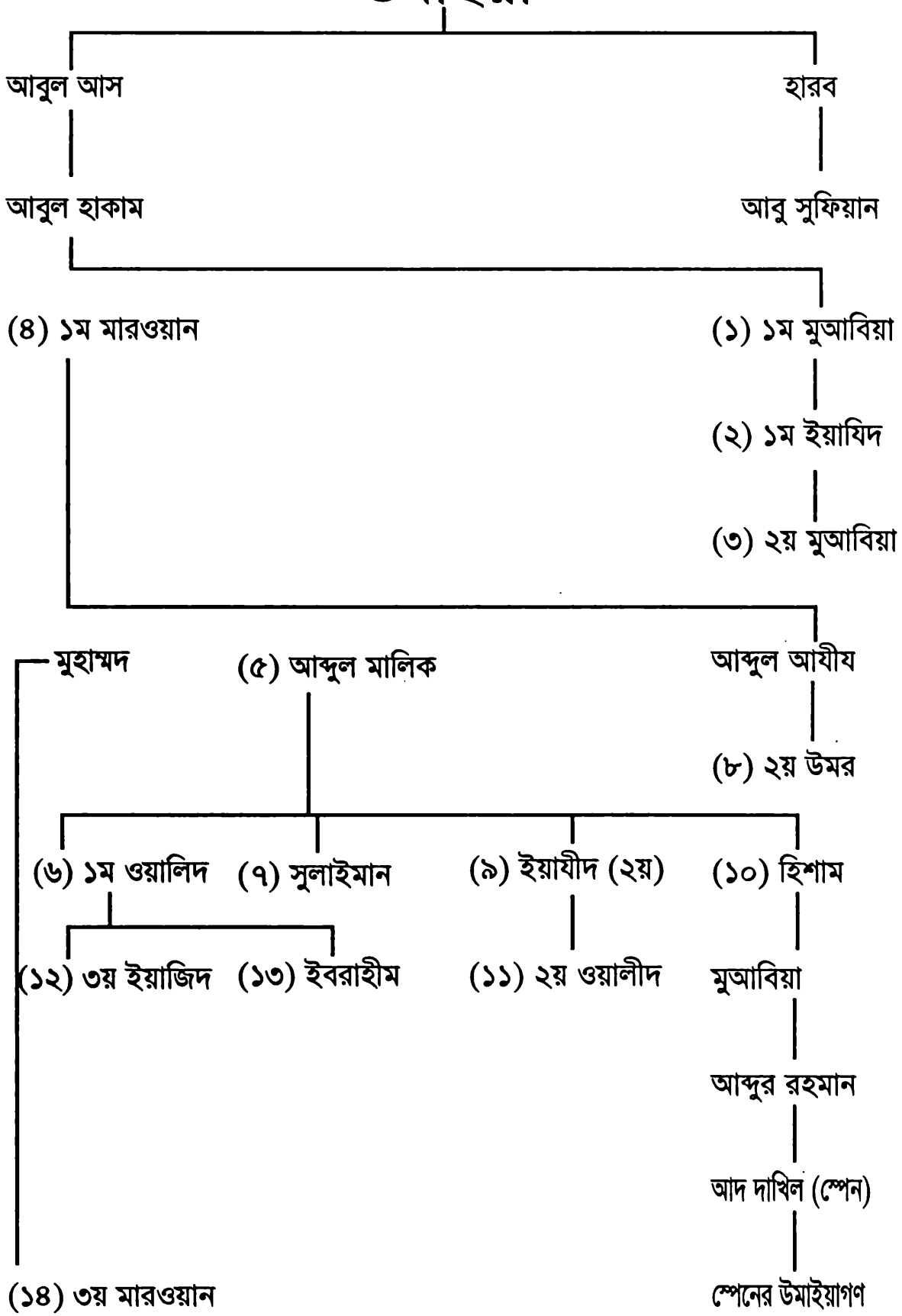

e-ilm.weebly.com

e-ilm.weebly.com

হযরত আমীর মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযি.
(৪১ হিঃ—৫৯ হিঃ)

উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আমীরে মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযি.। তিনি কুরাইশ গোত্রের শাখা বনি উমাইয়ার বংশধর। তাঁর বংশধারা নিম্নরূপ। হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযি. ইবনে হার্‌ব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আব্‌দে মানাফ। এভাবে আবদে মানাফ পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর বংশধারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হয়েছে।

তিনি হিযরতের পনের বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কাবিজয়ের সময় ২৩ বছর বয়সে নিজের অন্যান্য বংশধরদের সাথে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আমীর মু'আবিয়া রাযি. শিক্ষিত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেধা ও যোগ্যতা দেখে তাঁকে ওহী লেখকদের অন্তর্ভূক্ত করেন। মক্কার আশ পাশ থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আগত প্রতিনিধি দলের আপ্যায়নের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল।

ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর রাযি. এর খিলাফতকালে ইসলামী বাহিনী যখন সিরীয়া অভিমুখে যাত্রা করে, তখন তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ানের অধীনে দামেশকে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তখন হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. কে তাঁর ভ্রাতার সাহায্যার্থে প্রেরিত বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সিরিয়ার উপকূলীয় শহর যথা সাইদা, আরফা, হাবীল ও বৈরুত বিজয়ের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। কায়সারীয়া বিজয়ের মুকুটধারীও ছিলেন তিনি। উক্ত যুদ্ধে আশি হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়।

পরবর্তীকালে হযরত উমর রাযি. তাঁর অনবদ্য কীর্তিতে খুশি হয়ে তাঁকে জর্ডানের গভর্নর মনোনীত করেন। আসওয়াছ মহামারিতে ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ান রাযি. এর ওফাত হয়ে যায়। এরপর তার স্থানে হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. কে দামশকের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সাথে জর্ডানের গভর্নরের দায়িত্বও বহাল থাকে।

হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে তাঁকে পুরো সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। অধীনস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল। ৩৫ হিজরীতে হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর হযরত আলী রাযি. মুসলিম জাহানের খলীফা মনোনীত হন। তিনি হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. কে সিরিয়ার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। কিন্তু হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. হযরত আলী রাযি. কে খলীফা হিসেবে সমর্থন করতে অস্বীকার করেন। অধিকন্তু তিনি হযরত আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে হযরত উসমান রাযি. এর

e-ilm.weebly.com

ঘাতকদের সহায়তা দানের অভিযোগ উত্থাপন করেন। সিরিয়াবাসীগণ হযরত উসমান রাযি. এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীতে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। সিফফীন নামক স্থানে হযরত আলী রাযি. ও হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অবশেষে দুটি শর্তে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করা হয়। প্রথমতঃ উভয় পক্ষ থেকে দু'জন সালিশ মনোনীত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ তারা উভয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা মেনে নেওয়া হবে। পরে উভয় শালিশ এ বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয় যে, হযরত আলী রাযি. এবং হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে অপসারণ করে দেওয়া হবে। আর খলীফা মনোনয়নের দায়িত্ব উম্মাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিরিয়াবাসীগ হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে আর ইরাকবাসীগণ হযরত আলী রাযি. কে পৃথকভাবে খলীফা মনোনীত করে। উভয় বুযুর্গের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ৪০ হিজরীতে জনৈক খারিজির তরবারীর আঘাতে হযরত আলী রাযি. শাহাদাত বরণ করেন। ৪০ হিজরীর সূচনা লগ্নে হযরত হাসান রাযি. খিলাফতের দাবী ছেড়ে স্বীয় আত্মত্যাগের অপূর্ব উদাহরণের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানেন। এ বছরকে "আমুল জামাত" বা "ঐক্যের বছর" বলা হয়। এ বছর থেকেই হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর একক খিলাফতের সূচনা হয়।

রাজনৈতিক দল

হযরত মু'আবিয়া রাযি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় রাজনীতির ময়দানে তিনটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল।

(১) বনী উমাইয়াদের সমর্থকঃ তারা ছিলেন সেসব লোক, যারা প্রথম থেকে হযরত উসমান রাযি. এর খুনের দাবী উত্থাপন করেছিল। তারা হযরত আলী রাযি.কে হযরত উসমান রাযি. এর হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করে তাঁর খিলাফত অবৈধ ঘোষণা করে এবং হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে হযরত উসমান রাযি. এর পরবর্তী প্রতিনিধি হিসেবে খলীফা মেনে নেয়। তারা সকলে সিরিয়াবাসী ও অন্যান্য শহরের অধিবাসী ছিল।

(২) শিয়ানে আলী ঃ তারা হযরত আলী রাযি. ও তাঁর বংশধরগণ আহলে বাইত নবুওয়াতকে তথা নবী পরিবারে লোক হওয়ায় খিলাফতের অধিকার তাদের জন্যই সংরক্ষিত মনে করত। তারা হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে বৈধ খলীফা বলে স্বীকার করত না। কিন্তু তারা সময়ের প্রতিকূলতার কারণে নিরুপায় হয়ে তাঁকে খলীফা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হযরত মু'আবিয়া রাযি. স্বীয় দূরদর্শিতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে তাদের মন জয় করতে অলসতা করেন নি। তাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক অনারব, ইরাক ও মিশরের অধিবাসী ছিল।

e-ilm.weebly.com

(৩) খারেজী সম্প্রদায় ঃ সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর এদের উদ্ভব হয়। তারা বনী উমাইয়া ও শিয়ানে আলীদেরকে দ্বীন থেকে খারিজ ও হত্যা করা ওয়াজিব মনে করত। যদিও এ দলের লোকজন সংখ্যায় অনেক কম ছিল। কিন্তু তারা স্বীয় আকীদায় ও কর্মে সুদৃঢ় এবং মজবুত ছিল। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জীবন বাজী রেখে প্রতিদ্বন্ধীর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকত। কোন প্রকার সন্ধিচুক্তি, ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসাকে স্থান দিত না। তারা উম্মাতের বড় একটি রাজনৈতিক দল ছিল, যাদের সাথে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মোখোমুখি হতে হয়েছে। একটি বিষয় তাদের মাঝে সমভাবেই ছিল অর্থাৎ তারা সকলে সাহসী ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিল। এমন উম্মাতের মাঝে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার ও রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মাঝে সে যোগ্যতা পুরোপুরি ছিল। তিনি এ সব রাজনৈতিক মতবাদের সাথে বিনয়-নম্রতার পথে এগিয়ে যান। যথাসম্ভব তাদের বিশৃংখলতা ও নৈরাজ্য সহ্য করতেন এবং তাদেরকে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করতেন। তাঁর ধৈর্য্য ও সহনশীলতার নযীর শাসকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

তথাপি তাঁর আপোষমূলক মনোভাব খারিজীদের মুকাবিলায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তারা সর্বদা রাজ্যে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের তরবারী মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতিকে টুকরা টুকরা করার কাজে লিপ্ত ছিল। এ কারণে সর্বপ্রথম তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

খারিজী সম্প্রদায়

আমরা পূর্বে বলে এসেছি, ফারওয়াহ ইবনে নাওফিল আশজাঈ পাঁচশ খারিজীকে সঙ্গে নিয়ে শহর থেকে দূরে চলে যায় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তারা যখন জানতে পারে, হযরত হাসান রাযি. খিলাফতের দাবী ত্যাগ হযরত মু'আবিয়া রাযি. উপর পূর্ণ দায়িত্বভার সোপর্দ করেছেন, তখন তারা বলে উঠল, তরবারী কোষমুক্ত করার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। তাই নিজের সাথীদের সাথে নিয়ে মোকাবেলার জন্য নাখলা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে সিরিয়াগামী একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ফরওয়াহ তাদেরকে পরাজিত করে দেয়। হযরত মু'আবিয়া রাযি.তখন কুফাবাসীদের সম্বোধন করে বলেন, যদি তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাদের দমন করতে না পারো তাহলে আমি তোমাদের নিরাপত্তা দেব না। এ ঘোষণা শোনার পর কুফাবাসীরা ফরওয়ার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়। খারিজীরা কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলল, মু'আবিয়া আমাদের এবং তোমাদের দুশমন নয় কি ? তোমরা আমাদেরকে একাকী তার মোকাবিলা করতে দাও। যদি আমরা তাকে পরাজিত করতে পারি, তাহলে তোমরা তার অত্যাচার নির্যাতন

e-ilm.weebly.com

থেকে বেঁচে যাবে। আর যদি আমরা পরাজিত হয়ে যাই, তাহলে তোমরা আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

কিন্তু কুফাবাসীগণ উক্ত আহবানে সাড়া দেয়নি। তারা খারিজীদের মোকাবিলা করে এবং ফরওয়ারকে বন্দী করে জীবিত কুফায় নিয়ে আসে। তখন খারিজীরা আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাওসাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। সে ছিল তাঈ গোত্রের লোক। কুফাবাসীরা পুনরায় মোকাবিলা করে। ইবনে আবুল হাওসা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়। এ ঘটনা রবিউল মাসে সংঘটিত হয়। ইবনে আবুল হাওসা নিহত হওয়ার পর খারিজীরা পুনরায় সংঘটিত হতে শুরু করে। এবার তারা মুছিরাহ ইবনে ওয়াদ্দাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। মুছিরা একশ পঞ্চাশ জনের একদল নিয়ে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে। ইবনে আবুল হাওসা এর সন্তান ও সঙ্গী-সাথী অতি নগন্য ছিল, তারাও তার সাথে মিলিত হয়।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. কুফায় বসবাসকারী মুছিরার পিতা আবু মুছিরাকে ডেকে এনে বলেন, তুমি তোমার ছেলেকে বুঝাও। আবু মুছিরা ছেলেকে বাররার বুঝায়। কিন্তু সে পিতার কথা মানতে অস্বীকার করে। আবু মুছিরা বলল, আমি তোমার ছেলেকে তোমার সামনে নিয়ে আসছি। সম্ভবতঃ তার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে দয়া হবে এবং তুমি তোমার মনোভাব পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। মুছিরা বলল, আমি আমার সন্তানকে কোলে রাখার চেয়ে কোন কাফিরের (গায়রে খারিজীর) বর্শার লক্ষ্যস্থল হওয়াকে বেশী পছন্দ করি।

আবু মুছিরা ফিরে এসে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর নিকট নিজ ছেলের অভিমত ব্যক্ত করে। হযরত মুযাবিয়া রাযি. বললেন, তোমার পুত্র তো ভীষণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তখন হযরত মু'আবিয়া রাযি. আব্দুল্লাহ বিন আহমারের নেতৃত্বে দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মুছিরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। স্বয়ং আবু মুছিরাও ঐ বাহিনীতে যোগ দান করে। যুদ্ধ শুরু হলে পিতা পুত্রকে মল্ল যুদ্ধের আহবান জানায়। মুছিরা বলল, আমি ছাড়াও আপনার মোকাবিলা করার জন্য আরো অনেক লোক আছে। তারপর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। খারিজিরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে। যুদ্ধে মুছিরা ও তার অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়। শুধু পঞ্চাশ জন জীবিত ছিল। পরে তারা হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর আনুগত্য স্বীকার করে। এ ঘটনা ৪১ হিজরীর জমদিউল আখেরে সংঘটিত হয়। হযরত মু'আবিয়া রাযি. কুফাতে অবস্থান কালে শাবীব ইবনে বাজারাহ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি ও ইবনে মুলজিম উভয়ে মিলে হযরত আলী রাযি. কে হত্যা করেছি। তৎসঙ্গে তাঁর নিকট পুরস্কার দাবি করে। তার এ আবেদন শুনে হযরত মু'আবিয়া রাযি. তৎক্ষণাত গৃহে প্রবেশ করেন এবং আশজা' গোত্রের লোকদের কাছে খবর পাঠান, তোমরা শাবীবকে এক্ষুণি শহর থেকে বহিষ্কার করে দাও? নতুবা তোমাদের রক্ষা নেই। শাবীব অবস্থা বেগতিক দেখে হত্যা যজ্ঞের

e-ilm.weebly.com

পন্থা অবলম্বন করে। রাত হতে সে তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে যায়। যাকে সামনে দেখে তাকে হত্যা করে ফেলে। অবশেষে যখন মুগীরা ইবনে শো'বা কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন, তখন তিনি খালিদ বিন আরফাতার নেতৃত্বে একশত সৈন্যের এক বাহিরী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর হাতে শাবীব ও তার সংগী সাথী সকলে নিহত হয়।

মোটকথা, এভাবে খারিজী দল বিভিন্ন সময় অব্যাহত বিশৃংখলা নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। আর ইরাকের পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অশান্ত করে তোলে। তখন হযরত মু'আবিয়া রাযি. চিন্তা করেন, ইরাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে হলে দূরদর্শি লোকের প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি পড়ে যিয়াদ বিন সুমাইয়াহ ও মুগীরা বিন শোবার ওপর। তাঁরা উভয়েই দূরদর্শি রাজনীতিবিদ।

যিয়াদ ইবনে আবীহি

যিয়াদ ইবনে আবিহী ছিল শিয়ানে আলীর দলভূক্ত এবং তাদের পক্ষ থেকে পারস্যের গভর্নর। হযরত মু'আবিয়া রাযি. পারস্যে তার শাসন ব্যবস্থা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তখন মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে কুফার গভর্নর ছিলেন মুগীরা ইবনে শোবা। তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য যান, তখন তিনি যিয়াদের উপর সন্দেহের কথা প্রকাশ করেন। মুগিরা ইবনে শোবা যিয়াদকে বধ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। এরপর মুগীরা যিয়াদের নিকট গিয়ে তাকে বলেন, হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. খিলাফতের দাবী ত্যাগ করার পর এখন তো খিলাফত হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর হাতে এসে গেছে। তাই তোমার জন্য মঙ্গল হল, তুমি তাঁর সাথে সমঝোতা করে নাও। তিনি নিজেও এ নিয়ে আগ্রহী। সুতরাং তোমার প্রস্তাব পাশ হয়ে যেতে পারে। যিয়াদ মুগীরা ইবনে শোবার প্রস্তাব মেনে নেয়। মুগিরার প্রত্যাবর্তনের পর হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাকে নিরাপত্তা পত্র পাঠিয়ে দেন। যিয়াদ হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর দরবারে এসে হাজির হয়। তিনি তার নিকট পারস্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে চান। যিয়াদ যে হিসাব পেশ করে, হযরত মু'আবিয়া রাযি. তা সঠিক বলে মেনে নেন।

যিয়াদ হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর নিকট কুফায় অবস্থান করার অনুমতি চায়। হযরত মু'আবিয়া রাযি. তার আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু মুগীরা ইবনে শোবার নিকট পত্র প্রেরণ করেন যে, যিয়াদ ও আলীর অন্যান্য অনুসারী যেমন হাজার ইবনে আদী, সোলাইমান ইবনে সামার, শীছ ইবনে রিবঈ এবং ইবনুল কাওয়ারের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এ ঘটনা ৪২ হিজরীর।

৪৪ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া রাযি. যিয়াদকে নিজের ভাই বলে স্বীকৃতি দেন। প্রকৃত রহস্য হল, যিয়াদের মাতা সুমাইয়া ছিল হারছ বিন কালদাহ তাবীব

e-ilm.weebly.com

সাকাফীর দাসী। হারছের ঔরষে সুমাইয়ার দু'পুত্র জন্ম হয়। আবু বকরাহ ও নাফী। তারপর আবী সুফিয়ান সুমাইয়াকে জাহিলীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী (যা ব্যভিচারেরই এক পন্থা ছিল) বিবাহ করে। তার ঔরষেই যিয়াদের জন্ম হয়। কিন্তু যিয়াদের সাথে আবু সুফিয়ানের এ সম্পর্ক গোপন থেকে যায়। তা প্রকাশ হয়নি। ফলে তাকে (ইবনে আবীহি) নিজ পিতার পুত্র বলা হয়।

হযরত উমর রাযি. খিলাফত কালে যিয়াদের উপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। যিয়াদ ঐ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে ফিরে আসে এবং হযরত উমর রাযি. খেদমতে হাজির হয়ে এক বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দান করে। হযরত উমর রাযি. এবং উপস্থিত আনসার-মুহাজির সকলেই তার ভাষণে মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন হযরত আমর বিন আস রাযি. বলল, যদি এ কৃত দাসের পিতা কুরাইশ বংশধর হত, তাহলে সে স্বীয় লাঠির দ্বারা সব আরববাসীদের তাড়িয়ে দিত। তখন আবী সুফিয়ান বলল, আমি জানি তার পিতা কে ? এ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে, আবী সুফিয়ান স্বীয় জীবদ্দশায় যিয়াদকে পুত্র বলে স্বীকৃতি দেয়নি। হযরত মু'আবিয়া রাযি. যিয়াদকে খুশি করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত স্বাক্ষী দ্বারা তাকে নিজের বৈ-মাত্রীয় ভ্রাতা বলে স্বীকৃতি দেন। তথাপি হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর এ স্বীকৃতি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেনি। মূলতঃ সত্য ঘোষণার অধিকার আবু সুফিয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল, আর তা-ও জাহিলিয়াতের যুগে। হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর জন্য সে অধিকার প্রয়োগের হক ছিল না। সুতরাং একবার যিয়াদ হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট এক পত্র প্রেরণ করে। উক্ত পত্রের শুরুতে সে লিখিত ছিল, "যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে।" তার ধারনা ছিল সম্ভবতঃ হযরত আয়েশা রাযি. তাকে এ নামে সম্বোধন করবেন। আর এটা তার জন্য বিরাট প্রমাণ হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. প্রেরিত পত্রে লেখেন, "সকল মুসলমানের মাতা আয়েশার পক্ষ থেকে পুত্র যিয়াদের নামে।" (১) তারিখে ইবনে আসীর– ৩/১৭৭।

৪৫ হিজরীতে মু'আবিয়া রাযি. যিয়াদকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এখানের অবস্থা সাবেক গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের যুগে শোচনীয় আকার ধারন করে ছিল। তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। কারো প্রতি কঠোরতা আরোপ পছন্দ করতেন না। আর বসরাবাসীগণ স্বভাবতঃ গণ্ডগোল প্রিয় ছিল। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া তাদেরকে দমন করা অসম্ভব ছিল। যিয়াদ রবিউল আউয়ালের শেষ দিন বসরা আগমন করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখতে পায়। সে বসরা আসা মাত্র কুফার জামে মসজিদে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেয়। তার ঐ ভাষণকে 'খুৎবায়ে তাবাররা' বা সংশোধনের ভাষণ নামে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে, তিনি তার ভাষণে হামদ ও ছানা কিছুই পাঠ করেননি। ঐ ভাষণের অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হল–

e-ilm.weebly.com

"চরম অজ্ঞতা ও অন্ধকার পথভ্রষ্টতা ছোট বড় সকলকে ঘিরে আছে। মনে হয় তোমরা যেন আল্লাহ তা'আলার কিতাব দেখনি। আর তাতে আনুগত্যকারীদের জন্য যে মহাপুরস্কারের ঘোষণা ও বিরোধীতাকারীদের জন্য যে কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাঠ করনি। তোমরা ইসলামে নতুন রীতি চালু করেছ। দুর্বলদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলছে। অথচ তোমরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছ না। সমাজের অসহায়-অক্ষম অবলা নারীদের সম্পদ দিন-দুপরে লুণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ তোমরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করছ না। তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই, যারা লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারে? তোমরা আত্মীয়তার কথা ভাব, অথচ দ্বীনের তোয়াক্কা কর না।

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাহলে কৃতদাসের স্থলে মনিবকে, মুসাফিরের স্থানে মুকিমকে, নাফরমানের পরিবর্তে আনুগত্যকারীকে রোগীর বদলে সুস্থ্যদেরকে পাকড়াও করব এবং কঠোর শাস্তি দেব, কারও ঘরে ডাকাতি হলে আমি স্বয়ং মাল আদায় করব। আর যে ব্যক্তি রাতে চলা ফেরা করবে, তাকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হবে। শুধু এতটুকু সময় দেওয়া হচ্ছে, যাতে কুফা থেকে গমনকারী ফিরে আসতে পারে। এরপর আর কোন অভিযোগ শোনা হবে না। আমি কারো মুখ থেকে জাহিলীয়াতের কোন কথা শুনতে চাই না।"

নতুবা তার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তোমরা নতুন অপরাধ ও সন্ত্রাস তৈরী করলে আমিও নতুন শাস্তির বিধান প্রবর্তন করব। তোমরা স্মরণ রেখো! যে কাউকে নিমোজ্জিত করবে তাকেও নিমোজ্জিত করা হবে। যে কাউকে আগুনে পুড়ে মারবে, তাকেও আগুনে পুড়ে মারা হবে। যে কারো গৃহে সিঁধ কাটবে, তার বক্ষাদেশ ছিদ্র করে দেওয়া হবে। যে অন্যের জন্য গর্ত খনন করবে, তাকে জীবিত কবর দেওয়া হবে। তোমরা নিজেদের হাত ও যবানকে আমার থেকে বাঁচিয়ে রাখো, তাহলে আমি আমার হাত ও যবানকে তোমাদের থেকে পৃথক করে রাখব। আমারও কোন কোন জাতির সাথে কিছু শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু আজ আমি তাদেরকে সে শত্রুতা পদতলের পিষ্ট করছি। যদি আমি জানতে পারি, কোন ব্যক্তি আমার সাথে আন্তরিক শত্রুতা পোষণ করার কারণে যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে আমি তার প্রতি হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু তারপরও যদি সে প্রকাশ্যে আমার বিরোধীতা করে তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেব না। তোমরা তোমাদের কাজকর্ম ঠিক করে নাও। আর সদাচারণ করতে শিখে নিজেকে সাহায্য করো। কিছু লোক আছে, যারা আমার আগমনে ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারাও খুশি হয়ে যাবে। আর কিছু লোক আছে, তারা আমার আগমনে খুশি হয়েছে। অবশেষে তারা ব্যথিত ও দুঃখিত হয়ে যাবে।

e-ilm.weebly.com

হে লোক সকল! আমি তোমাদের শাসক এবং তোমাদের সংরক্ষক। তাই তোমাদের একান্ত কর্তব্য হল, আমার আনুগত্য করা এবং আমাকে সাহায্য সহায়তা করা। আর আমার কর্তব্য হল, তোমাদের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করা। সুতরাং তোমরা আমার কল্যাণকামী হয়ে আমার ইনসাফের যোগ্য হয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মত অনেককে আমার এ হাতে নির্মূল করে দিয়েছি, তা তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল, আমাকে ভয় করা। যে আমাকে ভয় করবে তাকে আমি নির্মূল করব না। [১]

যিয়াদ আব্দুল্লাহ ইবনে হিসানকে শহরের পুলিশ প্রধান নিয়েগ করে। ইশার নামায অনেক বিলম্বে পড়া হত। যিয়াদ কোন কারীকে নির্দেশ দিত, সে যেন কিরাতে সূরা বাকরার মত দীর্ঘ সূরা পাঠ করে। তারপর এ পরিমাণ অপেক্ষা করা হত, যাতে লোকজন কুফার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে। অতঃপর যিয়াদ আব্দুল্লাহ ইবনে হিসানকে শহরে টহল দেওয়ার আদেশ দিত। আব্দুল্লাহ ইবনে হিসান শহরে টহল দেওয়ার সময়, যাকে ঘরের বাইরে দেখত, তাকে হত্যা করে ফেলত। একদিন নগর রক্ষক এক বেদুইনকে গ্রেফতার করে তাকে যিয়াদের সামনে হাজির করে। যিয়াদ তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এ ঘোষণা শোননি ? বেদুইন বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো আমার ছাগলের পাল নিয়ে শহরে আসছিলাম। রাস্তায় রাত্রি হয়ে যায়। তাই ছাগলের পাল নিয়ে শহরের এক কোনে রাত কাটানোর জন্য বসে পড়ি। আমীরের আদেশ আমার জানা ছিল না। যিয়াদ বলল– মনে হয় তুমি সত্য কথা বলছ। কিন্তু তোমাকে হত্যার মাধ্যমে উম্মাতের সংশোধন আশা করা যায়। তারপর সে ঐ নিরপরাধ বেদুঈনকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে। যিয়াদের এ নিষ্ঠুর আচরণে কুফায় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা ফিতনা-ফাসাদ থেকে বিরত হয়ে যায়। শহরে শান্তি ও নিরাপত্তার সূচনা হয়। তখন শহরের এমন অবস্থা হয় যে, যদি কারো হাত থেকে কোন কিছু পড়ে যেত তাহলে অপর লোক তা স্পর্শ করত না। যার জিনিস সে এসে তা উঠিয়ে নিত। দোকানদার নিজের দোকান খোলা রেখে বাড়ী চলে যেত। তার দোকানের বিন্দু মাত্র ক্ষতি হত না।

যিয়াদ কঠোরতার সাথে সাথে যথাসম্ভব নমনীয়তার সাথেও কাজ করত। বুহাইনা ইবনে কুরাইশকে জনৈক খারিজীকে গ্রেফতার করার আদেশ করেন। সে বনী সাদ গোত্রের লোক ছিল। বুহাইনা গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে ফেলে। খারিজী বুহাইনার নিকট অযু করার আবেদন করে। বুহাইনা বলল, তুমি যে অযু করে ফিরে আসবে তার নিশ্চয়তা কি? খারিজী বলল, আমি আল্লাহকে জামিনদার বানাচ্ছি। অতঃপর খারিজী তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী অযু করে ফিরে আসে। তাকে যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়। যিয়াদ হামদ না'ত পাঠ করে তিন খলীফার

e-ilm.weebly.com

প্রশংসা বর্ণনা করে। তারপর খারিজীকে সম্বোধন করে বলল, তুমি আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ। তোমার এ কাজ আমাদের অপছন্দ হয়েছে। খারিজীও হামদ ছানা পাঠ করার পর প্রথম দুই খলীফার প্রশংসা করল। তারপর বলল, আপনার স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও পতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত। আপনি স্বয়ং বলেছিলেন, যে আমার সাথে মোকাবেলা করবেন না, আমি তাকে বিরক্ত বা জিজ্ঞাসাবাদ করব না। যিয়াদ নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং খারিজীকে অনেক উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেয়। অনুরূপভাবে যিয়াদের মনে প্রভাবশালী এক খারিজী আবুল খায়ের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যিয়াদ তাকে ডেকে নিয়ে জুন্দিসাবুরের শাসক নিয়োগ করে। মাসিক চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে। আবার বার্ষিক এক লাখ দিরহাম পুরষ্কার নির্ধারণ করে। তখনও সে খারেজী বলত, দলের অন্তর্ভূক্ত থাকা উত্তম কাজ।

আবুল আব্বাস মুবাররাদের মতানুসারে "যিয়াদ ঐ খারিজীকে হত্যা করত যে ময়দানে এসে তার বিরোধীতা করত। যে গোপনে বিরোধীতা করত তার সাথে বিরোধ করত না। আর অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তরবারী উন্মুক্ত করত না।

কুফার গভর্নরী লাভ

৫০ হিজরীতে কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবার মৃত্যুর পর কুফার শাসনভারও যিয়াদের উপর ন্যাস্ত করা হয়। যিয়াদ ছয় মাস বসরায় অবস্থান করত আর ছয় মাস কুফায় অবস্থান করত। যিয়াদ প্রথম যখন গভর্নর হিসেবে কুফায় আগমন করে তখন কুফার জামে মসজিদে এক ভাষণ দান করে। কুফায় বিশৃঙ্খল প্রিয় লোকজন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে। যিয়াদ তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং নিজে মসজিদের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। অতঃপর আদেশ করে, চার চারজন করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও। যে ব্যক্তি শপথ করে কংকর নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করত তাকে ছেড়ে দিত, আর যে শপথ করতে বিলম্ব করত তাকে আটক করত। এভাবে ত্রিশ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এরপর তাদের সকলের হাত কেটে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর যিয়াদ মসজিদে তার নিজের জন্য একটি হুজরা তৈরি করায়।

হুজর বিন আদীকে হত্যা

হুজর বিন আদী ছিলেন কুফায় হযরত আলী রাযি. এর সমর্থক। যখন হযরত হাসান রাযি. হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি হযরত ইমাম হাসান রাযি. এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর এ কাজের জন্য ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বললেন, "হে রাসূলের দৌহিত্র! আমার আজকের দিনের পূর্বে মরে যাওয়া উত্তম ছিল। আপনি আমাদেরকে ইনসাফের হাত থেকে বের করে যুলুমের থাবায় নিক্ষেপ করেছেন। আমাদেরকে

e-ilm.weebly.com

সত্য ত্যাগে বাঁধ্য এবং বাতিলকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাতে পলায়ণ করতে আমরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। হযরত ইমাম হাসান রাযি. প্রতি উত্তরে বলল, হে হুজর! আমি আমার অধিকাংশ সাথীদের সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী ও যুদ্ধ করার বিপক্ষে দেখতে পেয়েছি। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করা আমার অপছন্দ ছিল। আমার সাথীদের কল্যাণ সন্ধির মাঝে নিহিত ছিল। তাই আমি সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে তাদের রক্ত ঝরতে দেইনি।"

হুজর বিন আদী এখান থেকে নিরাশ হয়ে হযরত হুসাইন রাযি. এর নিকট উপস্থিত হন। তাকে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মোকাবিলায় তরবারী উত্তোলন করার পরামর্শ দান করেন। কিন্তু হযরত হুসাইন রাযি. ও তাঁকে ঐ কথাই বলেন, আমরা বাই'আত গ্রহণ করার পর তা ভংগ করতে পারব না। অবশেষে হুজর নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

মুগীরা ইবনে শো'বা কুফায় একজন সরলপ্রাণ নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তথাপি তিনি হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর নির্দেশে হযরত আলী রাযি. নিন্দা ও হযরত উসমান রাযি. এর জন্য দু'আ করত। হুজর বিন আদী এবং তাঁর সাথীদের নিকট এ কাজ ভীষণ অপছন্দ ছিল। তাই তাঁরাও জনসমাবেশে হযরত আলী রাযি. এর প্রশংসা এবং হযরত উসমান রাযি. এর দুর্নাম প্রচার করতে শুরু করে। মুগীরা বিন শোবা তাদের প্রতিঘাত-প্রতিবাদ করতেন না। বরং উপহার ও উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টা করতেন।

একদিন মুগীরা বিন শো'বা তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ দান করছিলেন। সহসা হুজর বিন আদী দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করেন, এ লোক আমাদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছ। তোমার সে অধিকার ছিল না। তুমি আমাদের ভাতা জারী করে দাও! আর হযরত আলী রাযি. এর কুৎসা রটনা করা থেকে নিবৃত হও। এরপর দুই তৃতীয়াংশ লোক দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, হুজর বিন আদী সত্য কথাই বলছেন। আমাদের ভাতা জারী করে দাও। মুগীরা ইবনে শো'বা মিম্বারের নিচে নেমে আসেন।

মুগীরা ইবনে শোবার এ কাজ তার সাথীদের অপছন্দ হয়। তারা তাঁকে বলল, আপনি হুজর বিন আদীকে ভীষণ মর্মাহত করেছেন। এভাবে সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকে না। আমীরুল মুমিন পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গেলে তিনিও এরূপ আচরন পছন্দ করবেন না। মুগীরা বিন শো'বা বললেন, তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি তো হুজর বিন আদীকে হত্যা করে ফেলেছি। আমার নমনীয়তা সে সরকারের বিরোধীতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। আমার পরে যে গভর্নর হবে, তার সময়ও সে এ ধরনের আচরণ করতে থাকবে। সে তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। এটা হল আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। আমি আমার নিজের হাতকে এ

e-ilm.weebly.com

শহরের বুযুর্গদের রক্তে রঞ্জিত করে তাদেরকে সৌভাগ্যবান আর নিজেকে হতভাগা বানাতে চাই না।"

মুগীরা বিন শোবার এ ধারনা সঠিক ছিল। তাঁর পর ইবনে যিয়াদ কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়। সে শুধু ছয় মাস কুফায় অবস্থান করত। তার অনুপুস্থিতিতে আমর বিন হুরাইস তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। এক জুমায় আমর বিন হোরাই খুতবা দানের জন্য দাঁড়ালে হুজর বিন আদী স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। আমর বিন হুরাইস মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসে এবং স্বীয় মহলে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। পরে এ ঘটনা বসরায় ইবনে যিয়াদকে অবহিত করায়। সে আরো বাড়িয়ে জানায়, হুজরের গৃহে আলীর অনুসারীগণ সমবেত হয়ে হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে অভিশম্পাত বর্ষণ করে। যিয়াদ বসরা থেকে কুফায় আগমন করে কুফার জামে সমজিদে এক ভাষণ দেয়। উক্ত ভাষণে সে কুফাবাসীদেরকে সরকারের বিরোধীতার পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখায়। তারপর হুজর বিন আদীকে তলব করে। হুজর বিন আদী হাজির হতে অস্বীকার করেন। ইবনে যিয়াদ তাকে পুলিশের মাধ্যমে তলব করে। হুজর বিন আদীর সংগীসাথীগণ পুলিশকে গালা গালি করে। যিয়াদ কুফাবাসীদের সমবেত করে আরেক ভাষণ দিয়ে বলে,

"তোমাদের অবস্থাও ভীষণ শোচনীয় হয়ে গেছে। তোমরা এক হাতে মাথায় আঘাত করছ আর অপর হাতে তাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছ। তোমাদের দেহ আমার সাথে আর অন্তর হুজরের সাথে। হয় তোমরা সংশোধন হয়ে যাও। নতুবা দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলা হবে।"

কুফাবাসীগণ এ ভাষণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বলতে শুরু করে– আল্লাহ না করুন! আমরা আপনার আনুগত্য না করে ঘাড় ফিরিয়ে নেব কিভাবে!"

যিয়াদ কঠোর ভাষণে আরও নির্দেশ জারী করে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বস্ব আত্মীয়-স্বজনকে হুজরের সাথে মিলিত হতে বারণ করবে। এভাবে হুজর বিন আদীর অধিকাংশ সমর্থকগণ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর হুজর ও তার হাতেগোনা সংগীসাথীদেরকে গ্রেফতার করে যিয়াদ কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

অধিকন্তু যিয়াদ হুজরের বিরুদ্ধে কুফার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের সাক্ষী গ্রহণ করে। তারা প্রকাশ্যে সাক্ষ্যদেয় যে, হুজর ও তার সমর্থকরা খলীফাকে গালি দিত। তারা সরকার বিরোধী। এ উদ্দেশ্যে তারা পৃথক এক দলও গঠন করেছে। যিয়াদ এসব সাক্ষীসহ হুজর বিন আদীকে তার সমর্থকদের দামশকের রাজদরবারে প্রেরণ করে। যিয়াদ হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করে যে, এসব লোকই ইরাকের অশান্তির কারণ। তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হলে ফিতনা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে।

e-ilm.weebly.com

আমীর মু'আবিয়া রাযি. হুজর ও তার সাতজন সমর্থককে হত্যা করে ফেলেন। বাকী ছয়জন যারা স্বীয় অভ্যাস পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের ছেড়ে দেন। হযরত আয়েশা রাযি. যখন হুজর বিন আদীকে গ্রেফতার ও দামশকে প্রেরণের খবর অবগত হলে তিনি আব্দুর রহমান বিন হারেছের মাধ্যমে এক সুপারিশনামা লিখে পাঠান। কিন্তু আব্দুর রহমান দামশকে পৌঁছার পূর্বে হুজরকে হত্যা করে ফেলা হয়।

হুজর বিন আদীর হত্যা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ছিল। হযরত মু'আবিয়া রাযি. যা করার করেছেন। কিন্তু পরে এর জন্য তিনি নিজে আক্ষেপ করেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. এর দূত আব্দুর রহমান তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মু'আবিয়া! হুজরকে হত্যা করার সময় আপনার বংশগত ধৈর্য ও সহনশীলতা কোথায় চলে গিয়েছিল? হযরত মু'আবিয়া রাযি. বললেন, যখন আপনাদের মত ধৈর্য্যশীল লোকজন আমার নিকট থেকে দূরে সরে যায়, তখন আমাকে ইবনে সুমাইয়ার মত লোকের কথা বাধ্য হয়ে মানতে হয়।" পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিযা রাযি. হযরত আয়েশা রাযি. এর খেদমতে হাযির হলে তিনিও তাঁকে ঐ প্রশ্ন করেন। তিনি জবাব দেন, তখন আমার কোন বুদ্ধিমান পরামর্শ দাতা ছিল না। [১]

যিয়াদের মৃত্যু

৫৩ হিজরীতে যিয়াদের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেন, যিয়াদ হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে লিখেছিল, আমি আমার বাম হাত দ্বারা ইরাক নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছি। আমার ডান হাত এখনও খালি রয়ে গেছে। হিজাজ দান করে তা পূর্ণ করে দিন। হযরত মুায়াবিয়া রাযি. তার নামে হিজাজের গভর্নরীর ঘোষণাপত্রও লিখেছেন। হিজাজবাসী এ খবর শোনার পর কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যায়। তাদের এক প্রতিনিধি দল হযরত ইবনে উমর রাযি. এর খেদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ পেশ করে। হযরত ইবনে উমর রাযি. কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে যিয়াদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। তার এ দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। যিয়াদের ডান হাতের আঙ্গুলে প্লেগের ঘুটি দেখা দেয়। তাতেই সে মারা যায়। তার মৃত্যুর সংবাদ যখন হযরত ইবনে উমর রাযি. এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন! আফসোস! হে ইবনে সমাইয়া! তুমি না আখিরাত লাভ করেছ আর না তোমার জন্য দুনিয়া বাকী রয়েছে।

মুগীরা ইবনে শো'বা

হযর মুগীরা বিন শো'বা রাযি. এর শাসন ব্যবস্থা ছিল নম্র ভদ্র। তিনি সন্ধি প্রিয় লোক ছিলেন। বিরুদ্ধ বাদিদের পিছনে লাগা তাঁর অপছন্দ ছিল। লোকজন তার নিকট এসে অভিযোগ করত, অমুক ব্যক্তি খারিজী আকীদায় বিশ্বাসী; অমুক

e-ilm.weebly.com

ব্যক্তি শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি এ বলে তাদেরকে বিদায় করে দিতেন যে, আল্লাহ তা'লার হিকমতও তাঁর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি তার বান্দাদের ধ্যান-ধারনা বিরোধপূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের দিন তাদের মতবিরোধের মীমাংসা করবেন। কিন্তু খারিজীরা কি আদৌ স্বস্থিতে বসে থাকার লোক ছিল? তারা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনুগত্য করাকে গুনাহের কাজ মনে করত। আর ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে পূণ্যের কাজ মনে করত। তারা মুস্তাওরিদ ইবনে আলকামাকে তাদের নেতা মনোনীত করে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু করে। কুফাতে হাইয়্যান বিন জিবয়ানের গৃহে গোপন পরামর্শ হল এবং সিদ্ধান্ত হল যে,– ঈদুল ফিতরের দিন (৪০ হিজরীতে) ময়দানে বের হতে হবে।

মুগীরা ইবনে শো'বা তাদের এ গোপন পরামর্শের খবর অবগত হন। পুলিশ বাহিনী হাইয়্যানের গৃহ চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলে। মুস্তাওরিদ ও তার কতিপয় অনুচর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আর বাকী সকলে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যায়।

মুস্তাওরিদ কুফা থেকে বের হয়ে পুনরায় তার অনুচরদের সমবেত করে মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করে। মুগীরা ইবনে শো'বা কুফাবাসীদের সমবেত করে এক গাম্ভির্য্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন এবং খারিজীদের বিশৃংখলা দমনের উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য কামনা করেন। মাকাল বিন কায়েস রিবাহী বললেন, "হে আমীর! প্রত্যেক গোত্রের সরদার স্বস্ব গোত্রের জিম্মাদারী নেবে। আমি আমার গোত্রের জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম।" মুগীরা বিন শো'বা তার এ অভিমত সমর্থন করেন এবং প্রত্যেক গোত্রের সরদারদের নির্দেশ দেন, তারা যেন স্বস্ব গোত্রের লোকদের ফিতনার আগুন থেকে নিবৃত রাখে। সকল গোত্রের সরদারগণ এ আদেশ মেনে নেন এবং গোত্রের লোকদের আল্লাহর শপথ দিয়ে বিশৃংখলা থেকে বিরত রাখেন।

মুস্তাওরিদ ঐ সময় আবদে কায়েস গোত্রের সালিম বিন মামদুজের গৃহে আশ্রয় নেয়। সাআসা ইবনে সাওহান আব্দী ছিলেন এ গোত্রের সরদার। তিনি নিজ গোত্রে আসেন এবং এক জোরালো ভাষণ দান করে গোত্রের লোকদের ফিতনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। গোত্রের সব লেকজন সাআসার আবেদন মেনে নেয় এবং খারিজীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ গ্রহণ করে। মুস্তাওরিদ যখন সাআসার তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সেখান থেকে বিদায় হয়ে যায়। তারপরও মুস্তাওরিদ তার লোকদেরকে সংগঠিত করতে থাকে। তিনশ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সাওরা থেকে সূরাত অভিমুখে যাত্রা করে।

মুগীরা ইবনে শো'বা যখন তাদের এ যুদ্ধ যাত্রার খবর অবগত হন, তখন তিনি কুফার সরদারদের সমবেত করে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। আদী ইবনে

e-ilm.weebly.com

হাতিম বললেন, হে আমাদের আমীর! আমরা সকলে তাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং আপনার আজ্ঞাবহ। আপনি যখনই আদেশ করবেন, তখনই আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মা'কিল ইবনে কায়েস বলল, এখন কুফার সব অভিজাত লোকজন আপনার অনুগত এবং সে সব অত্যাচারীদের দুশমন। কিন্তু আমি সকলের আগে আগে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হোক। মুগীরা ইবনে শো'বা তিন হাজার শী'আ মতাবলম্বীদের মনোনীত ব্যক্তি মা'কিল ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে মুস্তাওরিদের মোকাবিলায় করেন।

আবু রিগাদ তিন শত সৈন্যের এক দল নিয়ে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে আগে যাত্রা করেন। উভয় পক্ষের মাঝে একাধিক স্থানে সংঘর্ষ হয়। তাতে খারিজী দল বিজয়ী হয়। অবশেষে দাইলামা নামক স্থানে কঠিন যুদ্ধ হয়। উভয় দলই বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করে। এভাবে মুস্তাওরিদ ও মা'কিল উভয়ে পরস্পরে সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি এসে যায়। যুদ্ধের চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে মুস্তাওরিদের নিক্ষিপ্ত বর্শা মা'কিলের বক্ষভেদ করে বের হয়ে যায়। আর মা'কিলের তরবারীর আঘাতে মুস্তাওরিদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ যুদ্ধে পাঁচজন খারিজী ছাড়া আর কেউ জীবিত থাকে নি। এর পর কিছুদিনের জন্য খারিজীদের দৌরাত্ম স্তিমিত হয়ে যায়।

মুগীরা ইবনে শো'বা সাত বছর কয়েক মাস কুফায় গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ৫০ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। এর পর বসরাকে কুফার সাথে যিয়াদের শাসনাধীন করে দেওয়া হয়। মুগীরা ইবনে শো'বা কোমল স্বভাব, সন্ধিপ্রিয় ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলতেন, "আমি কুফাবাসীদের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে তাদেরকে সৌভাগ্যবান আর নিজেকে হতভাগা বানাতে চাইনি।" আমি সৎ লোকদের প্রতিদানে সদাচরণ করতে ইচ্ছুক। ভুল-ভ্রান্তি কারীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত। আমি উত্তম স্বভাবের লোকদের প্রশংসা করব, আর নির্বোধ লোকদের বুঝানোর চেষ্টা করব। এভাবেই একদিন ভাগ্যের হাত তাদের ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে। আমার পর কুফাবাসীদেরকে অনেক শাসকের সম্মুখীন হতে হবে। তখন তারা আমাকে স্মরণ করবে। তার ইনতিকালের পর কুফার জনৈক শায়খ বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তার সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে উত্তম শাসক হিসেবে পেয়েছি। তিনি সদাচরণ কারীদের প্রশংসাকারীও অপরাধীদের ক্ষমাকারী ছিল। তিনি অপারগতা প্রকাশকারীর অপারগতা গ্রহণ করতেন। ইমাম শাবী রাযি. বলেছেন– মুগীরা ইবনে শো'বার মত উত্তম শাসক আর পাওয়া যাবে না। তিনি শেষ সল্‌ফে সালেহীনদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যদিও হযরত আলী রাযি. এর কুৎসা রটনা এবং হযরত উসমান রাযি. এর জন্য নেক দু'আ করা তার অভ্যাস ছিল। কেননা সে

e-ilm.weebly.com

যুগে বনী উমাইয়াদের হিতাকাংখী ও হযরত আলী রাযি. এর অনুসারী উভয়ে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। তারা কোন দলই একে অপরের কুৎসা রটনা করা দোষণীয় মনে করত না।

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ

যিয়াদের মৃত্যুর পর হযরত মু'আবিয়া রাযি. উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৫৫ হিজরীতে উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গাইলানকে অপসারণ করে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। যিয়াদের মৃত্যুর পর পুনরায় খারিজী দলের আবির্ভাব দেখা দেয়। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ স্বীয় পিতা থেকেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কথিত আছে, একবার সে ঘোড় দৌড়ে অংশ গ্রহণ করে। আর ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ইত্যাবসরে উরওয়াহ ইবনে আদীরাহ তাকে উপদেশ দিতে শুরু করেন এবং পবিত্র কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুরু করেন।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

"তোমরা কি প্রত্যেক উঁচু স্থানে অনথক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ কর, আর অট্টালিকা বানাও? মনে হয় তোমরা দুনিয়াতে চিরদিন থাকবে। আর যখন কাউকে পাকড়াও কর তখন বড্ড নির্মমভাবে তাকে পাকড়াও কর।" (সূরা শুআরা)

উরওয়াহ খারিজী মতাবলম্বী ছিলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ বুঝতে পারে, তার পেছনে বিরাট শক্তিশালী দল রয়েছে। এ কারণেই বোধ হয় সে আমার সামনে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছে। উবাইদুল্লাহ ঘোড় দৌড় ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাত ময়দান ত্যাগ করে। অতঃপর উরওয়াহকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী করে। উরওয়াহকে বন্ধী করে নিয়ে আসার পর তার হাত পা কেটে দেওয়া হয়। এর পর ইবনে যিয়াদ তাকে জিজ্ঞেস করে এখন তোমার কি ধারনা হচ্ছে ? উরওয়াহ বললেন, আপনি আমার দুনিয়া ও আপনার পরকালকে বরবাদ করে দিয়েছেন। এরপর ইবনে যিয়াদ তাকে হত্যা করার আদেশ করে। তৎসঙ্গে তার কন্যাকেও হত্যা করে দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে বনী ইয়ারবু গোত্রের জনৈক মহিলা ইবনে যিয়াদের কুৎসা রটনা করত। ইবনে যিয়াদ তাকেও তলব করে। লোকজন তাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেয়। সে মহিলা বলল– আমি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্যদের বিপদে ফেলতে চাই না। এ মহিলা ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির হল। ইবনে যিয়াদ তারও হাত-পা কেটে হত্যা করে ফেলে। তারপর ইবনে যিয়াদ খারিজীদেরকে গণহারে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী করে। এমনকি কারাগার পরিপূর্ণ হয়ে

e-ilm.weebly.com

যায়। উরওয়াহ বিন আদীরার ভাই আবু হেলাল মিরদাসও বন্দী হয়। মিরদাস বড় ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। কারাগারের দারোগা তাকে প্রত্যেহ রাতে বাড়ী চলে যাওয়ার এবং সকালে ফিরে আসার অনুমতি দেন। এক রাতে ইবনে যিয়াদের মজলিশে খারিজীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ মজলিশে মিরদাসের জনৈক বন্ধুও উপস্থিত ছিল। সে তার বন্ধুকে এ খবর জানিয়ে দেয় যে, তোমাদেরকে হত্যা করার আদেশ জারী করা হয়েছে। কিন্তু মিরদাস তার অভ্যাস অনুযায়ী কারাগারে পৌছে যায়।

কারাগারের দারোগা মিরদাসকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আপনার হত্যার খবর জানতে পারেন নি ? মিরদাস বলল, আমি হত্যার নির্দেশ জারীর খবর জানতে পেরেছি। তবে আমি আমার হিতাকাংখীকে বিপদে পতিত করতে চাই না। মিরদাসের জবাব শুনে কারাগারের দারোগা প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। সে ইবনে যিয়াদের নিকট সুপারিশ করে মিরদাসের জীবন বাঁচিয়ে দেয়। এর পর মিরদাস আহওয়াজ অভিমুখে চলে যায়।

আহওয়াজ পৌছার পর মিরদাস বিশেষ এক কর্ম পন্থা অবলম্বন করে অর্থাৎ যখন সরকারী কর আদায় কারী অর্থ নিয়ে রাজকোষে জমা দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত, তখন সেখান থেকে মিরদাস তার নিজের সাথীদের ভাতার পরিমাণ অর্থ ছিনিয়ে নিত। আর বাকী অর্থ ছেড়ে দিত। ইবনে যিয়াদ তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য আসলাম ইবনে জাররার নেতৃত্বে দুই হাজার সৈন্যের এক বহিনী প্রেরণ করে। মিরদাস চল্লিশ জন সঙ্গীর সাহায্যে দুই হাজার সৈন্যের বাহিনীকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়।

মোটকথা, ইবনে যিয়াদ খারিজীদের বিদ্রোহের আগুনকে কখনো শাস্তির তরবারী দ্বারাও স্তিমিত করতে সক্ষম হয়নি। –ইবনুল আছির– ৩/৩০৩

মিশরের গভর্নরী

মিশর বিজয়ী গভর্নর ছিলেন সেখানকার অবস্থা বিশেষজ্ঞ ও শান্তিশৃংখলার প্রতিষ্ঠাতা আমর বিন আস। ৪৩ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর তাকে অপসারণ করে অপর একজনকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তার সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

হিজাজের গভর্নর

হিজাজের শাসনকর্তার পদ বনী উমাইয়াদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল। কখনো মাওয়ান বিন হাকামকে মদীনার শাসনকর্তা মনোনীত করা হত। আবার কখনো সাঈদ বিন আসকে মনোনীত করা হত। আমীর মু'আবিয়ার নীতি ছিল, তিনি বনী উমাইয়া গোত্রের নতুন কাউকে শাসনকর্তা নিয়োগ করলে প্রথমে তাকে তায়েফের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। এখানে শাসনকার্যে সে সফলকাম হলে

e-ilm.weebly.com

তাকে একসাথে মক্কায় শাসনকর্তা নিয়োগ করা হত। সেখানেও সফলকাম হলে তার উপর মদীনার শাসনভারও ন্যাস্ত করা হত।

মদীনার গভর্নরকে পালন করতে হত আমীরে হজ্জের দায়িত্ব। আমীর মু'আবিয়া স্বীয় খিলাফতের যুগে মাত্র দু'বার হজ্জ আদায় করেছেন। প্রথমবার ৪৪ হিজরীতে, দ্বিতীয়বার ৫০ হিজরীতে।

বিজয়

হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. এর শাসনামলে পূর্বাঞ্চলে খূব সীমিত বিজয় লাভ হয়। পূর্বাঞ্চলে সর্বদা বিদ্রোহ চলতে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন সাওয়ার আবদি যিনি সিন্ধু এলাকায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দু'বার কীকান এলাকায় আক্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার কীকনবাসী তুর্কিদের সাহায্যে তাকে হত্যা করে ফেলে। ৪৪হিজরীতে মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা সিন্ধু এলাকায় আক্রমণ করেন। তিনি কাবুল ও মুলতানের মঝে অবস্থিত তিব্বাহ ও লাহোর দখল করে নেন। এখানে শত্রুদের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। একবার তাকে বারজন তুর্কী অশ্বারোহী ঘেরাও করে ফেলে। মুহাল্লাব একাই তাদের সকলকে হত্যা করেন।

সে সময় মুসলমানদের বেশী মনোযোগ ছিল উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেন দিকে। সেখানে পুরাশক্তি রোমানদের রাজত্ব ছিল। তারা বারবার মুসলমানদেরকে তাদের সাথে মোকাবিলা করার আহবান করছিল। রোমান শাসকদের মধ্যে আমীর মু'আবিয়ার সমসাময়িক দু'জন বাদশাহ ছিল। দ্বিতীয় কুসতুনতীন ইবনে দ্বিতীয় হিরাক্লিয়াস। (৬৪১ খ্রিঃ থেকে ৬৬৮ খ্রিঃ) এবং চতুর্থ কুসতুনতীন বেগানাকাস (৬৮০ খ্রিঃ থেকে ৬৮৯ খ্রিঃ)। এতদুভয় বাদশাহের শাসনামলেই মিশর ও সিরিয় সীমান্তে রোমান ও মুসলমানদের মাঝে অনবরত খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। হযরত আমীর মু'আবিয়া স্থল ও সামুদ্রিক উভয় দিক থেকে তাদের মোকাবিলা করার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

নৌপথে আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপক নৌবাহিনী গঠন করেন। সতরশ' জাহাজের বিশাল এক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখা হয়। এসব জাহাজ প্রস্তুতের জন্য সিরিয়াতে জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়। কাঠ সরবরাহ করা হয় লেবাননের পাহাড় থেকে।

আমীর মু'আবিয়ার ঐ নৌবাহিনী রোম সাগরের বক্ষভেদ করে উপর্যোপুরী আক্রমণ পরিচালনা করে ইসলামী সম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করে। সাইপ্রাস, কতিপয় দ্বীপ যথা ইউনান ও রোডাস দ্বীপ পর্যন্ত বিজয় গৌরব অর্জন করে। এসব দ্বীপ নৌবাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে অতিব কার্যকারী প্রমাণ হয়। এরা রোমানদের জাহাজকে ইসলামী এলাকার দিকে অগ্রসর হতে বাঁধা দিত। আমীর মু'আবিয়া নৌ-বাহিনীর বেতনভাতা বাড়িয়ে দেন।

e-ilm.weebly.com

স্থলপথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আমীর মু'আবিয়া সাওয়াতী ও সাওয়াইক নামে দু'টি পৃথক বাহিনী গঠন করেন। গ্রীষ্মকালের যুদ্ধাদেরকে সাওয়াতী বলা হত। আর শীতকালীন যুদ্ধাদেরকে সাওয়ায়িক বলা হত। এভাবে সর্বদা অব্যাহত আক্রমণ চলতে থাকে। ফলে দুশমনদের ইসলামী সম্রাজ্যের সীমায় আসার সাহস হত না।

কনসটান্টিনোপল আক্রমণ

৪৯হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া রাযি. পূর্বাঞ্চলীয় রোমান রাজধানী কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করার জন্য বিরাট এক বাহিনী গঠন করেন। ঐ বহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, সুফিয়ান বিন আউফ। ফারকাদুনা নামক স্থানে ঐ বাহিনী জ্বর ও বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমীর মু'আবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকেও ঐ বাহিনীতে যোগদান করার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সে অসুস্থতার অযুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকে। মুজাহিদ বাহিনীর রোগাক্রান্ত হওয়ার খবর জানতে পেরে সে বিনোদন মাহফিলে এ কবিতা রচনা করে।

ما ان ابالى بمالاقت جموعهم + بالفرقدونة من حمى ومن هموم

اذا نكأت على الانماط مرتفعا + بديرمران عندى ام كلثوم

অর্থাৎ আমার ভয় কিসের, যদি ফারকাদুনায় যুদ্ধরত দলসমূহ জ্বর ও বসন্ত রোগে হয়ে থাকে। আমি তো দিরে মাররানে গালিচার উপর বালিশে হেলান দিয়ে উম্মে কূলসম (স্ত্রী)-র সাথে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আছি। আমীর মু'আবিয়া পুত্রের এ ভোগ-বিলাসের খবর জানার পর শপথ করে বললেন, ইয়াযিদকে অবশ্যই রোম সম্রাজ্যে যেতে হবে। আজ মুসলিম বাহিনী যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে তাকেও অংশগ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং আমীর মু'আবিয়ার এ আদেশের পর অপর এক দল যারা প্রথম দলের সাহায্যার্থে যাত্রা করছিল তাদের সাথে ইয়াযিদ ছাড়াও প্রবীন খ্যাতনামা সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, হযরত ইবনে আববাস, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি. যোগদান করেন। এত বাহিনী স্থলপথে বাসফোর্স উপকূলে পৌঁছে। তাছাড়া নৌপথে বুসর বিন আরতাতের নেতৃত্বে আরেক দল সৈন্য যাত্রা করে। তারা রোদবার দানিয়াল এলাকা অতিক্রম করে কনসটান্টি-নোপলের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

রোমান শাসক কনসটান্টিনোপল রক্ষার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গ্রীক মারাণাস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের উপর আগুনের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। মুসলমানগণ বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিকূলতায় জীবন বাজী রেখে আগুন ও রক্তের খেলা খেলতে থাকে। আব্দুল আযীয ইবনে যুরাহ কালবীর অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, তিনি শাহাদাত লাভের আশায় বারবার সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের তুলার

e-ilm.weebly.com

মত উড়িয়ে দিতেন। অবশেষে রোমান বাহিনী তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে এবং বর্শা নিক্ষেপ করে তার পুরো দেহ চালনির মত ছিদ্র করে ফেলে। এ অবস্থায় তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তথাপি মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপলের উন্নত মহল "মাদকু", তার মজবুত প্রাচীরের উচ্চতা ও শত্রু বাহিনীর বিপুল বাঁধায় তা জয় না করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বহিনী এবং তাদের যুদ্ধ জাহাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

হুযুর ﷺ এর মদীনার মেজবান হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. যুদ্ধ চলাকালে ইনতিকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে কনসটান্টিনোপলের প্রাচীরের নিচে দাফন করা হয়। রোমান শাসকগণ তাদের রাজত্বকালে তাঁর কবরের নিকট হাজির হয়ে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করত। তুর্কী উসমানীদের যুগে কন্সটান্টিনোপলের বিজয়ের পর তাঁরা তার কবরের উপর গম্বুজ নির্মান করেন এবং কবরের পাশে বিরাট এক শানদার মসজিদও তৈরি করেন। উসমানী খলীফাদের মুকুট পরিধানের অনুষ্ঠান ঐ মসজিদে অনুষ্ঠিত হত।

আফ্রিকা বিজয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রাযি. মিশর ও আফ্রিকার দু'বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর ৪৭ হিজরীতে তাকে অপসারণ করা হয়। তার স্থানে মু'আবিয়া ইবনে খাদীযকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ৫০ হিজরীতে মুয়াবিযা ইবনে খাদীজকে অপসারণ করে উকবা বিন নাফে ফিরীর উপর আফ্রিকার শাসনভার ন্যাস্ত করা হয়।

উকবা আমর বিন আসের যুগে আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বার্কা ও খাদী এলাকায় বসবাস করতেন। আফ্রিকার বর্বর জাতিরা ভীষণ উশৃংখল ও বিদ্রোহী ছিল। যখনই কোন শাসক তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবহিনী প্রেরণ করত, তখন তারা আনুগত্য প্রদর্শনের ভান করত। দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেত। যখন সৈন্য বাহিনী ফিরে আসত তখনই তারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যেত। আমীর মু'আবিয়ার আদেশে উকবা বিন নাফে ফিরী দশ হাজার সৈন্যের এ বাহিনী নিয়ে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

এ জরুরী কাজ সমাপ্ত করার পর তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ এলাকায় এক ইসলামী শহর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা ইসলামী শক্তির কেন্দ্র বিন্দু এবং বিপদের সময় মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হবে। সুতরাং তিনি নিবিড় অন্ধকার বন উজাড় করে কায়রোওয়ান শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে বিরাট আলীশান মসজিদও নির্মাণ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরে এ শহর নির্মাণ করা হয়। কায়রোওয়ান শহর প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের সৌভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারা

e-ilm.weebly.com

প্রশান্তি ও ধৈর্যের সাথে বর্বরদের মোকাবিলা করে এবং একের পর এক এলাকা দখল করতে থাকে। এভাবে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বিপুল সংখ্যক বর্বর জাতিও ইসলাম গ্রহণ করে।

৫৫ হিজরীতে মিশর ও আফ্রিকার শাসন ক্ষমতা মাসলামাহ ইবনে মুখাল্লাদ আনসারীর উপর ন্যাস্ত করা হয়। তিনি তার কৃতদাস আবুল মুহাজিরকে আফ্রিকার শাসক নিয়োগ করেন। আবুল মুহাজির আফ্রিকা পৌঁছে উকবা ইবনে নাফের সাথে অসৌজন্য মূলক আচরণ করে বসে। উকবা সিরিয়া পৌঁছে আমীর মু'আবিয়া এর নিকট আবুল মুহাজিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। আমীর মু'আবিয়া তাঁকে পুনরায় আফ্রিকার গভর্নর নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর জীবন তাকে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করার অবকাশ দেয়নি।

ইয়াযিদের মনোনয়ন

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযি. একবার দামশকে পৌঁছেন। তখন তিনি ইয়াযিদের হাতে বাই'আত গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। ঘটনা ছিলঃ তিনি ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাতকালে ইয়াযিদকে বললেন, আকাবেরে সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে আহলে বাইতগণ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এখন তাদের বংশধরাগণ জীবিত আছে। তুমি বংশগত বুযুর্গ। প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিমত, রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় কোন অংশে কম নও। আমি বুঝতে পারছি না যে, আমীরুল মুমিনীন তোমাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে বিলম্ব করছেন কেন? তার এ প্রস্তাব শুনে ইয়াযিদ বলল, কিভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হবে ? মুগীরা বিন শো'বা বললেন, অবশ্যই সম্ভব।

ইয়াযিদ এ আলোচনা সম্পর্কে মু'আবিয়াকে অভিহিত করে। তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা কে তলব করে বললেন, ইয়াযিদ এ সব কি বলছে ? মুগীরা ইবনে শো'বা বললেন, হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে যে মতভেদ ও রক্তপাতের সূচনা হয়েছে, তা সকলেই অবগত আছে। এ সম্পর্কে কেউ অনবগত নয়। অতএব ইয়াযিদ যখন আপনার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন। সুতরাং তার স্বপক্ষে বাই'আত গ্রহণ করে তাকে আপনার প্রতিনিধি ঘোষণা করুন। পরবর্তীতে কোন বিপত্তি দেখা দিলে তখন সে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হবে। খিলাফত নিয়ে মতবিরোধ ও রক্তপাতের সূচনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমীর মু'আবিয়া বললেন, এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করবে কে? ইবনে শো'বা বললেন, কুফার দায়িত্ব স্বয়ং আমি গ্রহণ করলাম। বসরার দায়িত্ব যিয়াদের উপর ছেড়ে দিন। এ দুই শহরবাসীদের দমন করতে পারলে রাজ্যের আর কোথাও বিদ্রোহের আওয়াজ ধ্বনিত হবে না। আমীর মু'আবিয়া বললেন, ঠিক আছে। তাহলে তুমি তোমার কাজ শুরু কর। ভবিষ্যতে যা ভাল মনে হবে, তা করা হবে। মুগীরা ইবনে শো'বা কুফায় ফিরে এসে বনী উমাইয়াদের

e-ilm.weebly.com

সমর্থকদের মাঝে ইয়াযিদের মনোনয়নের আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা এ আন্দোলনে ঐক্যমত্য তৈরী। আর কুফার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর এক প্রতিনিধিদল মূসা বিন মুগীরার নেতৃত্বে দামেশক অভিমুখে যাত্রা করে। ঐ প্রতিনিধি দল আমীর মু'আবিয়ার সামনে নিজেদের পক্ষ থেকে ইয়াযিদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার দাবী পেশ করে। পাশাপাশি ইয়াযিদের গুণাবলীও বর্ণনা করে। আমীর মু'আবিয়া বললেন, আমি তোমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করে দেখব। এ বিষয় তড়িগড়ি কোন পদক্ষেপ নেওয়া সমিচীন হবে না। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে। ঐ প্রতিনিধি দলের আগমনে আমীর মু'আবিয়ার ইচ্ছা শক্তিশালী হয়। তিনি যিয়াদকে এ বিষয়ে অভিমত জানাতে পত্র প্রেরণ করেন।

যিয়াদ তার উপদেষ্টা উবাইদ ইবনে কা'ব গাইরীকে ডেকে বলল, আমীরুল মুমিনিনের ইচ্ছা হল, ইয়াযিদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করা। কিন্তু এটা ইসলামী সম্রাজ্যের ব্যাপার ও দ্বীনের দায়িত্ব পালনের কাজ। ইয়াযিদ ভবঘুরে দায়িত্ব জ্ঞানহীন এক নবযুবক। শুধু ভোগ-বিলাস, ভ্রমণ ও শিকার করা ব্যতীত কোন কাজ তার পছন্দ নয়। সুতরাং আমার ইচ্ছা হল, তুমি আমীরুল মুমিনিনের সাথে সাক্ষাত করে ইয়াযিদের এ সব দোষ-ত্রুটির বিষয়ে তাকে জানিয়ে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেবে, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িগড়ি কোন পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। উবায়েদ ইবনে কা'ব বললেন, আমীরুল মুমিনীনের অভিমতের বিরোধীতা করা এবং তার পুত্রের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যথার্থ হবে না। তবে উত্তম হল, স্বয়ং আমি দামশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাত করব। তাকে বলব, তোমার পিতা যিয়াদের সাথে তোমাকে উত্তরাধীকারী মনোনীত করা সম্পর্কে পরামর্শের আহবান করেছেন। যিয়াদের অভিমত হল, যে যাবত তুমি তোমার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। বর্তমান অবস্থায় মুসলমানগণ তোমার বিরোধীতা করবে। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে সংশোধন করে নাও, তাহলে আর তোমার বিরুদ্ধে কারো আপত্তি করার অবকাশ থাকবে না। এভাবে আমীরুল মুমিনীনের কল্যাণ এবং উম্মাতের নিরাপত্তা উভয় লাভ হবে। যিয়াদ উবায়েদ ইবনে কা'বের অভিমতকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে করেন। তাকে এ কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে দামেশক অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। উবায়েদ দামশকে পৌঁছে ইয়াযিদকে অতি উত্তমরূপে উপদেশ দান করে। এতে ইয়াযিদ অনেক বদ অভ্যাস ছেড়ে দেয়। উবায়েদ যিয়াদের পক্ষ থেকে আমীর মু'আবিয়াকে এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, এখনো এ কাজে আমি দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না।

যিয়াদের মৃত্যুর পর আমীর মু'আবিয়া স্বীয় ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিরিয়া তো তার রাজধানী আর বুসরা ও কুফা নিয়ন্ত্রণ করা কোন

e-ilm.weebly.com

কঠিন ব্যাপার নয়। আসল সমস্যা ছিল হিজাজকে নিয়ন্ত্রণ করা। মিল্লাতের সম্মানীত ব্যক্তিগণ এখানে বসবাস করতেন। তাছাড়া খিলাফতে রাশেদার যুগে হিজাজবাসীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে খলীফা মনোনীত করা হত।

হিজাজের সম্মানীত বরেণ্য ব্যক্তিদের মাঝে হযরত ইবনে উমর রাযি. ছিলেন জ্ঞান প্রজ্ঞায় তাকওয়া পরহেজগারীতে অতুলনীয়। এছাড়া তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কখনো এ পদের আকাংখা করেন নি। এ কারণে আমীর মুয়াবিয়া তাঁর মাধ্যমে কাজ সমাধা করার ইচ্ছা করেন। সে মতে মু'আবিয়া তাঁর নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূত তাঁর সামনে একলাখ দেরহাম পেশ করে। হযরত ইবনে উমর রাযি. রাজকীয় উপঢৌকন মনে করে তা গ্রহণ করেন। এরপর দূত যখন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, তখন হযরত ইবনে উমর রাযি. বললেন– আমার দ্বীন এতো সস্তা নয় যে, তা একলাখ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেব! [১] এ বলে তিনি আমীর মু'আবিয়াকে ঐ দিরহাম ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

এরপর হযরত মু'আবিয়া রাযি. মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকামকে পত্রযোগে লিখেন,

"আমার বয়স হয়েছে। আমার শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, আমার পর উম্মাতের মাঝে যেন পুনরায় মতবিরোধ রক্তপাতের সূচনা না হয়। কাজেই আমার অভিমত হল, আমার জীবদ্দশায় কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ মদীনাবাসীদের পরামর্শ ছাড়া করা সমচীন হবে না। আমার মতে তুমি এ বিষয়টি মদীনাবাসীদের সামনে উত্থাপন করবে। এ সম্পর্কে তাদের অভিমত আমাকে জানাবে।"

মারওয়ান মদীনার সম্মানীত বুযুর্গদের আহবান করে তাদের সামনে আমীর মু'আবিয়ার অভিমত পেশ করেন। কিন্তু সে ব্যক্তিগতভাবে কারো নাম উল্লেখ করেনি। তাই সকলে আমীর মু'আবিয়ার অভিমতে ঐক্যমত পোষণ করে বলে, আমাদের কথা হল, আমীরুল মুমিনীন যেন এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের জন্য তাঁর স্থলাভিসিক্ত মনোনীত করেন। মারওয়ান মদীনাবাসীদের এ অভিমত আমীর মু'আবিয়াকে অবহিত করেন।

এরপর মারওয়ানের নামে আমীর মু'আবিয়ার দ্বিতীয় পত্র আসে। তাতে ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার বিষয় অবগত করানো হয়। মারওয়ান উক্ত পত্র পাওয়ার পর মদীনাবাসীদের সমবেত করে ঘোষণা করেন, আমীরুল মুমিনীন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আপনাদের কল্যাণে তার উত্তরাধীকারী

টীকা-১ ঃ এক লাখ দিরহাম প্রদানের এ ঘটনা আল্লামা ইবনে আসীর একজন শী'আ বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি মোটেই ঠিক নয়। কাতেবে ওহী সম্পর্কে এধরনের কথা অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল্লামা ফরীদ পুরী রচিত "ভুল সংশোধন"।

e-ilm.weebly.com

মনোনীত করেছেন। আর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হল, ইয়াযিদ। ইয়াযিদের নাম শোনা মাত্রই উপস্থিত জনতার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন,

হে মারওয়ান! না তুমি সত্য কথা বলছ আর না মু'আবিয়া সত্য কথা বলছেন! তোমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মাত থেকে খলীফা মনোনীত করার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। খিলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তর করে দেওয়া। যখন এক কায়সার মারা যাবে তখন দ্বিতীয় কায়সার তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার পর হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি., হযরত ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মারওয়ান বিন হাকাম পুরো ঘটনা আমীর মু'আবিয়াকে অবহিত করেন।

এরপর আমীর মু'আবিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট লিখিত ঘোষণা প্রেরণ করেন যে, তোমরা স্বস্ব প্রদেশে ইয়াযিদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা চালাবে। আর সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর কর্মকর্তাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে খিলাফতের দরবারে পাঠাবে। উত্তরাধিকারী মনোনয়ের বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা হবে। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদল দামেশকে পৌছতে শুরু করে। মদীনার প্রতিনিধিদলের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাজাম আর বসরার প্রতিনিধিদলের মধ্যে আহনাফ বিন কায়েসও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যখন খেলাফতের দরবারে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়ে আলোচনা চলছিল, তখন মুহাম্মদ বিন আমর বলেন–

"হে আমীরুল মুমিনীন! প্রত্যেক বাদশাহ তার প্রজা সাধারণের কল্যাণের জিম্মাদার। আপনি গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার শাসন ভার কার উপর ন্যাস্ত করতে যাচ্ছেন।"

আনহাফ বিন কায়েস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ভীষণ জটিল ব্যাপার। যদি আমরা সত্য কথা বলি তাহলে তা আপনার ভয়। আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তাহলে আল্লাহর ভয়। আপনি নিজে ইয়াযিদ এর দৈনন্দিন কার্যাবলী ও তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন। আপনি যদি এ বিষয় আল্লাহ ও উম্মতে মুহাম্মদীর সন্তুষ্টি লাভ করতে চান, তাহলে এ বিষয়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করা নিঃপ্রয়োজন। আর যদি তা না চান, তাহলে আপনার পরকালীন সফরের সময় তাকে দুনিয়ার পাথেয় দান করবেন না। মোটকথা, আপনি যা করবেন আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেওয়ার জন্য আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। এ জবাব শোনার পর আমীর মু'আবীয়া নীরব হয়ে যান। কিন্তু জনৈক সিরিয়া নেতা দাঁড়িয়ে বলল, এ ইরাকী কি বলছে? আমরা সিরিয়াবাসীরা তো আমীর মু'আবিয়ার সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছি। আর তাঁর ইশারায় যুদ্ধের ময়দানে তরবারী উন্মুক্ত করার অপেক্ষায় রয়েছি।

e-ilm.weebly.com

আমীর মু'আবিয়া ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত স্থির করেই নিয়ে ছিলেন। তাঁর রাজ্য শাসনের রীতি ছিল, তিনি প্রচুর উপহার ও উপঢৌকনের দ্বারা আপন-পর সকলের মন জয় করে নিতেন। তিনি এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রথমে সিরিয়া ও ইরাক বাসীদের বাই'আত গ্রহণ করে নেন। তার পর এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।

মদীনায় বসবাসরত সম্মানী বুযুর্গদের মুখ স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা বন্ধ করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমীর মু'আবিয়ার মদীনা আক্রমণের খবর শোনার পর হযরত ইবনে উমর আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, ইবনে যুবায়ের ও ইমাম হুসাইন রাযি. প্রমুখ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। এসব বুযুর্গানে ইসলাম মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার পর আমীর মু'আবিয়া মদীনা বাসীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণের শুরুতে ইয়াযিদ গুণাবলী বর্ণনা করেন। তারপর বললেন, "এমন কতিপয় লোক আছে, যারা ইয়াযিদের বিরোধীতা করা থেকে বিরত হবে না। আমি তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই, যদি তারা তাদের কাজে বহাল থাকে তাহলে আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেব।"

মদীনা থেকে আমীর মু'আবিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। এ চার বুযুর্গ আমীর মু'আবিয়ার মক্কা আগমনের খবর শুনে মনোস্থির করেন– আমাদের আমীরের সাথে সাক্ষাত করা উচিত। সম্ভবতঃ মদীনার অবস্থা দেখায় তার মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যেতে পাবে। সুতরাং 'বাতনে মর' নামক স্থানে তাঁরা আমীরকে স্বাগত জানান। আমীর মু'আবিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে তাদের সংগে মিলিত হন এবং তাঁদেরকে রাজকীয় বাহনে চড়িয়ে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

আমীর মু'আবিয়া মক্কায় অবস্থান কালে তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে থাকেন। যখন তার মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় নিকটবর্তী হয়, তখন তাদের সামনে বাই'আতের বিষয় উত্থাপন করেন। ঐ বুযুর্গগণ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কে তাদের নেতা মনোনীত করেন। তার সাথে নিম্নোক্ত বিষয় আলোচনা করা হয়।

আমীরে মু'আবিয়া ঃ আপনি আমার সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। আমি সর্বদা আপনাদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। আপনাদের বাড়াবাড়িকেও সর্বদা সহ্য করে আসছি। ইয়াযিদ আপনাদেরই ভাই। আপনাদের পিতৃব্য পুত্র। আমি চাই আপনারা তাকে নামে মাত্র খলীফা বানিয়ে দিন। আর রাষ্ট্রের সব কর্মকাণ্ড আপনাদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। সে আপনাদের আদেশের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। আপনারা কি এ কথা মঞ্জুর করতে পারবেন না ?

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.ঃ আমরা আপনার সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করব। আপনি তিনটি প্রস্তাবের কোন এক প্রস্তাব মেনে নিন।

e-ilm.weebly.com

আমীর মু'আবিয়া ঃ- বলুন! আপনার প্রস্তাবগুলো কি ?

ইবনে যুবায়ের রাযিঃ সর্বোত্তম হল, রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের উপর আমল করা। তিনি কাউকে নামেমাত্র খলীফা বানান নি। তাঁর ওফাতের পর উম্মাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরত আবু বকর রাযি. কে তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছেন।

আমীর মু'আবিয়া ঃ কিন্তু বর্তমানে আবু বকর রাযি. এর মত ব্যক্তিত্ব কোথায় আছে বলুন ?

ইবনে যুবায়ের রাযিঃ তা না হলে আবু বকর রাযি. এর রীতি অনুসরণ করুন। তিনি এমন ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন, যিনি আত্মীয় ছিলেন না। (আমীর মু'আবিয়া নীরব হয়ে যান।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বললেন, এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উমর রাযি. এর রীতি অনুসরণ করুন! তিনি খলীফা মনোনয়নের বিষয় ছয় সদস্যের মজলিসে শুরার উপর ন্যাস্ত করেছেন, যারা তাঁর অনাত্মীয় ছিল।

আমীর মু'আবিয়া ঃ এ ছাড়া কি অন্য কোন রূপরেখা হতে পারে?

ইবনে যুবায়ের রাযি .ঃ জ্বী না! এছাড়া চতুর্থ আর কোন রূপরেখা হতে পারে না।

আমীর মু'আবিয়া ঃ ঠিক আছে! তাহলে এখন আপনি আমার অভিমত শুনুন। এ পর্যন্ত কেবল এতটুকুই হয়েছে যে, আমি জনসমাবেশে ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছি। আর আপনার মত কেউ দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলত। আমি আপনাদের ঐ বাড়াবাড়িকেও নীরবে সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আর তা হবে না। আমি জনসমাবেশে ভাষণ দেব। যদি আপনাদের মত কেউ এক শব্দও উচ্চারণ করে, তাহলে আমার এ উন্মুক্ত তরবারী বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাঁকে আর দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করার সুয়োগ দেওয়া হবে না। সুতরাং আপনাদের স্বস্ব জীবনের প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত।

এরপর আমীর মু'আবিয়া ঐ চার বুযুর্গকে সাথে নিয়ে সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করেন, তাঁরা হলেন উম্মাতের সম্মানী ব্যক্তি। তাদের পরামর্শ ব্যতিত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় মীমাংসা করা সম্ভব নয়। তাঁরা সকলে ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনারা সকলে আল্লাহর নাম নিয়ে তার বাই'আত গ্রহণ করুন। [১]

---

১. আলোচ্য ঘটনায় বল প্রয়োগের যে কথা বলা হয়েছে, একথা আল্লামা ইবনে আসীর রহ. ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি। তাও তিনি সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে আছীর রহ. এর প্রধান উৎস হলো তারীখে তাবারী। সেখানেও এ অলিক কাহিনীর কোন সূত্র নেই। পক্ষান্তরে শী'আ ঐতিহাসিক আহমাদ আল ইয়াকুবীও বল প্রয়োগের উক্ত ঘটনা খণ্ডন করে লিখেছেন, "তিনি সকলের মনোর নই করেছেন। বাই'আত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করেননি।" বলা বাহুল্য, একজন কট্টরপন্থী শী'আ ঐতিহাসিকের স্বীকৃতি উপেক্ষা করে ইবনে আসীর রহ.এর সনদবিহীন বর্ণনা উল্লেখ করার কোন যৌক্তিকতাই নেই।

e-ilm.weebly.com

জনসাধারণ এসব সম্মানীত বুযুর্গদের অভিমত জানার অপেক্ষায় ছিলেন। যখন তাদেরকে বলা হল, তাঁরা বাই'আত গ্রহণ করেছেন, তখন মক্কাবাসীরা ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করে নেয়। আমীর মু'আবিয়া মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছে মদীনা বাসীদের বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর মদীনা থেকে সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ ঘটনার পর থেকে আমীর মু'আবিয়া বনী হাশেমের বংশধরদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা বন্ধ করে দেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সিরিয়াতে গমন করে এ বিষয় আমীর মু'আবিয়ার নিকট অভিযোগ পেশ করেন। আমীর মু'আবিয়া বলেন, আপনার সাথীগণ ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করেনি। আর আপনিও এ ব্যাপারে তাদেরকে বুঝাননি। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, হে আমীর মু'আবিয়া! আপনি নিশ্চয় জানেন যে, যদি উপকূল এলাকায় গমন করে আপনার বিরুদ্ধে একটু শব্দ করি তাহলে আপনার বাই'আত গ্রহণের একটি সূতাও অবশিষ্ট থাকবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর এ ধমকি শোনার পর আমীর মু'আবিয়া ভীত হয়ে বলতে শুরু করেন, হে ইবনে আব্বাস রাযি.! আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি আপনার ভাতা প্রদানের আদেশ জারী করে দিচ্ছি। আপনাকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ দেব না।

আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যুঃ

৬০ হিজরীর জমাদিউল উখরা মাসে আমীর মু'আবিয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হোন। মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, "আমি এক জমিন যার ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমি দীর্ঘ দিন তোমাদের শাসন কার্য পরিচালনা করেছি। তাতে তোমরা আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছ। আর আমিও তোমাদের উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার পর যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, সে আমার থেকে উত্তম হবে না, যে ভাবে আমি আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণের চেয়ে উত্তম ছিলাম না। বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করি। তুমি আমার সাক্ষাতকে পছন্দ কর। আমার এ সাক্ষাতকে আমার জন্য বরকতময় কর!

এ ভাষণের কিছুদিন পর তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন। ঐ সময় ইয়াযিদ দামেশকে উপস্থিত ছিল না। তিনি যখন স্বীয় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন যাহ্হাক বিন কায়েস ও মুসলিম বিন উকবা মুররীকে ইয়াযিদের নিকট নিম্নোক্ত উপদেশনামা পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন।

"বৎস! আমি তোমার পথের সব কাটা দূর করে তোমার ভবিষ্যত নিঃষ্কন্টক করে দিয়েছি। তোমার শত্রুদের নির্মমভাবে নির্মূল করে দিয়েছি। আরববাসীদের মস্তক তোমার সামনে অবনত করে দিয়েছি। তোমার জন্য এত বিপুল পরিমাণ

e-ilm.weebly.com

সম্পদ জমা করে রেখেছি, যার উদাহরণ দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। আমার এ সমস্ত উপকারের কৃতজ্ঞতা হল, তুমি হেজাজবাসীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে, তারাই তোমার আসল উৎস। যে কোন হিজাজবাসী তোমার নিকট আসবে, তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করবে। ইরাকবাসীদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। যদি তারা চায় প্রতিদিন তাদের জন্য এক জন নতুন শাসক নিয়োগ করতে হবে, তাহলে তাই করবে। কেননা এক লাখ তরবারীর মোকাবিলা করা থেকে প্রতিদিন শাসনকর্তা পরিবর্তন করা অতি সহজ। সিরিয়াবাসীদের সাথেও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। তাদেরকে স্বীয় গোপনরহস্য সম্পর্কে অবহিত করতে পার।

যদি কোন শত্রুর আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাদের সাহায্য নেবে। কিন্তু যখন দুশমনকে নির্মূল করে ফেলবে, তখন তাদেরকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। কেননা তারা অন্যত্র বসবাস করার কারণে তাদের আচার-আচরণে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। খিলাফতের বিষয়ে চার জন কুরাইশ বংশধর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি., হযরত ইবনে উমর, ইযরত ইবনে যুবায়ের ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি.। ইবাদত হযরত ইবনে উমর রাযি. কে দুর্বল করে দিয়েছে। অন্যরা যখন তোমার বাই'আত গ্রহণ করে নেবে তখন তিনি তা অস্বীকার করবে না। হুসাইন ইবনে আলী রাযি. সরল প্রাণ লোক। ইরাকবাসীরা তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করায় নিয়োজিত থাকবে।

যদি তিনি তোমার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। আর তুমি সফলকাম হও, তাহলে তুমি তার সাথে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করবে। কেননা সে তোমার নিকট আত্মীয়। আমাদের উপর তাঁর বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকার রয়েছে। তাছাড়া তিনি রাসুল ﷺ এর কলিজার টুকরা। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. আরামপ্রিয় লোক। তিনি অন্যদের যা করতে দেখবেন, তিনিও তা করবেন। কিন্তু যে সিংহের মত আঘাত করবে, আর শিয়ালের মত চালবাজী করবে, সে হল আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.। যদি সে মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে, আর তুমি সফলকাম হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। তবে সাধারণ লোকজনকে যথাসম্ভব রক্তপাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। (ইবনে আছীর ৪/২-৩)

অন্তিম সময় নিকটবর্তী হলে বললেন, "হুযুর ﷺ আমাকে একটি জামা দান করেছেন। আমি সেটি স্বযত্নে গচ্ছিত রেখে দিয়েছি। একদিন হুযুর ﷺ নখ কর্তন করেছিলেন, আমি তা এক বোতলে ভরে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর যখন আমাকে কাফন পরিধান করাবে, তখন আমাকে হুযুর ﷺ ঐ

e-ilm.weebly.com

জামা পরিয়ে দেবে। আর হুযুর ﷺ এর ঐ নখগুলো আমার চোখে ও মুখের উপর ছাড়িয়ে দেবে। আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা হয়ত এর বরকতে আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন।

অবশেষে ১ রজব ৬০ হিজরী (৭ এপ্রিল ৬৮০ খ্রিঃ) তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭৫ বছর। তিনি মোট ১৯ বছর ৩ মাস ২৭ দিন রাজ্য শাসন করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান যাহ্হাক বিন কায়েস। ইয়াযিদকে অসুস্থতা বেড়ে যাবার খবর দেওয়া হয়। কিন্তু সে দাফনের পরে পৌঁছে এবং কবরের উপর জানাযা আদায় করে।

একটি জরুরী কথা

হযরত মু'আবিয়ার রাযি.কর্তৃক ইয়াজিদকে উত্তরসূরী নির্বাচন করতে হযরত মুআবিয়া রাযি. কি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তারীখে মিল্লাতের লেখক ইবনে আসীরের বরাতে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি একেবারেই অবাস্তব বানোয়াট ও কাল্পনিক। যাতে সত্যের কোন লেশমাত্র নেই। এ ধরনের কথা বিশ্বাস করলে ঈমানের মধ্যে ত্রুটি আসার সম্ভাবনা আছে। তাই প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য আমাদেরকে হযরত মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক সাহেব কর্তৃক লিখিত "ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস" নামক বই অবলম্বনে নিম্নের লেখাটুকু বাড়াতে হয়েছে। মূল বই পড়ার পরে এই নোট অবশ্যই পড়তে হবে।

"হযরত মু'আবিয়াহ রাযি. মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহর খিদমত করেন। এর মধ্যে তিনি সাবায়ীদের ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করেন এবং সাবায়ীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া খিলাফত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সন্ত্রাসবাদী সাবায়ীদের দমন করে দেশে শান্তি-শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানদের পারস্পারিক গৃহযুদ্ধের ক্ষতির প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রথম কাতারের ভুক্তভোগী হিসেবে তিনি একজন যোগ্য উত্তরসূরী মনোনয়ন পূর্বক নিজের জীবদ্দশায় তাঁর হাতে জনসাধারণের বাই'আত নিয়ে রাখার আকাঙ্খা পোষণ করতেন। যাতে তার মৃত্যুর পর পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বা অন্য কোন কারণে পুনরায় মুসলিম জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ না থাকে।

বলা বাহুল্য যে, বর্তমান খলীফা তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ও গুণীজনদের সংগে পরামর্শক্রমে যে কোন যোগ্য ব্যাক্তিকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে তার হাতে জনসাধারণের বাই'আত গ্রহণের পর তাকে খলীফা ঘোষণা করে যেতে পারেন। এমনকি পিতৃত্ব বা অন্য কোন রক্ত সম্পর্কের কারণেও মনোনয়ন দানের বৈধতার রদবদল হবে না। অবশ্য পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলীফা যদি নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শুধুমাত্র দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তার পুত্রকে ভাবী খলীফারূপে মনোনয়ন দিতে চান, তাহলে এর জন্য শর্ত হচ্ছে, খলীফাকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও অনুমোদন নিতে হবে। কেবলমাত্র তখনই পুত্রের মনোনয়ন ও তার হাতে জনসাধারণের বাই'আত গ্রহণ বৈধ হবে এবং এটাকে

e-ilm.weebly.com

রাজতন্ত্র বলা হবে না। রাজতন্ত্র বলা হয় যোগ্যতার বিচার না করে শুধু বংশানুক্রমিক ব্যাবস্থাকে। এ উদ্দেশ্যে পরামর্শ চেয়ে হযরত মু'আবিয়াহ রাযি. নিজের এক গভর্ণরের বরাবর যে চিঠি লিখেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন "আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। আমার আশংকা হয় যে, আমার মৃত্যুর পর উম্মাহর ঐক্যে আবার ফাটল দেখা দিতে পারে। এ কারণে আমার ইচ্ছা হল, আমার জীবদ্দশাই কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে দিয়ে যাই।" অন্যত্র তিনি একবার বলেন,"জনসাধারণকে আমি রাখালবিহীন বকরীর পালের মত ছেড়ে যেতে চাই না।"

এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম ও প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বিশিষ্ট সাহাবী কুফার গভর্ণর হযরত মুগীরাহ বিন শো'বাহ রাযি. এ বলে পরামর্শ দেন যে, হযরত উসমানের রা. শাহাদাতের পর সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের মাঝে যে মতানৈক্য ও ভয়বহ রক্তপাতের সূত্রপাত হয়, তা কেউ বিস্মৃত হয়নি। সুতরাং আপনার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণ যোগ্যতাধারী ইয়াযীদের পক্ষে জনগণের বাই'আত নিয়ে তাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। যাতে আপনার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষ হতে কোন বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হলে, তিনি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হতে পারেন এবং খিলাফতের ব্যাপারে কোনরূপ গণ্ডগোল ও রক্তপাতের আশঙ্কা না থাকে।

বলাবাহুল্য, ইয়াযীদ আমীরুল মুমিনীনের প্রিয়পুত্র ও সাহাবীজাদা হিসেবে গোটা ইসলামী উম্মাহর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রম, প্রশাসনিক দক্ষতা ও একাধিক সমর নৈপুণ্যের বিচারে তিনি খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। স্বয়ং হযরত মু'আবিয়াহ রাযি. তাকে বিশিষ্ট সাহাবীগণের রাযি. উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী খারিজীদের দমনে এবং তৎকালের অন্যতম পরাশক্তি রোমীয়দের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে প্রেরণ করে তার সাহসিকতা ও সমর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর অবলোকন করেন। সুতরাং ইয়াযীদের তৎকালীন এ সকল গুণাবলী কারণে শুধু হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ রা. নয় বরং একাধিক সাহাবী তখন ইয়াযীদের মনোনয়নকে সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে তারা নিয়মিত প্রচারণাও চালিয়ে যান। ফলে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলের সুধী ও গুণীজনেরা স্ব-স্ব এলাকার প্রতিনিধিদলসহ আমীরুল মুমিনীনের আবাসস্থল দামেস্ক আগমন করে হযরত মু'আবিয়ার রাযি. সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং নিজেদের পক্ষ হতে ইয়ায়ীদকে পরবর্তী খলীফা স্বরূপ মনোনয়ন দানের প্রস্তাব পেশ করতে থাকেন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাদের এ ব্যাপারে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং বলেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িগড়ি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। যা আল্লাহর মঞ্জুর আছে, তাই হবে। এরই মধ্যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ সমূহের প্রতিধিদল এসে হযরত মু'আবিয়ার রাযি. প্রতি ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারেই অনুরোধ জানাতে থাকেন। তখন হযরত মু'আবিয়াও রা. স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানের মনস্থ করেন।

অতঃপর প্রশাসন ও মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য নেতৃস্থানীয়গণের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলে তারাও এ ব্যাপারে সমর্থন দান করেন। এখন শুধু হিজায তথা মক্কা-মদীনার নেতৃবৃন্দের মতামত জানা বাকি ছিল। মক্কা-মদীনাবাসীদের মধ্যে শুধু

e-ilm.weebly.com

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইয়াযীদের ব্যাপারে এ কারণে আপত্তি আনলেন যে, হযরত হুসাইন, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাযি. তখনো জীবিত ছিলেন। আর তাঁরা সকলেই সাহাবী হওয়ার কারণে এবং ধার্মিকতা ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারা ইয়াযীদের চেয়ে উত্তম ছিলেন।

কিন্তু তাদের মতামত এজন্য প্রাধান্য পেল না যে, সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট অংশ ইয়াযীদের মনোনয়নের পক্ষে ছিলেন। কারণ, ইমাম হুসাইন প্রমুখগণ ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতম হলেও ইয়াযীদ এক দিকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে বাহ্যিকভাবে কম যোগ্য ছিল না। যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর যোগ্যতর ব্যক্তির বর্তমানে যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করার বৈধতা ইসলামে আছে। অন্যদিকে ইয়াযীদ আমীরুল মুনিনীন হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর মত বিচক্ষণ প্রশাসক সাহাবীর পুত্র হওয়ার সুবাদে এবং সর্বদা পিতার সান্নিধ্যে থাকার বদৌলতে খিলাফত, শাসনকার্য ও রাজ্য পরিচালনায় বেশ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার পর অতিরিক্ত যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের চেয়ে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অনেক বেশী। সে কারণে হযরত মু'আবিয়াহ রাযি. ও আন্তরিকভাবে ইয়াযীদকেই খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর ধারনা মতে উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণও এতে নিহিত ছিল। এ কারণে একবার হযরত উসমানের রাযি. পুত্র সাঈদের অনুযোগের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার এ দাবী যথার্থ যে, তোমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহর নৈকট্যভাজন ছিলেন। আর তোমার মাও ইয়াযীদের মায়ের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদ সম্পর্কে আমাকে বলতেই হবে যে, গোটা ভু-খণ্ড তোমার মত লোকে ভরে গেলেও ইয়াযীদের যোগ্যতার পাল্লা ভারী হবে।" তাই উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা বানানোর বিকল্প ছিল না।

অপরদিকে বনু উমাইয়া গোত্রেই তখন কুরাইশের প্রধান শক্তি ছিল। উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও ছিল তাদেরই অনুবর্তী। আর বনু উমাইয়ার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এক বাক্যে ইয়াযীদের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সকল কারণে উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা বানানোই যুক্তিযুক্ত ছিল। ফলে ইয়াযীদই চূড়ান্তরূপে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ৬০ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়াহ রাযি. এর ইন্তিকারে পর ইয়াযীদই যথারীতি খলীফা নিযুক্ত হন।

ইয়াযীদকে চূড়ান্তরূপে মনোনয়ন দানের পূর্বে ও পরে হযরত মু'আবিয়া রাযি. বিভিন্ন সময় আপন প্রভুর নিকট যেসব দু'আ করেন, সেগুলো তাঁর ইখলাস এবং পুত্র ইয়াযীদের মনোনয়নে পিতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন, জুমুআর এক খুতবায় আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি দু'আ করেছিলেন– "হে আল্লাহ! খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করেই যদি আমি ইয়াযীদকে মনোনয়ন দিয়ে থাকি, তাহলে তার পক্ষে আমার এ সিদ্ধান্তকে তুমি পূর্ণতা দান করো। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি পিতার মোহই যদি হয় এর কারণ, তাহলে তা তুমি ব্যর্থ করে দাও।" অন্য এক খুবতায় তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! ইয়াযীদকে যদি তার

e-ilm.weebly.com

যোগ্যতার কারণেই মনোনীত করে থাকি, তাহলে সে মর্যাদায় তাকে উন্নীত কর এবং তাকে মদদ কর। আর যদি পুত্রের প্রতি পিতা সহজাত ভালবাসাই এ কাজে আমাকে প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে আগেই তাকে তুমি তুলে নাও।"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার মনে যদি সংশংয় থাকত বা তিনি যদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুত্রের মোহে পড়ে পরবর্তী খলীফা হিসেবে পুত্রের মনোনয়নের অপচেষ্টায় লিপ্ত হতেন, তবে তিনি জুমু'আর দিনে হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে দু'আ কবুল হওয়ার যথার্থ মুহূর্তে পুত্রের নামে এরূপ কঠিন দু'আ কখনো করতে পরতেন না।

বস্তুতঃ সাবায়ী ও খারিজীদের অপকীর্তির কথা বলাই বাহুল্য। যারা হযরত মু'আবিয়াকে রাযি. নিজেদের চক্ষুশুল মনে করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপপ্রচারেও কুণ্ঠাবোধ করত না, তারা যে ইয়াযীদের মনোনয়নকে ব্যক্তি স্বার্থ প্রণোদিত বলে আখ্যা দিবে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। তারা ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণে বল প্রয়োগ, ঘুষ প্রদান ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ঘৃণিত অসুদপায় অবম্বনের মিথ্যা ও উদ্ভট অভিযোগ আনতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু দুঃখবোধ হয়, সে সকল বিবেকবান মুসলমান ভাইদের প্রতি, যারা পরবর্তীতে ইয়াযীদের শাসনামলে কুফার গভর্ণর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে কারবালা প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর ﷺ এর প্রিয় দৌহিত্য সাইয়িদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ হযরত হুসাইন রাযি. এর মর্মন্তুদ শাহাদাতের ঘটনাকে পুঁজি করে এর সকল দায়-দায়িত্ব রাসূলুল্লাহর-ই সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত মু'আবিয়ার রাযি. উপর চাপিয়ে দেন এবং তার অযোগ্য পুত্রকে খলীফা বানিয়ে ইসলামী খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করে নিজেদের ঈমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেন।

সাহাবীগণের সমালোচনাকারী বা তাদের ব্যাপারে মনে মনে সংকীর্ণতা পোষণকারীদের প্রতি মহানবীর ﷺ স্পষ্ট সতর্কবাণী হচ্ছে ঃ

"আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর! আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে। আমার পরে তাঁদেরকে তোমরা সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে আমার সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে; সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার দরুণই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

বস্তুতঃ রাসূল ﷺ এর দৌহিত্রের মর্মান্তিক শাহাদাতের সাথে কিঞ্চিত পরিমাণ হলেও যে নরাধম জড়িত, ইসলামী খিলাফতের পবিত্র আসনে মুহূর্তের জন্যও তাকে অধিষ্ঠিত রাখার কল্পনা করা যে কোন মুসলমানের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইয়াযীদকে যখন মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছিল, তখন কিন্তু কারবালা ট্রাজেডীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি পরবর্তী কালের দোষ-ত্রুটিগুলো ইয়াযীদের চরিত্রে তখন বিদ্যমান ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন সে আমীরুল মুমীনিনের প্রিয় পুত্র ও সাহাবীজাদা হিসেবে গোটা মুসলিম জাতির বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল এবং তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রম, প্রশাসিনিক দক্ষতা ও সমর নৈপুণ্যের বিচারে

e-ilm.weebly.com

তাকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার পূর্ণ অবকাশ ছিল। তদুপরি ইয়াযীদের এ যোগ্যতা শুধু যে পিতা মু'আবিয়ার রাযি. চোখেই ধরা পড়েছিল, তা নয় বরং বহু নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও তাবিয়ীগণও ইয়াযীদের প্রতি উচ্চ ধারনা পোষণ করতেন। যে কারণে তারাই প্রথমে মুআবিয়ার রাযি. প্রস্তাবটির ভাল-মন্দ বিবেচনা করে তা কার্যকর করেন মাত্র। পূর্বে এ কাথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রায় সব সাহাবী ও তাবিয়ীগণই তখন ইয়াযীদের খলীফা মনোনয়নের পক্ষে ছিলেন। ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে– পানাহারের এক মজলিসে তাঁর নিকট হযরত মু'আবিয়ার রাযি. মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি অনেক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকলেন। অতঃপর বললেন,'হে আল্লাহ! মু'আবিয়ার রাযি. প্রতি রহমত নাযিল কর, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি উত্তম ছিলেন না বটে, তবে পরবর্তীরাও তাঁর তুলনায় উত্তম হবে না। ইয়াযীদ অবশ্যই তাঁর খান্দানের যোগ্য উত্তরসূরী। সুতরাং তোমরা (উপস্থিত হাজিরানে মজলিস) স্ব স্ব স্থানে থেকে তাঁকে আনুগত্য ও বাই'আত দান কর।"

এ অবস্থায় ইয়াযীদের কোন দুস্কর্মের জন্য সাহাবী হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে দায়ী করে তাঁর সম্পর্কে কোনরূপ সমালোচনা করা শুধু যে অযৌক্তিক, তাই নয় বরং কুরআন-হাদীসের আলোকে তা জঘন্যতম অন্যায় ও নাজায়িয কাজ। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম হতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপত্তিজনক কোন কাজ সংঘঠিত হলেও সেখানে শরী'আতের বিধান হচ্ছে, তার যথাসম্ভব এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা সাহাবিয়্যাতের মহান মর্যাদার সাথে সর্বদিক দিয়ে সংগতিপূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে এমন কোন ব্যাখ্যা প্রদান কিছুইে বৈধ নয়, যা তাদের জীবন-চরিত্র ও সাহাবীসূলভ পবিত্রতার সাথে সাংঘর্ষিক অনুমিত হয়। কারণ, এর ভিত্তি মূলতঃ রাসূলুল্লাহর ﷺ এর কোন সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা পোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা নিঃসন্দেহে ঈমান বিধ্বংসী আচরণ। সে ক্ষেত্রে ইয়াযীদের অন্যায়ের কারণে হযরত মু'আবিয়ার ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীকে দায়ী করা যে কত বড় পাপ এবং নিজের ঈমানকে সংকটে ফেলার নামান্তর, তা সহজেই অনুমেয়।

মু'আবিয়ার পরিবার

আমীর মু'আবিয়া বিবাহ করেছিলেন চারটি।

১। বাইসূন বিনতে বাহদাল। তার গর্ভে ইয়াযিদের জন্ম হয়।

২। ফাখেতা বিনতে কুরযা নাওফিলী। তার গর্ভে আব্দুর রহমান ও আব্দুল্লাহ দুই পুত্রের জন্ম হয়। আব্দুর রহমান বাল্যকালে মারা যায়।

৩। ফাতিমা বিনতে আম্মারাহ কিলাবিয়া। তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেন।

৪। কুতুয়াহ বিনতে কুরযা। তিনি কবরছ যুদ্ধে আমীর মু'আবিয়ার সাথে ছিলেন। ওখানেই মারা যান তিনি।

মু'আবিয়া রাযি. এর চরিত্র

হযরত মু'আবিয়া ছিলেন কুরাইশদের ঐ খ্যাতনামা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেটি বংশ মর্যাদার দিক থেকে বনী হাশেমের বংশের পর সর্বাদিক মর্যাদা সম্পন্ন ছিল।

e-ilm.weebly.com

তারপর ব্যক্তিগতভাবেও তিনি হুযুর ﷺ থেকে ফয়েয লাভ করেছেন। ফলে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না বটে; কিন্তু একজন খ্যাতনামা সফল শাসকের যেসব গুণাবলী থাকা উচিৎ, তাঁর মধ্যে সবই বিদ্যমান ছিল।

হযরত উমর রাযি. বলতেন– তোমরা কায়সার ও কিসরার জ্ঞানের প্রশংসা কর? অথচ তোমাদের মধ্যে মু'আবিয়া বিদ্যমান রয়েছে। হযরত উমর রাযি. এর খিলাফতকালে তার সে যোগ্যতার প্রতিফলন হয়নি। পরবর্তী সময় বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে যে, হযরত উমর রাযি.-র উক্ত অভিমত সঠিক ছিল। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের কারণে খিলাফতে রাশেদার ভিত্তিমূল টুকরা টুকরা হয়ে যায়। তথাপি তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে তা পুণর্বহাল রাখার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা করেছেন, আদৌ তা অস্বীকার করা যায় না।

শাসন ব্যবস্থা

তাঁর শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের অভিমতের ভিত্তিতে পরিচালিত ছিল না। ফলে তাঁকে এ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় তরবারীর সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যথাসম্ভব ক্ষমা ও অনুগ্রহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যাতে তাকে তরবারীর সাহায্য নিতে না হয়।

হাশেমী বংশের লোকজন সর্বদা তার দরবারে এসে তাঁকে উপহাস করে অনেক কথা বলত। তিনি তাদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। অধিকন্তু তাদেরকে নানা উপহার-উপঢৌকন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি আমীর মু'আবিয়ার সাথে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় কথা বলে। তাঁর সামনে উপস্থিত লোকজন বলল, "এ ব্যক্তির সাথেও কি আপনি নমনীয় ব্যবহার করবেন?" তিনি বললেন, আমি কারো বাকস্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব না। যাবত না সে আমার রাজত্বে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনুল আছীর–৪/৫)

হযরত মু'আবিয়া তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি সম্পর্কে নিজেই বলেন– "যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বেত্রাঘাত কাজে আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তরবারীর সাহায্য গ্রহণ করি না। যখন আমার মুখের কথায় কাজ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি লাঠি ব্যবহার করি না। যদি আমার ও জনসাধারণের মাঝে একচুল পরিমাণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আমি ছিন্ন হতে দিই না। মানুষ যখন তা টানতে শুরু করে আমি তখন তা ঢিল দিতে শুরু করি। আর লোকজন যখন তা ঢিল দেয়, আমি তখন তা টেনে ধরি। (ইবনুল আছীর–২/২৮৩)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমীর মু'আবিয়ার নিযুক্ত কোন কোন গভর্ণর রক্তপাত ও বর্বরতায় বিলম্ব করেনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, যে সব এলাকায় এ ধরনের শাসক নিয়োগ করা হয়েছে, সে সব এলাকায় আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

e-ilm.weebly.com

জীবন যাপনঃ

হযরত আমীর মু'আবিয়া অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ৩৮ হিঃ থেকে ৫৯ হিঃ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিল। সিরিয়ার মত সবুজ-শ্যামল ও সাংস্কৃতিবান অভিজাত দেশে তার বাসগৃহ ছিল। ফলে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছেদ ও খাদ্য-দ্রব্যাদি অভিজাত ধরনের ছিল। তার দরবার ছিল রাজ দরবারের প্রতিচ্ছবি। তথাপি তিনি দরিদ্র লোকদের জীর্ণ কুঠির সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। যে কোন অনার্থ-দরিদ্রের আরজি অনায়াসে তার নিকট পৌছে যেত।

ঐতিহাসিক মাহমুদি তার শাসনামলের যে চিত্র অংকন করেছেন, তার সারমর্ম হল– "হযরত মু'আবিয়া ফজরের নামায আদায় করার পর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিবেদন সমূহ গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন এবং জরুরী নির্দেশ প্রদান করে চার রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর খাস দরবার আহবান করতেন। উক্ত দরবারে উপস্থিত থাকতেন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টাবৃন্দ। এ সভায় সারা দিনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ হত। তারপর তিনি পুনরায় অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মসজিদে গমন করতেন এবং বালিশে হেলান দিয়ে আসনে বসতেন। এ ছিল সাধারণ মজলিশ। তাতে সমাজের সর্বস্তরের লোকজন যেমন, দুর্বল-অসহায় গ্রাম্য লোকজন, নারী-পুরুষ-শিশু ও বৃদ্ধরা অনায়াসে যোগদান করতে পারত। এ সভায় তারা তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে অকপটে অভিযোগ পেশ করত। তিনি সর্বস্তরের লোকদের অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এ মজলিশ শেষ করে বিশেষ দরবার আহবান করা হত। সেখানে বিশেষ শ্রেণীর লোকজন অংশ গ্রহণ করতেন। তখন তিনি বলতেন, "সাথী বন্ধুগণ! আপনাদেরকে এ কারণে অভিজাত শ্রেণী বলে সম্বোধন করা হয় যে, আপনাদের এ মজলিশে যোগদান করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং আপনাদের একান্ত কর্তব্য হল, যারা এ মজলিশে যোগদান করার যোগ্য নয়, তাদের প্রয়োজন পেশ করা।"

এরপর সকালের খাবার খেতেন, ঐ সময় সচিব তার শিয়রে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদেরকে ধারাবাহিকভাবে পেশ করতেন। তাদের নিয়ে আসা লিখিত প্রস্তাব ও অভিযোগগুলো সচিব পাঠ করে শুনাতেন। আমীর মু'আবিয়া তখন খাবার খেতে থাকতেন বটে। কিন্তু বিধি বিধান আদেশ-নির্দেশ লিপিবদ্ধ করার কাজ চলতে থাকত। প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থী যতক্ষণ হাজির থাকত, খাবারেও শরীক থাকত। এরপর তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন। তারপর যুহরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন। যুহরের নামায শেষ করে বিশেষ দরবার আহবান

e-ilm.weebly.com

করতেন। এ দরবার আছর পর্যন্ত চলত। আছরের নামায শেষ করে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন। মাগরীবের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে বের হয়ে আসন গ্রহণ করতেন। সভাসদগণও স্বস্ব মর্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ আসনে বসে যেত। রাতের খাবার আনা হত। খাবার খেয়ে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। তৎসঙ্গে আরও চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তারপর মহলে প্রবেশ করতেন। পুনরায় ইশার নামাযের জন্য বের হয়ে আসতেন। নামাযের পর বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হত। ঐ মজলিশে আমীর-উমারাহ ও উচ্চ পদস্ত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকজন অংশ গ্রহণ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ আলোচনা হত। আলোচনা সমাপ্ত হলে শিক্ষামূলক বিষয় আলোচনা শুরু হত। তাতে আরব-অনারব ও অন্যান্য জাতি, তাদের শাসকবর্গের ইতিহাস, তাদের সন্ধি চুক্তি, যুদ্ধ কৌশল, তাদের শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। উক্ত আলোচনা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত চলত। তারপর বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন। এ অবস্থায় রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যেত। তারপর জাগ্রত হতেন। এ ছিল পাঠে মনোনিবেশ করার সময়। তাঁর সামনে সরকারী কাগজপত্র পেশ করা হত। তাতে প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের জীবন চরিত্র, শাসন ব্যবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী ও তাদের রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করা হত। ফজরের আযান পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলতে থাকত। তখন দু'রাকাত নামায আদায় করার পর তিনি মসজিদে গমন করতেন।

ইয়াযিদের বাই'আত অনুষ্ঠান

হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর বিরুদ্ধে যে মারাত্মক অভিযোগ আরোপ করা হয় তা হল তিনি ইসলামের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।

এটা এক বাস্তব সত্য যে, ইসলাম খলীফা নির্বাচন ও অপসারণের দায়িত্ব জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর ন্যাস্ত করেছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে ঐ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রথম তিন খলীফা নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু ৩৫ হিজরীতে দুর্ভাগ্যের সময় কিছু সংখ্যক বহিরাগত লোক হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে ঝড় তোলে, ঐ মহাপ্রলয়ংকারী ঝড় তা স্বমূলে ধ্বংস করে দেয়। জাতির কর্নধার ও দায়িত্বশীল বরেণ্য ব্যক্তিদের দূর্নীতির বিপরীতে বিশৃংখলা প্রিয় এক দায়িত্বহীন অযোগ্য দল নিজেদের মনগড়া মতবাদের উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক খলীফার অপসারণের দাবী পেশ করে। আর তিনি যখন আল্লাহ প্রদত্ত এ পোশাক ছিন্ন করতে অস্বীকার করেন, তখন বিদ্রোহীরা তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। সুতরাং ইসলামের মনোনীত নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ধ্বংসের দায় ভার আমীর মু'আবিয়ার উপর আরোপ করা যায় না। বরং

e-ilm.weebly.com

সে দায় দায়িত্ব হযরত উসমান রাযি. এর ঘাতকদের উপর আবর্তিত হয়। হযরত আলী রাযি. ও হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জংগে জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে মুনাফিকদের কুটিল ষড়যন্ত্রের কারণে ঐ পাগলা ঘোড়াকে আর থামানো সম্ভব হয়নি।

মোটকথা, ইসলামের প্রবর্তিত পছন্দনীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন দু'টি অবস্থা ছিল। এক হয়ত হযরত মু'আবিয়া রাযি. তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে উন্মুক্ত তরবারী ব্যবহার করবেন অথবা স্বীয় শাসন ক্ষমতা বলে কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাবেন। হযরত মু'আবিয়া দ্বিতীয় পন্থা পছন্দ করেন এবং তিনি দুই বিপদের মধ্যে সহজ বিপদ বেঁছে নেন। কিন্তু তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে যাকে মনোনীত করেন, সে ছিল সম্পূর্ণরূপে এ পদের অযোগ্য। আর বাস্তবে স্বয়ং আমীরও একাজ যথার্থ মনে করতে পারেন নি।

একদিকে আমীর তাঁর নিকট থেকে দূরে অবস্থান করতেন। কাছে থেকে দেখলে আমীর নিজেও তাকে যোগ্য মনে করতেন না। আমীর তো ভাল। স্বয়ং ইয়াযিদ যদি নিজের অভ্যাসের প্রতি তাকিয়ে দেখত তাহলে সে-ও অসম্ভব মনে করত। সুতরাং সর্বপ্রথম যখন এ প্রস্তাব ইয়াযিদের সামনে পেশ করা হয়, তখন সে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, এটা কি করে সম্ভব ? (ইবনুল আছীর–৪/১৯৮)

বনু উমাইয়ার জন্য যিয়াদ ইবনে আবীহির চাইতে বেশি আত্মত্যাগি আর কে হতে পারে? এতদসত্বেও তার সামনে যখন এই প্রস্তাব এল, তখন প্রথমে সে তো এর বিরোধীতা করল। পরে উবায়েদ ইবনে কাবের বুঝানোর কারনে সে ইয়াযীদকে বলে পাঠাল "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঐসব কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ না করবে যাতে লোকেরা আপত্তি করে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলাফত লাভ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রত্যেক যুগেই স্বার্থন্বেষী কিছু লোক থাকে তাদের অভ্যাস হচ্ছে, বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে শাসক গোষ্ঠিকে সন্তুষ্ট করে নিজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করা। সুতরাং প্রস্তাব উত্থাপন করার পর তা বাস্তবায়ন করার জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদল আসতে শুরু করে। তারা ইয়াযিদকে উত্তরাধীকারী মনোনীত করার আবেদন করেছিল। হযরত মু'আবিয়ার মাঝে হযরত উমর রাযি. এর মত ভয় ভীতি ছিল না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "খাত্তাবের বংশধরদের মধ্যে একজনই আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদেহী করার জন্য যথেষ্ট।" কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহলের পিড়াপিড়ী ছিল। কিছুটা পুত্র স্নেহও ছিল। ইয়াযিদের সাময়িক কিছু আত্ম-সংশোধনও ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে আছীরের ভাষায় –

e-ilm.weebly.com

فكف عن كثير مماكان يصنع

সে অনেক মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করেছিল। (ইবনুল আছীর-৪/১৯৯)

অবশেষে ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তথাপি আমীর মু'আবিয়া ইনতিকালের সময় স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে যান নি। তিনি পুত্রকে বাৎসল্যতা স্বরূপ অতি মূল্যবান উপদেশ দান করেন। যদি ইয়াযিদ তা পালন করার চেষ্টা করত তাহলে উম্মাতে মুহাম্মদী ধ্বংসের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হত না। আর ইয়াযিদের কপাল রাসূল ﷺ এর বংশধরদের রক্তে কলংকিত হত না।

وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

(আল্লাহ তা'আলার সব ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়।)

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের কারণে বিজয়ের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে তা পূর্ণ উদ্যমে চালু হয়, যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালেই আমীর মু'আবিয়া নৌবাহিনী গঠন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হারেসীকে নৌবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তার শাসনামলে নৌ-বাহিনীর ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন তিনি। মিশর ও সিরিয়ার উপকূলবর্তী জাহাজ তৈরীর অনেক কারখানা স্থাপন করেন। সুতরাং ১৭০০ শ' নৌ-যুদ্ধযান সর্বদা রোমান বাহিনীর মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হত। ঐ বাহিনীর প্রধান ছিল, জুনাদাহ ইবনে আবু উমাইয়া। এ বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্যে তিনি কবরছ, রোডাস ও অন্যান্য আরো অনেক গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন এবং কন্সটান্টিনোপলে আক্রমণ পরিচালনা করেন।

হযরত উমর রাযি. এর খিলাফতকালে ডাক বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। আমীর মু'আবিয়া ডাক বিভাগের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন এবং পুরো সাম্রাজ্য ডাক বিভাগের আওতাভূক্ত করেন। হযরত আলী রাযি. এর সাথে আমীর মু'আবিয়াকেও হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়। তখন তিনি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। মসজিদে পৃথক একটি কক্ষও তৈরী করান।

দিওয়ানে খাতাম নামে পৃথক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিভাগের মাধ্যমে সরকারী সকল ঘোষণাপত্র বা নোটিশ জারি করা হত। এর অনলিপিও এ বিভাগে সংরক্ষিত রাখা হত। আর সরকারী ঘোষণাপত্র নিবন্ধনকৃত খামে ভরে সরকারী সীল মোহর লাগানো হত। ফলে সরকারী ঘোষণা বা নোটিশ রদবদল হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গিয়েছিল।

e-ilm.weebly.com

আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে সিরিয়াতে রাষ্ট্রীয় কার্জে রোমান ভাষার প্রচলন ছিল। স্যারজুন রোমী নামে একজন খ্রিস্টান ঐ দফতরের প্রধান ছিল। এছাড়া স্যারজুন আমীর মু'আবিয়ার মজলিশে শুরার সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ফুযালা বিন উবাইদ আনসারী তার পর আবু ইদ্রীস খাওলানী প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। পুলিশ বহিনীর প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে হামজা হামদানী। তারপর যুমল বিন আমর আজরী পুলিশ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়। দিওয়ানে খাতাম বিভাগের প্রধান ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহসিন হিময়ারী। আর দেহরক্ষী বিভাগের প্রধান ছিলেন মুখতার।

প্রথম ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া
(৬০ হিঃ - ৬৪ হিঃ)

নাম ইয়াযিদ। পিতার নাম মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান। মাতার নাম বায়সূন বিনতে বাখ্‌দাল। ২৬ হিজরীতে হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফত কালে জন্মগ্রহণ করে। ঐ সময় হযরত আমীর মু'আবিয়া পুরো সিরিয়া অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিল। এ কারণে ধন-প্রাচুর্য্যের মধ্যেই তার জীবনযাত্রা শুরু হয়। ক্ষমতা ও সম্পদের মধ্যে বেড়ে উঠে। যৌবনের সূচনা লগ্নে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া কাব্য ও কবিতা রচনায় বেশী উৎসাহী হয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতাও লাভ করে। ভ্রমণ ও শিকারের নেশায় ঘুরে বেড়ানোর সখ ছিল প্রবল। তবে যুদ্ধের ময়দানের ধকল অসহনীয় ছিল।

পিতা তার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টায় ত্রুটি করেনি। কনসটান্টিনোপল অভিযানে তাকে জোরপূর্বক প্রেরণ করা হয়। দুই বার আমীরে হজ্জ মনোনীত করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ স্বভাবের উপর বিজয়ী হতে পারে নি।

খিলাফত লাভঃ

হযরত আমীর মু'আবিয়ার ইনতিকালেন পর ৬০ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহন করে। আমীর মু'আবিয়া জীবদ্দশায়ই তার উত্তরাধিকারীর বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানী কুরাইশ বংশধর হিজাজবাসীদের প্রান প্রিয় সরদার হযরত ইমাম হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. প্রমুখ ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণ করেননি। এ বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ হযরতগণ স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও বংশগত মর্যাদার কারণে উম্মাতের মাঝে বিরাট প্রভাব বিস্তারকারী ছিলেন। তাঁদের মতবিরোধ সাধারণ ব্যাপার ছিল না। সুতরাং সিংহাসনে আরোহন করার পর ইয়াযিদকে তাঁদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। তৎকালীন যুগে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালিদ বিন উতবা বিন আবী সুফিয়ান। ইয়াযিদ তাকে আমীর মু'আবিয়ার

e-ilm.weebly.com

ইনতিকালের খবর অবহিত করে এবং সব বুযুর্গগণের বাই'আত গ্রহণের জন্য জোর তাকিদ দেয়। ওয়ালিদ বিন উতবা এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিরসন কল্পে মারওয়ান বিন হাকামের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করেন। তিনি সে সময় মদীনাতেই ছিলেন। মারওয়ান পরামর্শ দিয়ে বললেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর সম্পর্কে চিন্তার কিছু নেই। তাঁরা তো ক্ষমতা গ্রহণের দাবীদার হবে না। তবে হুসাইন ইবনে আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কে এখুনি আহবান করে তাঁদেরকে ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণে বাধ্য করুন। তারা বাই'আত গ্রহণ করতে রাজী না হয় তাহলে জীবিত ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু যদি আমীরের মৃত্যুর খবর প্রচার হয়ে যায়। আর তাঁরা বাই'আত গ্রহণ না করে তাহলে তাঁরা স্বস্ব অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে ময়দানে এসে যাবে। তখন চতুর্দিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

ইমাম হুসাইন ও ইবনে যুবায়ের রাযি. এর ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণে অস্বীকৃতিঃ

ওয়ালিদ হযরত ইমাম হুসাইন ও ইবনে যুবায়ের রাযি. কে ডেকে পাঠান। ঐ বুযুর্গদ্বয় তখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। অসময়ে তাঁদের উভয়কে তলব করায় তারা উভয়ে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তাঁরা পরস্পর আলোচনা করেন, কিছু হোক না হোক, আমীরের ইনতিকাল হয়ে গেছে। আর আমাদেরকে বাই'আত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তলব করা হচ্ছে। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কতিপয় লোকজন সাথে নিয়ে ওয়ালিদের নিকট পৌঁছেন। তিনি সাথীদের বাইরে বসিয়ে বললেন, যদি তোমরা কোন রকম শোরগোল শুন তাহলে তৎক্ষণাত ভিতরে প্রবেশ করবে। ওয়ালিদ হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এ খবর শুনে اِنَّا لِلّٰهِ পাঠ করেন এবং আমীরের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। তখন ওয়ালিদ স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বাই'আতের আহ্বান করেন। তার প্রস্তাব শুনে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন,

"আমার মত ব্যক্তি গোপনে বাই'আত গ্রহণ করতে পারে না। আপনি একটি সাধারণ সভা আহ্বান করুন। আমিও তাদের সাথে যাব। উপস্থিত লোকজন যে অভিমত দেবে তাই গ্রহণ করা হবে।"

ওয়ালিদ দুষ্টু প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি তখন বললেন, আপনার প্রস্তাব যথার্থ হয়েছে। আপনি বিদায় নিতে পারেন। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. চলে যাবার পর ওয়ালিদ মারওয়ানকে বললেন, বড় আক্ষেপের ব্যাপার যে, তোমাদের মনোভাব হচ্ছে, আমি রাসূল ﷺ এর দৌহিত্রকে হত্যা করে ফেলি। আল্লাহর কসম কিয়ামত দিবসে যাকে হযরত হুসাইন রাযি. এর খুনের ব্যাপারে জবাবদেহী করা হবে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

e-ilm.weebly.com

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ওয়ালিদের কাছে একদিনের সময় চায়। কিন্তু তিনি রাতে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়ালিদ এই খবর জানার পর কতিপয় সংগী সাথী নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করে। হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি. এক অপরিচিত পথে যাত্রা করেন। ঐ সব লোক তাদের কোন খোঁজই পায়নি। তাই তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর মক্কা অভিমুখে যাত্রাঃ

দ্বিতীয় রাতে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. ও তার সহোদরা বোন উম্মে কুলসুম ও জয়নাব এবং ভাতিজা-ভাতিজি আবু বকর, জাফর, আব্বাস ও অন্যান্য আহলে বাইতগণকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে হানীফা রাযি. মদীনা ত্যাগ করা পছন্দ করেন নি। তিনি বিদায় হওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেন, "হে ভাই! আমার নিকট তোমার আপনার চেয়ে প্রিয় ও আদরের আর কে হতে পারে! ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণের অস্বীকৃতির বিষয়ে আপনার সাথে আমি এক মত। আপনি কখনো তার বাই'আত গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন স্থানে আপনি দূত প্রেরণ করে আপনার বাই'আত গ্রহণের আহবান পেশ করুন। যদি লোকজন আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তাহলে এর জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করবেন। আর যদি লোকজন আপনার বাই'আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে আপনার ইজ্জত-সম্মান বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হবে না। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি এমন কোন শহরে গিয়ে পৌঁছেন, আর ঐ শহরের লোকজন দু' দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আপনার হিতাকাংখী; অপরদল আপনার বিরোধী হয়ে যায়। তার পর উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর আপনি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বেরিয়ে আসেন। অবশেষে যে ব্যক্তি সত্ত্বাগত ও বংশগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ উম্মত, নিকৃষ্ট পন্থায় তার রক্ত ঝরানো হবে এবং তার পরিবার-পরিজনকে লাঞ্ছিত করা হবে।

তাঁর এ মর্মস্পর্শী উপদেশ শুনে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ভাই তাহলে আমি যাবো কোথায় ? মুহাম্মদ ইবনে হানীফা বললেন, আপনি মক্কায় অবস্থান করুন, যদি ওখানের পরিস্থিতি অনূকুল মনে করেন তাহলে তো ভাল! নতুবা মরুভূমির পথে পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাবেন। আর এক স্থান থেকে অন্যস্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে থাকুন। এভাবে আপনি রাজ্যের অবস্থা অনুধাবন করে পরবর্তী গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উত্তম হবে। সময় চলে যাবার পর আক্ষেপ করলে কোন লাভ হবে না।

(ইবনুল আছীর–৪/৭)

e-ilm.weebly.com

মক্কা যাওয়ার পথে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে আব্দল্লাহ ইবনে মুতির সাক্ষাত হয়। তিনি অবস্থা জানার পর হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর নিকট আরয করেন, "হযরত! আপনি যদি মক্কা ছেড়ে অন্য কোথায়ও যেতে চান তাহলে কখনো কুফায় যাবার চিন্তা-ভাবনা করবেন না! ওটা একটা অশুভ শহর। ওখানে আপনার পিতাকে শহীদ করা হয়েছে। ওখানে আপনার ভ্রাতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়েছে। আর তাকে ওখানে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বরং যথা সম্ভব আপনি হেরেম শরীফ ত্যাগ করবেন না। কেননা হিজাজ বাসীগণ আপনার মোকাবিলায় কাউকে প্রধান্য দেবে না। আপনি ওখানে অবস্থান করে আপনার হিতাকাংখীদের সহজে সমবেত করতে পারবেন।

(আখবারুত্ তুওয়াল–২৩০)

ওয়ালিদ হযরত ইবনে উমর রাযি. এর নিকটও ইয়াযিদের বাই'আত গ্রহণ করার বার্তা প্রেরণ করে। তিনি জবাব দেন, সকল লোক বাই'আত গ্রহণ করার পর আমি বাই'আত গ্রহণ করব। তার ব্যাপারে ওয়ালিদের তত বেশী চিন্তা ছিল না। কাজেই সে এ নিয়ে তাঁর সাথে বাড়াবাড়ি করল না।

মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা ॥

কুফা থেকে আহবান পত্র

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. মক্কা পৌঁছে শিয়াবে আবু তালিবে অবস্থান করেন। মক্কাবাসী এবং হজ্জ উপলক্ষে অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকজন হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর আগমনের খবর শুনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর খেদমতে হাযির হতে শুরু করে। তারা সর্বদা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে থাকত। তাঁর প্রতি ছিল নিবেদিতপ্রাণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কা'বা গৃহের একপাশে অবস্থান করতেন। তিনি সারা দিন নামায ও তাওয়াফে কাটাতেন। মাঝে মধ্যে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর নিকট এসে পরামর্শে যোগদান করতেন।

কুফাবাসীগণ প্রথম থেকে আহলে বাইতের সাহায্যের দাবীদার ছিল। এ কারণে হযরত আলী রাযি. মদীনা থেকে রাজধানী কুফায় স্থানান্তর করেন। কিন্তু সে কথা ভিন্ন, তাদের এ দাবী কখনো বাস্তবতার পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হয়নি।

কুফাবাসীগণ হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর ইনতিকালেন খবর জানার পর পুনরায় তাদের মনোভাব পরিবর্তন হতে শুরু করে। তাদের নেতা ছিল সুলাইমান বিন সারদ খাজায়ী। তার গৃহে গোপন পরামর্শ হয়। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে কুফায় আহবান করা হবে। তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে খিলাফতের দায়িত্ব ভার আহলে বাইতের উপর ন্যাস্ত করার চেষ্টা চালানো হবে।

e-ilm.weebly.com

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুফার নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক পত্র হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর নিকট এসে পৌছে।

সে সব পত্রাবলির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ–

"আল্লাহর শোকর যে, আপনার দুশমন চির নিদ্রায় শায়িত। তাই আমরা এখন ইমাম হারা হয়ে পড়েছি। আপনি এখানে আগমন করুন। তাহলে আমরা আপনার সাহায্যে সত্যের উপর সমবেত হব। আমরা কুফার গভর্নর নুমান ইবনে বশিরের পেছনে না জুমার নামায আদায় করি আর না ঈদের নামায আদায় করি। যদি আমরা জানতে পারি যে, আপনি আগমন করছেন, তাহলে আমরা তাকে সিরিয়ার উপকূলে তাড়িয়ে দিব। (ইবনুল আছীর– ৪/৪)

এসব চিঠি ছাড়াও কুফার বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে কুফা আসার আমন্ত্রণ জানান।

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল রাযি. এর কুফা গমন

সীমাহীন পীড়াপীড়ির কারণে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. তাঁর চাচাতো ভাই হযরত মুসলিম ইবনে আকীল রাযি. কে কুফার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কুফায় প্রেরণ করেন এবং কুফাবাসীদের নিকট নিম্নোক্ত জবাব লিখেন–

"আমি আপনাদের আগ্রহের ব্যাপারে অবগত হয়েছি। আমি আপনাদের নিকট আমার ভাই বিশ্বস্ত সাথী মুসলিম ইবনে আকীল রাযি.কে প্রেরণ করছি। তিনি বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে অবগত করবেন। যদি আমি জানতে পারি, কুফাবাসী সকলেই আমার খিলাফতের দীয়ত্ব গ্রহণে আগ্রহী, তাহলে ইনশা আল্লাহ! আমি কুফা পৌছতে বিলম্ব করব না। বস্তুতঃ ইমাম এমন লোক হওয়া উচিৎ, যে হবে আল্লাহর কিতাবের বাহক। ইনসাফের অনুসারী ও সত্য দ্বীনের অনুগত।

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল রাযি. মদীনা হয়ে কুফা পৌছে মুখতারের গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত আলী রাযি. এর অনুসারীগণ তাঁর নিকট স্রোতের মত দলে দলে আসতে শুরু করে। হযরত মুসলিম রাযি. তাদেরকে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর পত্র পাঠ করে শুনান। তারা কেঁদে কেঁদে প্রতিজ্ঞা করল, আমরা ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাহায্যে কোন প্রকার কার্পণ্য করব না। প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দেব।

ঐ সময় কুফার শাসনকর্তা ছিলেন নুমান ইবনে বশীর। তিনি সদাচারী ও সন্ধিপ্রিয় স্বভাবের লোক ছিলেন। সর্বদিকের পরিস্থিতি অবগত হওয়ার পর তিনি শুধু কুফার জামে মসজিদে এক ভাষণে বলেন– হে জনসাধারণ! ফিতনার পেছনে দৌড়াবে না। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করো না। তাতে প্রাণহানী ও সম্পদ ধ্বংস হয়। আমি মিথ্যা অপবাদ ও খারাপ ধারনার বিষয়ে জবাবদেহী

e-ilm.weebly.com

করব না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহের সূচনা কর, তাহলে আমি চোখ বুঝে থাকব না।"

তার উক্ত ভাষণ শুনার পর বনী উমাইয়াদের জনৈক সমর্থক দাঁড়িয়ে বলল, হে আমাদের প্রিয় আমীর! আপনি দুর্বলতা প্রকাশ করছেন। এত দুর্বলতা দেখালে কাজ হবে না। কিন্তু নুমান প্রতি উত্তরে বললেন, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করায় দুর্বলতা প্রকাশ করা তাঁর নাফরমানী করায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। ঐ ব্যক্তি পত্র মারফতে ইয়াযিদকে সব বিষয়ে অবগত করায় এবং বলে, যদি কুফায় আপনার রাজত্ব বহাল রাখতে চান, তাহলে কোনো কঠোর স্বভাবের লোককে কুফায় নিয়োগ দান করুন। নুমানের মত কোমল প্রকৃতির লোক দ্বারা কুফার বিদ্রোহ ধমন করা যাবে না। ইয়াযিদ সারজন রোমীর সাথে পরামর্শ করে বসবার সাবেক গভর্ণর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করে নির্দেশ দেয় যে, তুমি কুফা পৌছে মুসলিম রাযি. কে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে অথবা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কুফা গমন

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার ভ্রাতা বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে কুফায় পৌছে। ইবনে যিয়াদ কুফায় পৌছার সময় কাপড় দিয়ে মুখ ডেকে রাখে। অপর দিকে কুফাবাসীরা হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তারা ধারণা করেছিল, হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. আগমন করেছেন। সুতরাং সে যে রাস্তায়ই গমন করত জনসাধারণ স্বতঃ স্ফুর্ত ভাবে উচ্চস্বরে শ্লোগান দিত, স্বাগতম হে ইবনে রাসূল সা.! ইবনে যিয়াদ পর দিন কুফার জামে সমজিদে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলল–

আমাকে আমীরুল মুমিনীন কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। আমাকে অত্যাচারীদের সাথে ইনসাফ ও অনুগত লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ আর বিশ্বাস ঘাতক ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন কারীদের উপর কঠোরতা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি উক্ত আদেশ সঠিকভাবে পালন করব। বন্ধুদের সাথে আমি আমার সহোদর ভ্রাতার মত আচরণ করব। আর বিদ্রোহীদেরকে তরবারীর লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করব। সুতরাং জনসাধারণের কর্তব্য হল, নিজের প্রতি দয়া করা। তারপর সে নির্দেশ জারী করে যে, প্রত্যেক মহল্লার সরদার নিজ নিজ মহল্লায় অবস্থানকারী বিদেশী, সিরাজী ও সন্দেহভাজন লোকদের তালিকা আমার নিকট পেশ করবে। যদি কোন মহল্লাবাসী এ ব্যাপারে অলসতা করে এবং ঐ মহল্লায় কেউ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে মহল্লার সরদারকে তার গৃহের দরজায় ফাঁসীতে ঝুলানো হবে। পুরো মহল্লার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সকলকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।

e-ilm.weebly.com

হানীর গৃহে মুসলিম

মুসলিম রাযি. যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আগমন ও তার ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি মুখতারের ঘর থেকে বের হয়ে হানী ইবনে উরওয়া মুরাবীর গৃহে এসে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হানী তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে সাধ্যাতীত কষ্ট দিচ্ছেন। কিন্ত আপনি আমার দরজায় যখন এসেই গেছেন, তখন আমি আপনাকে বের করে দেব না। হানী তাকে অন্দর মহলে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দেয়।

হানীর গ্রেফতার

হযরত হুসাইন রাযি. এর অনুসারীগণ হানীর গৃহে সমবেত হতে শুরু করে। ইবনে যিয়াদ গুপ্তচরের মাধ্যমে একথা জানতে পেরে হানীকে তলব করে। অতঃপর জিজ্ঞাস করে, হানী! তোমার গৃহে আমীরুল মুমিনিনের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তুমি মুসলিমকে আশ্রয় দিয়েছ। তার জন্য জনবল ও অস্ত্র সংগ্রহ করছ। তথাপি তুমি ভাবছ, আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানিনা।

হানী চিন্তা করে দেখল অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। তাই সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মুসলিম তার গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু অপমান লজ্জায় সে তাকে ইবনে যিয়াদের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকার করে। ইবনে যিয়াদ হানীর সাথে দুর্ব্যবহার করে তাকে নিজ গৃহে বন্দী করে ফেলে।

শাহী মহল অবরোধ

মুসলিম ইবনে আকলী রাযি. যখন তার মেজবান এর গ্রেফতার হওয়ার খবর পেলেন, তখন يامنصورامته (হে বিজয়ী। আমার উম্মতকে সাহায্য করুন।) শ্লোগান দিতে শুরু করেন। এতদিনে মুসলিম রাযি. এর হাতে ১৮ হাজার লোক বাই'আত গ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে ৪ হাজার ছিল আশপাশের অধিবাসী। তাকবীর শুনে সবাই দলে দলে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মুসলিম রাযি. তাদের সাথে নিয়ে শাহী মহল অবরোধ করে ফেলেন। অন্যান্য লোক এ খবর শোনার পর তারাও বেরিয়ে আসে। এ ভাবে কুফার জামে মসজিদ হযরত হুসাইন রাযি. এর ৬ হাজার অনুসারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

মুসলিমের গ্রেফতার ও শাহাদাত লাভ

তখন ইবনে যিয়াদের নিকট ৩০ জন পুলিশ ও শহরের ২০ জন অভিজাত শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। ইবনে যিয়াদ শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলল, আপনারা স্ব স্ব গোত্রের লোকদের উপর আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করুন। তাদেরকে মুসলিমের দল ত্যাগ করে চলে যেতে বলুন। তারা ইবনে যিয়াদের নিকট থেকে বের হয়ে এসে স্ব-স্ব গোত্রের লোকদের ভয় দেখিয়ে ধমকাতে শরু করে। তারপর সাধারণ ক্ষমার ঝাণ্ড উত্তোলন করে। মুসলিম রাযি.

e-ilm.weebly.com

এর সঙ্গীরা ক্রমেই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। অবশেষে মাত্র ৩০ জন লোক তার সাথে থেকে যায়। মুসলিম রাযি. এ অবস্থা দেখে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিন্দাহ মহল্লা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখান পৌঁছতে পৌঁছতে সম্পূর্ণ একা হয়ে যান। অন্ধকার রাত ছিল। তিনি মাথা গুজার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পান এবং তার নিকট গিয়ে নিজের দুঃখের বিবরণ শুনান। তার মনে দয়ার উদ্রেক হলে সে তাকে এক কক্ষে নিয়ে গোপন করে রাখে। ইবনে যিয়াদ ইশার নামাযের পর মসজিদে ঘোষণা জারী করে, যে ব্যক্তি মুসলিম ইবনে আকীলকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেবে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে তাকে ধরিয়ে দিবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তারপর কুফার পুলিশ বাহিনীকে কুফার প্রতিটি গৃহে তল্লাশী চালানোর নির্দেশ দেয়। বৃদ্ধার ছেলে প্রাণের ভয়ে সরকারী বাহিনীকে মুসলিমের খবর জানিয়ে দেয়। ইবনে যিয়াদ মুসলিমকে গ্রেফতার করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে প্রেরণ করে। আশআস মুসলিমের আশ্রয় স্থান ঘিরে ফেলে। মুসলিম যখন জানতে পারেন যে, দুশমন মাথার উপর এসে গেছে, তিনি তখন বীরত্বের সাথে তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে যান। অথচ তিনি তখন সম্পূর্ণ একা ছিলেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বী লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। কিন্তু তিনি একাকী দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। কাউকে তার নিকট আসতে দেননি। অবশেষে মুহাম্মদ ইবনে আশআস বলল–

আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আপনি নিভয়ে আমাদের আশ্রয়ে আসুন। আপনি আমাদের পর নন। মুসলিমের দেহ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়। তিনি তখন নিরূপায় হয়ে নিজেকে মুহাম্মদ ইবনে আশআসের হাতে সঁপে দেন। রাস্তায় তিনি মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে বললেন, আমর ধারনা হচ্ছে, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারবেন না। কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ইবনে আশআস জিজ্ঞেস করল, কি সেই অনুরোধ?

মুসলিম বললেন, যে কোনো একজন লোক পাঠিয়ে আমার ভ্রাতা হুসাইনকে আমার অবস্থা জানাবেন। আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলবেন, দুনিয়াতে তিনি যেন কুফাবাসীদের প্রতারণায় পতিত না হন। এরা ঐ সব লোক, যাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর পিতা সর্বদা আকাঙ্খা করেছিলেন। আর তাঁকে বলে দেবে, তিনি যেন তাঁর পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে নিজ জন্ম স্থানে ফিরে যান। –ইবনে আছীর– ১৪/৪।

মুহাম্মদ ইবনে আশআস হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা করে। পরবর্তীতে সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল।

মুসলিম রাযি. কে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হয়। ইবনে যিয়াদ

e-ilm.weebly.com

তাঁকে অনেক গালাগালি করে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন। অবশেষে ইবনে যিয়াদ মুসলিম রাযি. কে নির্মমভাবে শহীদ করে ফেলে। এর পর ইবনে যিয়াদ হানী ইবনে উররাহকেও হত্যা করার নির্দেশ দেয়। মুহাম্মাদ ইবনে আশআস শহরে হানীর প্রভাব প্রতিপ্রত্তির কথা বিবেচনা করে তার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকেও হত্যা করে ফেলে। ইবনে যিয়াদ দুই শহীদের মস্তক ইয়াযিদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ইয়াযিদ তাঁদের মস্তক দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইবনে যিয়াদের নিকট পত্র প্রেরণ করে– "আমার মনে হয়, ইমাম হুসাইন রাযি. ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তুমি সতর্ক পাহাড়ার ব্যবস্থা কর। কারো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিলে, তাকে বন্দী করে ফেলবে। তবে কেউ যতক্ষণ তোমার বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার মুকাবেলায় তরবারী হাতে নেবে না। –ইবনে আছীর– ১৫

ইমাম হুসাইন রাযি. এর কুফা গমনে দৃঢ় প্রত্যয় ও শুভাকাংখীদের উপদেশ

মুসলিম ইবনে আকীল রাযি. কুফায় পৌছালে কুফার ১৮ হাজার লোক তাঁর হাতে হযরত হুসাইন রাযি. এর পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করে। তখন তিনি হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে পত্র প্রেরণ করেন–

আপনি নিশ্চিন্তে কুফায় চলে আসুন। ইরাকবাসীরা আপনার হিতাকাংখী ও বনী উমাইয়ার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। এবার তিনি কুফায় পৌছার প্রস্তুতি শুরা করেন। তাঁর সুভাকাংখীগণ তাঁর এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে তাকে বিরত রাখার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। আমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারছ বললেন, আমার মনে হয় আপনি ইরাক যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। অথচ ওখানের শাসকবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকজন বনী উমাইয়াদের সমর্থক। আর ওখানের সরকারী কোষাগারও তাদের দখলে। সাধারণ জনগণের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, যারা আজ আপনাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আগামী দিন তারা আপনার মুকাবিলায় মাঠে নামবে। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, ভাই! আমি আপনার কথা মান্য করি বা না করি। কিন্তু আপনি যে বাস্তবিকই শুভাকাঙ্খী সন্দেহের কিছুই নেই। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে, আপনি ইরাক যাচ্ছেন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনো এ ধরনের আকাংখা করবেন না। ইরাক বাসীগণ বনী উমাইয়াদের মনোনীত শাসকদের তাড়িয়ে দিয়ে কি রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে? যদি বাস্তবে এ ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই ইরাকে যাবেন। আর যদি বাস্তব অবস্থা এরূপ হয় যে, তাদের মনোনীত সরকার এখানো বহাল তবিয়তে আছে,

e-ilm.weebly.com

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের নিয়ন্ত্রণ তাদের দখলে, তাহলে কুফাবাসীগণ আপনাকে এ জন্য আহবান জানাচ্ছে যে, আপনাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে তারা আপনার পাশ থেকে সম্পূর্ণ সরে সরে দাঁড়াবে। এরা ঐ লোক, যারা আপনার পিতা ও ভাইয়ের সাথে এ ধরনের আচরণ করেছে। তিনি বললেন, আমি ইস্তিখারা করব। পর দিন পুনরায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এসে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আপনি কুফাবাসীদের নিকট যাবেন না। কুফাবাসীগণ বিশ্বাস ঘাতক! আপনি মক্কাতে অবস্থান করে তাদেরকে আপনার বাই'আত গ্রহণের আহবান করুন। আপনি হিজাজ বাসীদের সরদার। তারা আপনার আহবানে সাড়া দেবে। যদি আপনাকে মক্কা থেকে যেতেই হয়, তাহলে আপনি ইয়েমেনে গমন করুন। সেটি বিরাট দেশ। ওখানে অবস্থান করে ইসলামী সাম্রাজ্যে আপনার বাই'আতের আহবান জানান। আমার মনে হয়, তাতে আপনি সফলকাম হবেন।"

ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, ভাই আপনার স্নেহ মমতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে আমি ইরাক গমনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, যদি আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকেন, তাহলে নারী ও শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও হযরত উসমান রাযি. এর মত নারী ও শিশুদের সামনে রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে তড়ফাতে না হয়।

হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি. এ খবর জানার পর তিনিও তাকে অনুরোধ করে বললেন–

আপনি হেরেম শরীফে অবস্থান করে আপনার খিলাফতের আহবান জানান। আর ইরাক বাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করুন, তারা যেন এখানে এসে আপনাকে সাহায্য করে। আমিও এ ব্যাপারে আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা করতে প্রস্তুত। তাছাড়া হেরেম শরীফ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এখানে আসা-যাওয়া করে।

–ইবনে আছীর– ৪/১৫, ১৬; ওয়া আখবারুল আওয়াল।

কিন্তু হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. প্রতি উত্তরে বললেন– আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি যে, হেরেমের এক মেষ শাবক হেরেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কারণ হবে। আমি ঐ মেষ শাবক হতে চাই না।

ইমাম হুসাইন রাযি. এর কুফা অভিমুখে যাত্রা

অবশেষে ৬০ হিজরীর ৮ জিলহজ্জ হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. আপন জনদের সাথে নিয়ে মক্কা থেকে কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাফফাহ নামক স্থানে বিখ্যাত আরবী কবি ফারাযদকের সাথে সাক্ষাত হয়। সে ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। ইমাম হুসাইন তাকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, ইরাক বাসীদের অন্তর আপনার সাথে; কিন্তু তাদের

e-ilm.weebly.com

তরবারী বনী উমাইয়াদের পক্ষে রয়েছে। আর ফয়সালা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি বললেন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। যদি আল্লাহর ফয়সালা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করব। আর মৃত্যু যদি আমার ইচ্ছার বাঁধা হয়ে যায়, তাতে দুঃখ করার কিছুই নেই। আমার উদ্দেশ্য সৎ।" কিছু দূর সামনে অগ্রসর হওয়ার পর তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি ভীষণ অনুনয় বিনয়ের সাথে ফিরে আসার অনুরোধ করে বললেন– আমার ভয় হচ্ছে, হয়ত পথিমধ্যেই আপনার প্রাণনাশ এবং আপনার বংশধরদের সমাধি হয়ে যাবে।

তিনি সাথে করে মদীনার গর্ভনর আমর বিন সাঈদের লিখিত নিরাপত্তাপত্রও নিয়ে আসেন। কিন্তু ইমাম হুসাইন রাযি. স্বীয় ইচ্ছা পরিবর্তন না করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ছালাবীয়া নামক স্থানে পৌছার পর মুসলিম রাযি. এর শাহাদাতের খবর পান। তখন তার কোনো কোনো সফর সঙ্গী তাকে বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি! আপনি ফিরে চলুন। কুফায় আপনার সমর্থক বন্ধু বলতে কেউ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মুসলিম রাযি. এর পরিবারের সদস্যগণ বললেন, আমরা ফিরে যাব না। হয় আমরা মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধ নেব, না হয় নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেব। এ কথা শুনে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, তাদের ছেড়ে বেঁচে থাকার কোনো স্বাদ নেই।

এরপর তিনি জাবালাহ নামক স্থানে পৌছে তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে বাকতারে শাহাদতের খবর পান। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. আবদুল্লাহ ইবনে বাকতারকে মুসলিম রাযি. এর নিকট পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যখন কুফায় পৌছেন, তার আগেই মুসলিম রাযি.ও শহীদ করে ফেলা হয়েছে। ইবনে যিয়াদ তাকে প্রাসাদের ছাদ থেকে নিচে ফেলে হত্যা করে। এ সব খবর শোনার পর তিনি (ইমাম হুসাইন রাযি.) কুফার পরিস্থিতি ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তখন তিনি তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললেন–

কুফাবাসী আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের সাহায্যের আশা করা যায় না। সুতরাং তোমরা যারা ফিরে যেতে চাও চলে যেতে পার। তাতে কোনো আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হল।

এ ঘোষণা শোনার পর তাঁর অধিকাংশ বন্ধু-সমর্থক তাকে ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। শুধুমাত্র তাঁর বংশধর ও কতিপয় একান্ত নিবেদিত প্রাণ লোক সাথে থেকে যায়।

প্রতিবন্ধকতা

ইবনে যিয়াদ হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর কুফা অভিমুখে যাত্রা করার খবর পেয়ে যায়। সুতরাং সে ইয়াযিদের নির্দেশ অনুযায়ী মদীনা থেকে ইরাক অভিমুখে সব রাস্তার প্রবেশদ্বারে নিঃচ্ছিদ্র পাহারার ব্যবস্থা করে। সাথে সাথে হুর

e-ilm.weebly.com

ইবনে ইয়াযিদ তামিমীর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের এক অশ্ববাহিনীকে ইমাম হুসাইনের সন্ধান এবং তাঁকে অবরোধ করার জন্য পাঠায়।

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. যি-হাশম নামক স্থানে পৌঁছালে হুর ইবনে ইয়াযিদ তামিমীও তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছে এবং তার সৈন্যদের সম্মুখে তার স্পান করে

ইমাম হুসাইন রাযি. তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীদের বললেন, এসব লোকদেরকে পানি পান করাও। তাদের ঘোড়া সমূহকেও পরিতৃপ্ত করাও। তারা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এসেছে।

যোহরের নামাযের সময় হলে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. হুরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা আমাদের সাথে নামায আদায় করবেন না পৃথকভাবে আদায় করবেন। হুর বললেন, একত্রে নামায আদায় করব। সুতরাং উভয় বাহিনী একত্রে ইমাম হুসাইন রাযি. এর পিছনে যুহরের নামায আদায় করে। নামাযের পর হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. হুরের সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন– "হে লোক সকল! তোমাদের আহবানে আমি এখানে এসেছি। তোমরা আমার নিকট পত্র পাঠিয়েছ। দূত মারফত আমাকে এখানে আসার জন্য আহবান করে বলেছ– আপনি এখানে আসুন! আমরা আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করব। এখনো যদি তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে শহরে প্রবেশ করব। আর যদি আমার এখানে আসা তোমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে আমি আমার জন্ম স্থানে ফিরে যাব।

হুর বলল, আপনি এ সব চিঠি ও দূতের কথা কি বলছেন? আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। এর পর হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. দু' বেগ চিঠি বের করে কুফাবাসীদের সামনে ঢেলে দেন। হুর বলল, বেশ ভালো! আমরা এ সব চিঠি সম্পর্কে কিছুই অবগত নই। এ সব চিঠি আমরা লিখিও নি। আমাদেরকে তো শুধু এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমরা যেন আপনাকে গ্রেফতার করে কুফায় ইবনে যিয়াদের সামনে পৌঁছে দেই।

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, 'তা সম্ভব নয়। তারপর তিনি তাঁর সাথীদের ফিরে যাওয়ার আদেশ করেন। হুর বাঁধা দিয়ে বলল, আমি আপনাকে ফিরে যেতে দেব না।" তবে আপনার সাথে যুদ্ধও করব না। সর্বোত্তম হল, আপনি ইরাক ও হিজাজের মাঝামাঝি কোনো রাস্তা গ্রহণ করুন। আমি ইবনে যিয়াদকে লিখে পাঠাচ্ছি। আপনি ইয়াযিদকে কিছু লিখে দিন। হয়ত তাতে এমন কোন পথ বের হবে, ফলে আমাকে আপনার মুকাবিলা করতে হবে না।

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উত্তর দিকের নিনোয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর পেছনে পেছনে হুরও কিছু দূর পর্যন্ত আগ্রসর হয়। উযাইবুল হিযানাত নামক স্থানে পৌঁছার পর তারমাহ ইবনে আদীর

e-ilm.weebly.com

সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে বললেন, কুফায় আপনার বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি কখনও এত বিশাল সৈন্যকে ময়দানে সমবেত হতে দেখিনি। কাজেই আমার অভিমত হল, আপনি তাই গোত্রের প্রসিদ্ধ পাহাড় উজার পাদদেশে চলে যান। ওখানে গাসসান ও হিময়ারী বাদশাহগণও কখনো আপনার সন্ধান পাবে না। যদি আপনি ওখানে যেতে চান, তাহলে বনী তাদ্দিয়ের বিশ হাজার নিবেদিত প্রাণ লোকের জিম্মাদার হব আমি। তাদের তরবারী আপনার সমর্থনে উন্মুক্ত হবে।

কিন্তু হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, "হুরের সাথে আমার যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার হয়েছে, আমি তার বিপরীত কিছুই করতে পারব না।" নিনোয়া পৌঁছার পর হুর ইবনে যিয়াদের পত্র পায়। তাতে লেখা ছিলঃ

"হুসাইন ও তাঁর সাথীদেরকে অবিলম্বে অবরোধ করে ফেল। আর তাদেরকে এমন স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করো, যেখানে কোনো ছায়া-পানি নেই।"

হুর ঐ চিঠি হযরত হুসাইন রাযি. কে দেখায়। তিনি বললেন, আমাকে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হতে দাও। হুর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়। তিনি যখন কারবালা নামক স্থানে পৌঁছেন হুর তখন তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলল, আপনি আর এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না। এখানে অবস্থান করুন। এখান থেকে ফোরাত নদী নিকটবর্তী। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. ২ মহররম ৬১ হিজরীতে তাঁর মুষ্ঠিমেয় সাথীদের নিয়ে কারবালা ময়দানে পৌঁছেন।

কারবালায় অবস্থান

কারবালা ময়দানে অবস্থান করার দুদিন পর আমর বিন সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালায় এসে পৌঁছেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে ইবনে যিয়াদ রায় ও দাইলাম সীমান্তবর্তী এলাকার শাসক নিযুক্ত করেছিল। তিনি নিজ এলকায় পৌঁছার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইত্যাবসরে সে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর যাত্রার খবর পেয়ে যায়। ইবনে যিয়াদ তাকে ইমাম হুসাইন রাযি. কে প্রতিরোধ করার নির্দেশ প্রদান করে। আমর বিন সাদ অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাকে ধমক দিয়ে বলল, যদি তুমি আমার আদেশ পালনে অলসতা করো, তাহলে তোমাকে রায় ও দায়লাম সীমান্তবর্তী এলাকার শাসকের পদ থেকে অপসারণ করা হবে। আমর বিন সাদ ক্ষমতার লোভে ইবনে যিয়াদের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অপ্রস্তুত ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত সে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

আমর বিন সাদ হযরত হুসাইন রাযি. এর নিকট দূত মারফত জানতে চায়, আপনি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, আমাকে

e-ilm.weebly.com

কুফাবাসীগণ পত্র লিখেছে, আমাদের কোনো ইমাম নেই। আপনি এখানে আসুন! উক্ত পত্রের উপর নির্ভর করে এখানে এসেছি। পরে ১৮ হাজার কুফাবাসী আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ভঙ্গ করেছে। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি তা জানার পর আমার জন্ম স্থানে ফিরে যেতে চেয়েছি। কিন্তু হুর ইবনে ইয়াযিদ তামিমী আমাকে ফিরে যেতে বাঁধা দিয়েছে। আপনি আমার নিকট আত্মীয়। আমাকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথ করে দিন। আমর এ জবাব শুনে বলল– আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহর কসম! স্বয়ং আমিও চাই যে, হুসাইনের রক্তে আমার হাত রঞ্জিত না হোক। তারপর সা'দ ইবনে যিয়াদকে হযরত হুসাইন রাযি. এর অভিমত সম্পর্কে অবহিত করে। ইবনে যিয়াদ জাববে বলল–

"হুসাইনের নিকট থেকে ইয়াযিদ বাই'আত নিয়ে নাও। এরপর আমি তার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করব। যদি সে বাই'আত গ্রহণ না করে তাহলে তাঁর পানি সরবরাহ বন্ধ করে দাও।

পানি বন্ধ করে দেওয়া

৭মহররম আমর বিন সাদ হযরত হুসাইন রাযি. ও তাঁর সাথীদের জন্য ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে দেয়। নদীর তীরে পাঁচ শ' সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করে। ইমাম হুসাইন রাযি. তাঁর বাহাদুর ভ্রাতা আব্বাস বিন আলী রাযি. কে পানি আনার নির্দেশ দান করেন। তিনি ৩০ জন অশ্বারোহী ও ২০ টি মশক সাথে নিয়ে পানি আনার জন্য যান এবং জোরপূর্বক পানি নিয়ে আসেন।

যুদ্ধের তাকিদ

আমর বিন সাদ ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, যেন সমঝোতার কোনো রাস্তা বের হয়ে যায়। আর তার তরবারী আহলে বাইত নবুওয়াতের রক্তে রঞ্জিত না হয়। কাজেই সে যুদ্ধ সম্পর্কে টালবাহানা করতে থাকে এবং বারবার ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে সাক্ষাত করে।

এক রাতে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. ও আমর বিন সাদ উভয়ে সৈন্য বাহিনীর মাঝে সমবেত হন। আর সারা রাত আলোচনা চলতে থাকে। ইমাম হুসাইন রাযি. আমর বিন সাদকে বললেন–

"আমরা উভয় স্ব-স্ব বাহিনীকে এখানে রেখে ইয়াযিদের নিকট গিয়ে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে মীমাংসা করে ফেলি।

ইবনে সাদ বলল, ইবনে যিয়াদ আমার বাড়ী ঘর সব ধ্বংস করে দিবে।

ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন,

আচ্ছা তাহলে আপনি আমাকে আমার জন্ম স্থানে ফিরে যেতে দিন অথবা অন্য কোনো দিকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিন। তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী মীমাংসা করা যাবে।" কিন্তু ইবনে সাদ উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ

e-ilm.weebly.com

করে। বস্তুতঃ এ সবই ছিল নাম মাত্র বৈঠক। ইবনে সাদের সাথে ইমাম হুসাইন রাযি. যে আলোচনা হয়েছে, তা অত্যন্ত গোপনে হয়েছে। উক্ত আলোচনায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না।

তথাপি ঘটনা হল, ইবনে সাদ এসব আলোচনার আলোকে সমস্যা সমাধানের একটা মধ্যপথ পেয়েছিল। তিনি নিজের অভিমত সম্পর্কে ইবনে যিয়াদকে অবহিত করে। আর ইবনে সাদ ও হযরত হুসাইন রাযি. এর আলোচনার রিপোর্ট ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছতে থাকে। ফলে ইবনে যিয়াদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, না জানি কখন ইবনে সাদ ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে মিলিত হয়ে যায়। আর পাতানো খেলা ভেঙ্গে না যায়। সুতরাং সে সিমার জিল জাওশানের পরামর্শে ইবনে সাদকে লিখে পাঠায়ঃ

"আমি তোমাকে এজন্য প্রেরণ করনি যে, তুমি হুসাইনের মুকাবেলা করা থেকে তোমার প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবে? আর তাঁকে মিথ্যে আশার আলো দেখাবে অথবা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করবে অথবা তার পক্ষে সুপারিশ নিয়ে আমার নিকট আসবে। হুসাইন যদি নিঃশর্তে আমার আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। যদি তুমি আমার আদেশ পালনে অলসতা করো তাহলে আমি সিমার জিল জাওশনকে পাঠাচ্ছি, তোমার বাহিনী তার হাতে ন্যাস্ত করে দেবে এবং স্বয়ং তোমাকে পদচ্যুত মনে করবে।

ইবনে যিয়াদের এ ধমকের পর ইবনে সাদ স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় এবং সৈন্যদের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনা ৯ মহরম সন্ধ্যায় সংঘটিত হয়।

ইমাম হুসাইন রাযি. এ ঘটনা জানার পর এক রাতের অবকাশ চান। ইবনে সাদ এক রাতের অবকাশ দেয়। তখন ইমাম হুসাইন রাযি. এর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, তাঁকে সত্যের সাথে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে হবে। তাঁর রক্ত দ্বারা দুশমনরা তাদের পিপাসা মিটানো ব্যতীত কিছুই মানবে না। তিনি তাঁর সকল সংগী-সাথীদের সমবেত করে বললেন–

আমি আমার সাথীদের চেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর কাউকে পাইনি। আর আমার বংশধরদের থেকে বেশী নেককার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার দিক থেকে মমতাময়ী আর কাউকে পাইনি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আগামী দিন আমার ও দুশমনদের মাঝে শেষ বুঝাপড়া হবে। তাদের শুধু আমার প্রয়োজন। তাই আপনাদেরকে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। হে আমার সাথী বন্ধুগণ! আমার বংশধরদের সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে এখান থেকে চলে যান! স্বদেশে গিয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করুন!" কিন্তু তার প্রতি নিবেদিত প্রাণ সংগী-সাথীগণ এক বাক্যে বলল–

e-ilm.weebly.com

"আমরা আপনাকে ছেড়ে বাঁচব কিভাবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঐ দিনের জন্য জীবিত না রাখুন।"

তিনি এ জবাব শুনে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যান। এরপর যুদ্ধের চিত্র সম্পর্কে উপদেশ দান করেন এবং স্বীয় আহলে বাইতকে উপদেশ দিতে থাকেন।

তার সহোদরা ভগ্নি জয়নব বিনতে আলী রাযি. কে বেশী চিন্তাযুক্ত ও হতাশ হয়ে পড়তে দেখে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ভগ্নি! ধৈর্য্য ধারন করো। দেখো! দুনিয়াবাসী ও আসমানবাসী সকলেই ধ্বংসশীল। আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ব্যতীত কারো স্থায়িত্ব নেই। আমাদের এবং সকল মুসলমানদের কর্তব্য হল, হুযুর ﷺ এর সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ করা। হে ভগ্নি! তোমার খোদার কসম! যখন আমি সত্যের পথে মস্তক ছিন্ন করেছি, তখন তুমি আমার বিরহে পোশাক ছিন্ন করবে না। চেহারা নখ দিয়ে আচড়াবে না। উহঃ আহঃ করে শোক প্রকাশ করবে না। –ইবনে আছীর ২৪/৪।

এসব আয়োজন শেষ করে তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় পতিত হন। সারা রাত স্বীয় প্রভুর সাথে প্রোমালাপে মগ্ন থাকেন। তাঁর সংগী সাথীগণ সারা রাত নামায ও ইসতিগফার পাঠ করে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্না কাটি করেন।

শাহাদাতের সকাল

অবশেষে আশুরার ভোরের আলো প্রতিফলিত হয়। সূর্যও রক্তাশ্রু নিয়ে পূর্ব দিগন্তে উঁকি দেয়। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. নামায শেষ করে তার নিবেদিত প্রাণ ৭২ জন সংগী-সাথীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে হাজির হন। ডান পাশে যুহায়ের ইবনে কায়েন রাযি. ও বাম দিকে হাবিব ইবনে মুযাহির রাযি. কে নিযুক্ত করেন। আর আব্বাস বিন আলী রাযি. এর হাতে যুদ্ধের পতাকা ন্যাস্ত করেন। ইমাম হুসাইন রাযি. অশ্বারোহন করেন। পবিত্র কুরআন মজীদ এনে সামনে রেখে হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন।

"যদিও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোনো প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবে না। তথাপি পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্যে কুফাবাসীদের সম্বোধন করে নিম্নাক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

"হে লোক সকল! একটু অপেক্ষা কর। আমার বক্তব্য শুনে আমাকে আমার কর্তব্য সমাপ্ত করার সুযোগ দাও। যদি আমার কথা শুনে আমার সাথে ইনসাফ করেন, তাহলে তোমাদের চেয়ে সৌভাগ্যশীল আর কেউ হবে না। কিন্ত তোমরা যদি এর জন্য প্রস্তুত না হও, সেটা তোমাদের ইচ্ছা। তবে বাস্তব অবস্থা তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তখন তোমাদের যা খুশী তা করতে পারবে। আমার প্রতি কোন অভিযোগ আরোপ করতে পারবে না। আমার সাহায্যকারী আমার আল্লাহ।

e-ilm.weebly.com

হযরত ইমাম এ পর্যন্ত বলা মাত্রই তাঁর পরিবারের তাঁবুতে কাঁন্নার রোল পড়ে যায়। তিনি বলতে শুরু করেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সত্য কথাই বলেছেন। আমি যেন মহিলাদের সাথে না নিয়ে আসি। তারপর তিনি আব্বাস ইবনে আলী রাযি. কে মহিলাদের সতর্ক করার জন্য তাঁবুতে পাঠান। তারা নীরব হওয়ার পর তিনি পুনরায় তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বললেন–

হে লোক সকল! একটু চিন্তা করে দেখো, আমি কে? তারপর ভেবে দেখো, তোমাদের জন্য আমাকে হত্যা করা ও আমাকে অপমান করা বৈধ হবে কি? আমি কি তোমাদের নবীর দৌহিত্র নই। আমি কি তাঁর চাচাতো ভাই আলী মুরতাজা রাযি. এর সন্তান নই! সাইয়্যেদুস শুহাদা হামজা রাযি. আমার পিতার চাচা ছিল না। শহীদ জাফর তাইয়্যার কি আমার চাচা নয়! আমরা উভয় ভ্রাতা সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর প্রসিদ্ধ হাদীস তোমরা কি শ্রবণ করোনি? –এ হাসান ও হুসাইন রাযি. জান্নাত বাসীদের সরদার হবে। আর আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের চোখের শীলতা হবে। যদি আমার কথার কোনো গুরুত্ব নাও থাকে, তথাপি আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি নি। হুযুর ﷺ এর অনেক সাহাবী এখনো জীবিত আছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এরপরও কি আপনারা আমার রক্ত ঝরানো থেকে বিরত হবেন না। আপনাদের কি হুযুর ﷺ এর বাণীর সত্যতায় সন্দেহ আছে? কিংবা এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, আমি হুসাইন ফাতিমা জুহরা রাযি. এর পুত্র ?

যদি তোমাদের এ কথায় সন্দেহ হয়, তাহলে আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমে আমি ছাড়া নবীর কোনো দৌহিত্র ও ফাতিমার কলিজার টুকরা পাবেন না।

তোমরা আমাকে কেন হত্যা করতে চান? আমি কি তোমাদের কারো রক্ত ঝরিয়েছি? আমি কি তোমাদের কারো অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছি? আমি তোমাদের কোনো লোককে আহত করেছি? এর পর তিনি কতিপয় কুফাবাসী সরদারদের নাম নিয়ে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি আমাকে পত্র প্রেরণ করে আহবান করো নি ?

সে সব লোক বলল– না! আমরা আপনাকে আহবান করিনি। তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা আমাকে আহবান করেছ! কিন্তু এখন যদি আমার আগমন তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তোমরা আমাকে আমার নিরাপদ আশ্রয় স্থলে চলে যেতে দাও।"

উপস্থিত লোকদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি আমার চাচাতো ভাই ইবনে যিয়াদের মীমাংসা মেনে নিচ্ছেন না কেন? তা-ই তো আপনার জন্য উত্তম হত।" তিনি বলেন– আল্লাহর কসম! আমি নির্বোধের মত আমার হাত দুশমনের হাতে মেলাতে পারি না। গোলামের মত তাদের আনুগত্য করার অংগীকার করতে পারি না। আমি সকল প্রকার অহংকারী, যাদের কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস নেই, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইবনে আছীর– ৪/২৫-২৬।

e-ilm.weebly.com

হযরত হুসাইন রাযি. এর পদতলে হুর ইবনে ইয়াযিদ

ইমাম হুসাইন রাযি. এর এ মর্মস্পর্শি ভাষণ কুফাবাসীদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তবে হুর ইবনে ইয়াযিদ তামিমী ধীরে ধীরে ঘোড়া সামনে এগিয়ে নিয়ে আহলে বাইতের বাহিনীর সাথে একাত্ব যায় এবং হযরত হুসাইন রাযি. কে সম্বোধন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বংশধর! আমি ঐ ব্যক্তি, যে আপনাকে সর্বপ্রথম বাঁধা দিয়েছিল। কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, আমার স্ব-জাতি নির্মমতার চরম সীমায় পৌছে যাবে। আর তারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে না। তাই আমি আপনার পবিত্র কদমে আশ্রয় নিয়েছি। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। আল্লাহর কসম! বলুন, আমার একাজ আমার পূর্বের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি?

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. আবেগ আপলুত কণ্ঠে বললেন, অবশ্যই! হে হুর, দুনিয়াতে তোমার নাম হুর (আযাদ)। আল্লাহ ইচ্ছায় পরকালেও তুমি জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে।

এরপর হুর তার স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলল, হে আমার স্বজাতি বন্ধুগণ! হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে কোন প্রস্তাবই কি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়? যাতে তাঁর মুকাবিলায় তরবারী উত্তোলন করার অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবে?

আমর ইবনে সাদ বলল, আমি সন্ধি প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত আছি। তবে তা আমার ইখতিয়ার বহির্ভূত। এর পরপরই কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি প্রথমে তীর নিক্ষেপ করে। আর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদত লাভ

প্রথম মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষ থেকে একজন একজন করে এগিয়ে আসত আর প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত। এভাবে কুফাবাসীদের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কালবী, বারীর ইবনে হাসীর হুর ইবনে ইয়াযিদ তামিমী এবং নাফে ইবনে বেলাল প্রতিপক্ষকে মূলার মত কাটতে শুরু করে। এ অবস্থা দেখে শত্রুপক্ষ থেকে আমর ইবনে হাজ্জাজ চিৎকার করে বলল–

হে অশ্বারোহীগণ! তোমরা নিশ্চয় অবগত আছ যে, তোমরা কার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ। এরা ঐ লোক, যারা নিজেদের জীবনকে হাতের তালুতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এসেছে। তাদের সাথে মল্লযুদ্ধ করা কোনো মতে সমচীন হবে না। সকলে সম্মিলিতভাবে তাদের উপর হামলা করো। তারা সংখ্যায় যাই হোক। আল্লাহ কসম! যদি তোমরা তাদের প্রতি পাথরও নিক্ষেপ করো তাহলেও তারা মারা যাবে। এরপর ব্যাপক লড়াই শুরু হয়। হাতে গোনা কয়েক জন আহলে

e-ilm.weebly.com

বাইত পঙ্গপালরূপী কুফাবাসীদের প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ায়। হুসাইন রাযি. এর বাহাদুর বাহিনী যে দিকে আঘাত করতেন, শত্রু বাহিনীকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতেন। অথচ উভয় দলের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী সংগী সাথী আহলে বাইতের আলোক বর্তীকা সবাই শাহাদাতের শুরা পান করেন। এখন আহলে বাইতের নবযুবদের পালা আসে। আলী আকবর ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকীল, আদী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, আবদুর রহমান ইবনে আকীল, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, কাসেম ইবনে হুসাইন ইবনে আলী, আবু বকর ইবনে হুসাইন ইবনে আলী রাযি. প্রত্যেক স্ব-স্ব তরবারী উম্মুক্ত করে বীরত্ব প্রদর্শন করে জান্নাতের যুবকদের সরদারের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। অবশেষে ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে তাঁর চার ভাই আব্বাস, আবদুল্লাহ, জাফর ও উসমান রাযি. ছাড়া কেউ ছিল না। যতক্ষণ তাঁদের দেহ ছিল, তাঁরা ততক্ষণ প্রতিটি আক্রমণ বক্ষ পেতে নেন। অবশেষে একে একে শাহাদাতের শুরা পান করেন। এখন শুধু বাকী রইলেন ইমাম হুসাইন রাযি.। আঘাতে আঘাতে তার দেহ জর্জরিত হয়ে যায়। পিপাসায় অচেতন হয়ে পড়েন। তথাপি তাঁর উৎসাহ ও সাহসে কোনো ঘাটতি দেখা দেয়নি।

এ অবস্থায়ও তিনি যে দিকে তরবারী চালাতেন, সে দিকে শত্রুর দল বৃষ্টির মত গড়িয়ে পড়ত। অবশেষে তিনি অবসন্ন হয়ে জমিনে বসে পড়েন। আর এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় নীরব হয়ে বসে থাকেন। কিন্তু শত্রুদের কারও এ সিংহের উপর হামলা কারার সাহস হয়নি। তাঁর রক্তে নিজেদের ভাগ্যের উপর শেষ কলঙ্ক তিলক লাগানো থেকে প্রত্যেক লোক বিরত থাকার চেষ্টা করে। অবশেষে সিমার চিৎকার করে বলল–

এখন কার জন্য অপেক্ষা করছ? তাঁকে কেন হত্যা করছ না ? হযরত হুসাইন রাযি. স্বীয় শুকনু ঠোটে মাত্র পানির পাত্র লাগিছেন। এমতাবস্থায় হাসীন ইবনে নুমাইর লক্ষ্যস্থল ঠিক করে তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে যায়। তিনি ঘুরতে ঘুরতে ফোরাতের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছেন। দুশমনরাও চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে।

উরওয়া ইবনে শরীক তামীমী তরবারী দ্বারা আঘাত করে। সিনান ইবনে আনাস নাখঈ বর্শা নিক্ষেপ করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তরবারী দ্বারা দেহ থেকে পবিত্র মাথা ছিন্ন করে দেয়। –আখবারুল আতিওয়াল ২৫৫-২৫৬ পৃঃ

তাঁর পবিত্র দেহে ৩৩টি বল্লমের আঘাত, ৩০টি তরবারীর আঘাত ছাড়াও অন্যান্য ১৩টি আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর শাহাদাতের পর পাপিষ্ঠ অত্যাচারীরা আহলে বাইতের তাবু অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের যৎসামান্য যা কিছু সহায় সম্বল ছিল সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এমনকি মহিলাদের গায়ের চাদর পর্যন্ত জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর পুত্র জয়নাল আবেদীন ও আলী

e-ilm.weebly.com

আসগর রাযি. অসুস্থ হয়ে তাবুতে শায়িত ছিলেন। পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর সিমার তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমর বিন সাদ সতর্ক করে বলল, নারীদের তাঁবুতে প্রবেশ কর না। শিশুদের উপর তরবারী উত্তোলন কর না।

শাহাদাতের এ মর্মান্তিক ঘটনা ১০ মহররম ৬১ হিজরীর জুমার দিন সংঘঠিত হয়। পরদিন শোকাহত আহলে বাইত জানাযার নামায আদায় করে শহীদগণের লাশসমূহ ঐ স্থানে দাফন করে ফেলে। হযরত সাইয়েদুশ শুহাদার পবিত্র মস্তক ও অন্যান্য শহীদদের মস্তক দুশমনরা সাথে করে নিয়ে যায়। ফলে তাঁদের মস্তকহীন দেহকে দাফন করা হয়। রহিমাহুল্লাহ তা'আলা রাহমাতান, শামিলতান, কামীলাতান।

আহলে বাইতের কাফিলার সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা ঃ বিয়োগান্ত এই ঘটনার পর আহলে বাইতের কাফেলাকে ইবনে যিয়াদের নিকট কুফায় পাঠানো হয় এবং শুহাদায়ে কিরামের খণ্ডিত মস্তক তার সামনে পেশ করা হয়। ইবনে যিয়াদ হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর পবিত্র দাঁতে লাঠি দ্বারা আঘাত করে। এই করুন দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত হুযুর ﷺ এর সাহাবী হযরত যায়িদ বিন আরকাম রাযি. বললেন, আমি এ বেয়াদবীকে সহ্য করতে পারছি না। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজ চোখে হুযুর ﷺ কে এ পবিত্র ঠোটে চুম্বন করতে দেখেছি। এ পবিত্র ঠোটের সাথে বেয়াদবী করো না।

এ কথা বলে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে যান। ইবনে যিয়াদ বলল, যদি তুমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে না যেতে, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। হযরত যায়েদ রাযি. অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে চলে যান। এরপর ইবনে যিয়াদ আহলে বাইতের কাফেলা ও শহীদগণের খণ্ডিত মস্তক সিমারের পাহারায় দামেশকে ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করে।

ইয়াযিদের সামনে যখন হযরত হুসাইন রাযি. এর পবিত্র মস্তক রাখা হয় এবং সিমার এক ভাষণে স্বীয় সংগী-সাথীদের গৌরবময় ভূমিকার প্রশংসা বর্ণনা করে, তখন ইয়াযিদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। সে সিমারের উদ্দেশ্যে বলে,

তোমাদের জন্য আক্ষেপ। যদি তোমরা হুসাইন রাযি. কে হত্যা না করতে তাহলে আমি তোমাদের প্রতি বেশী সন্তুষ্ট হতাম। ইবনে মারজানার উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হোক। যদি তার স্থানে আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি হুসাইন রাযি. কে ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি স্বীয় রহমত নাযিল করুন। (আখবারুল আতরুল– ১৫৮)

ইয়াযিদের স্ত্রী হিন্দা বিনতে আবদুল্লাহ চাদর পরে দরবারে এসে বলতে শুরু করে, হে আমীরুল মুমেনীন। এটা কি রাসূল ﷺ এর কলীজার টুকরা হুসাইন ইবনে ফাতিমা রাযি. এর মস্তক? ইয়াযিদ বলল, হাঁ! এটা রাসূল ﷺ এর দৌহিত্র

e-ilm.weebly.com

হুসাইন রাযি. এর পবিত্র মস্তক। তোমরা তাঁর জন্য শোক পালন করো। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে অতিদ্রুত তাঁকে হত্যা করে ফেলেছে।

ইবনে আছীর– ৪/৩৫

তারপর ইয়াযিদ দরবারে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলে, তোমরা অবশ্যই জানো যে, এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কেন? হুসাইন রাযি. বলেছিল, আমার পিতা হযরত আলী রাযি. ইয়াযিদের পিতা থেকে উত্তম। আমার মা ফাতিমা যাহরা রাযি. তার মা থেকে উত্তম। আমার নানা আল্লাহর রাসূল ﷺ তার নানা থেকে শ্রেষ্ঠ। আর আমি নিজেও তার থেকে উত্তম এবং খিলাফতের অধিক হকদার। আমার পিতা খোদার সামনে নিজেদের বিষয় পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার পক্ষেই মীমাংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর মাতা রাসূল ﷺ এর কলীজার টুকরা ফাতিমা যাহরা রাযি. আমার মা থেকে উত্তম ছিলেন। আর তাঁর নানা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার নানা থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রত্যেক লোক যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে ঈমান রাখে, তারা কেউ কাউকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সমকক্ষ মনে করতে পারে না। কিন্তু তাঁরা পরিস্থিতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। কুরআন মজীদেরও এ আয়াতের উপরও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

"বলুন! হে আল্লাহ! বিশ্বজগতের মালিক। তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য দান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন যে, এ সব কথা ইয়াজিদের অন্তর থেকে উচ্চারিত হয়েছে, না তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। আর তার এ অশ্রুবর্ষণ শোক-দুঃখ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছিল, না রাজনৈতিক পলিসি ছিল। ইতিহাসে এ ধরনের অশ্রু বিসর্জনের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

হযরত ইউসুফ আ. এর ভ্রাতাগণও এ ধরনের অশ্রু বিসর্জন করেছিল। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,–

وَجَاءُوا اَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ

"এবং তারাও তাদের পিতার নিকট রাতে কাঁদতে কাঁদতে আসল।

(সূরা ইউসুফ-১৬৬)

আহলে বাইতের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইয়াযিদ আহলে বাইতে নবুওয়াতের নারীদের তার অন্দর মহলে স্থান দেয়। যেহেতু উভয় খান্দানের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, ফলে ইয়াযিদের বংশের মহিলাগণ তাদের শোক দুঃখে অংশ গ্রহণ করে। শুহাদায়ে কিরামের রাযি. জন্যও তাঁরা শোক প্রকাশ করে। ইয়াযিদ সে সময় ইমাম জয়নাল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন রাযি. কে নিজের সাথে শাহী দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াত।

e-ilm.weebly.com

কয়েকদিন আদর-আপ্যায়ন করানোর পর ইয়াযিদ আহলে বাইতের কাফিলাকে কিছু উপহার সামগ্রী দান করে জনৈক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দায়িত্বে মদীনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। বিদায়ের সময় ইয়াযিদ ইমাম জয়নাল আবেদীন রাযি. কে বলল, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, তা হয়েছে। আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। যদি অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের স্থানে আমি হতাম তাহলে কখনো এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। হুসাইন রাযি. আমার সামনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করতেন, আমি তা গ্রহণ করতাম। তাঁর প্রাণনাশ হতে দিতাম না। বৎস! যদি তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে জানাবে। সাকীর বিনতে হুসাইন রাযি. ইয়াজিদের এ আচরণে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেননি। সুতরাং তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বিরোধীতা কারীদের মধ্যে ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া থেকে উত্তম কাউকে পাইনি।

–ইবনে আছীর– ৪/৩৭।

হযরত হুসাইন রাযি. ও ইয়াযিদ

কারবালার এ দুঃখজনক বিয়োগান্ত ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বিরাট এক কলঙ্কিত অধ্যায়। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলামের পয়গাম্বর ﷺ এর ওফাতের অর্ধ শতাব্দি পর তাঁরই নাম উচ্চারণ কারী তাঁর আহলে বাইতকে অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃত মীমাংসা তো করবেন ঐ মহান ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেকের অন্তরের গোপন রহস্য সম্যক অবগত। প্রকাশ্য সব বিষয়ও পরিজ্ঞাত। তথাপি আমি জানি, ঐতিহাসিক হিসেবে আমারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কাজেই আমাদের বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এ কথাও সমর্থন করতে হবে যে, এ ধরনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার পেছনে ইসলামের সমষ্টিগত বিষয় জড়িত রয়েছে, তাতে দেখতে হবে যে, তা উম্মাতের উপযুক্ত অনুযায়ী হয়েছে কি না। এ বিষয়েও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যে, এর জন্য যুক্তিসংগত বাহ্যিক কোনো উপায় উপকরণ বিদ্যমান ছিল কি না? এটা স্বস্থানে ঠিক যে, ইয়াযিদ এক দুশ্চরিত্রবান দাম্ভিক ও ফাসিক ছিল।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, হযরত ইমাম হুসাইন, হযরত ইবনে উমর, ইবনে যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. প্রমুখ বুযুর্গদের মুকাবিলায় তার কোনো স্থায়িত্ব ছিল না। এ জন্য তার খিলাফত ইসলামের উন্নতি ও উদ্দেশ্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামে আইন ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না বটে। কিন্তু ঐ নিঃষ্প্রাণ দেহে তখনও প্রাণ বাকী ছিল। তাতে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাচক্রে এ অরাজক পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ খিলাফত কায়েমের দ্বিতীয় শর্ত পূর্ণাঙ্গ প্রভাব ও ক্ষমতা লাভ

e-ilm.weebly.com

তাও বিদ্যমান ছিল না। হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর যুগে ইয়াযিদের বায়'আত গ্রহণকে যদি নীতি গত দিক থেকে সমর্থন করা হয় আর হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর উক্তি, لاابايع لاميرين فى زمان واحد

এর উপর যদি দৃষ্টি নিবন্ধ করা না হয়, তাহলেও সে বাই'আত গ্রহণের যথার্থতা যথেষ্ট প্রশ্নসাপেক্ষ। ইসলামের তিন রাজনৈতিক কেন্দ্রের মধ্যে সিরিয়াবাসীগণ মনে প্রাণে বনী উমাইয়াদের সমর্থক ছিল। ইরাক-বাসীদের অবস্থা ছিল, ইরাকের প্রতিনিধির অভিমতকে ইরাকী শাসক গোষ্ঠি স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছিল। সাধারণ ইরাকবাসী এর জিম্মাদার ছিল না। খোদ আমীর মু'আবীয়া রাযি. এরও তা অজানা ছিল না।

সুতরাং ইরাকী প্রতিনিধিদল যখন ইরাক থেকে দামেস্কে পৌছে, তখন তিনি প্রতিনিধিদলের নেতাকে জিজ্ঞেস করেন–

بكم اشترى ابوك من هؤلاء دينهم

তোমার পিতা ঐ সব লোকদের ঈমান কত মূল্যে খরিদ করে নিয়েছে ?

তখন সে বলল– باربعمائة دينار তথা চারশ দিনারের বিনিময়ে খরিদ করেছে। (ইবনে আছীর– ৩/১৯৮

এখন বাকী রইলো হিজাজবাসীদের বিষয়। তাদের অভিমত উল্লেখিত ঐ চার বুজুর্গের অভিমতের উপর নির্ভরশীল ছিল। যখন বাস্তবে ঐ বুযুর্গগণ ইয়াযিদের বায়'আত গ্রহণই করেন নি, তখন সাধারণ হিজাজবাসীদের বায়'আত গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং হিজাজবাসীরা হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর ইনতিকালের পর মনে প্রাণে ঐ চার বুজুর্গের অনুসারী ছিল। আর একথাও এক বাস্তবতা ছিল যে, হিজাজের উপরে বনী উমাইয়াদের শাসন থাকা সত্ত্বেও "হারবার ঘটনা" এর মত রক্তক্ষয়ী ঘটনা ছাড়া হযরত মুয়াবীয়া রাযি. এর ওফাতের পর থেকে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদাত পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব হয়নি।

ইরাকবাসীগণ পত্র মারফত ও প্রতিনিদি দল প্রেরণের মাধ্যমে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তাদের কোনো ইমাম নেই। তারা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছে। মোটকথা, হযরত হুসাইন রাযি. এর সে সময়ের এ মহান উদ্দেশ্য (খিলাফতে রাশেদার নীতি) পুনর্জীবিত করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন উম্মাতের স্বার্থের খাতিরে। আর যদি তিনি খিলাফতের প্রার্থী হয়ে থাকেন, তাহলে তার এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

এখন বাকী রইলো উক্ত বিষয়ের বাহ্যিক কারণ কি ছিল ? পরবতী ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এ বিষয়ে হযরত হুসাইন রাযি. এর ইজতিহাদে ভুল হয়েছিল। তিনি তার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু ইরাককে নির্ধারণ করেন। অথচ বারবার পরীক্ষায় ইরাক বাসীরা লোভি, ভীতু ও বিশ্বাস ঘাতক প্রমাণ হওয়ার পরেও তিনি তাদের সাহায্যের উপর ভরসা করে হিজাজ ছেড়ে বের হয়ে

e-ilm.weebly.com

পড়েছেন। যদি হযরত হুসাইন রাযি. তাঁর অনুসারী ও হিতাকাংখীদের অভিমত এবং ইসলামের প্রাণ কেন্দ্রকে নিজের দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত করতেন, তাহলে হয়ত ইসলামের ইতিহাসের চিত্র অন্য রকম হত। কিন্তু লেখকদের কলম নীরব হয়ে যায়, যখন ইবনে আসিরের ঐ বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়।

হযরত হুসাইন রাযি. যখন স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের বাঁধা উপেক্ষা করে মক্কা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁর ভ্রাতা আদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. পথ আগলে ধরেন এবং বারবার ফিরে আসার অনুরোধ করেন। হযরত হুসাইন রাযি. তাঁকে নিশ্চুপ রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যখন কোনো ভাবেই তাঁর প্রস্তাব মানতে রাজি হননি, তখন তিনি তাঁর অন্তরের কথা বলছেন। তিনি বলল,

স্বপ্নে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি আমাকে একটি কাজ করার আদেশ করেছেন। আমাকে অবশ্যই সেই আদেশ পালন করতে হবে। চাই তার পরিণতি যাই হোক না কেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. জিজ্ঞেস করেন কি সে আদেশ ?

তিনি বললেন, "তা আমি কারো নিকট প্রকাশ করিনি। আর কারো নিকট প্রকাশও করব না, যে যাবত আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত না হই। –ইবনে আছীর–৪/ ১৭

যখন বাস্তব অবস্থা এই ছিল তখন বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রশ্নই আসতে পারে না। আর এ বিষয়ে আলোচনার ও কোন প্রয়োজন নেই যে, স্বপ্নের নির্দেশ শরী'আতের দলীল কিনা ? এ হচ্ছে প্রেম-ভালবাসার জগত। এ জগতের নিয়ম-নীতিও পৃথক হয়ে থাকে। –ইবনে আছীর ঃ ৪/১৭

بناكر دند خوش رسمے بخاك وخون غلطيدن

خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را

মাটি ও রক্তের মাঝে সৌভাগ্যতা বিনির্মাণ করা মারাত্মক ভূল, আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন পবিত্র এসব প্রেমিকদের প্রতি।

হাররার ঘটনা

হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদতের ঘটনা কোনো সাধারণ ব্যাপর ছিল না। ইসলামী বিশ্বে ইয়াযিদের এ নিষ্ঠুর নিমর্ম আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে। আর হিজাজ হয়ে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলতে শুরু করে। ইবনে যুবাইর রাযি. এ ঘটনা জানার পর সাধারণ জনসমাবেশে জ্বালাময়ী এক ভাষণে দেন,

"ইরাকবাসী বড় বিশ্বাস ঘাতক ও কাফির। তারা হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে আহবান জানিয়েছে। যখন তিনি ওখানে উপস্থিত হন, তখন তাকে অবরোধ করে ফেলে। নিঃশর্তে ইবনে যিয়াদের আনুগত্য মেনে

e-ilm.weebly.com

নিতে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য করে। হযরত হুসাইন রাযি. সন্দেহাতীত ভাবে জানতেন যে, তিনি মুষ্ঠিমেয় কতিপয় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পঙ্গপালরূপি শত্রুবাহিনীর মুকাবিলায় বিজয়ী হতে পারবেন না। তাই তিনি সম্মানের মৃত্যুকে অপমানের জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইরাকবাসীদের এ বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি শিক্ষনীয়; তবে যা আল্লাহর মঞ্জুর ছিল তাই হয়েছে। হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতের পরও কি আমরা ঐ সব লোকদের কথা ও কাজ মেনে নিতে পারি ?

আল্লাহর কসম! তারা এমন মহান সত্ত্বাকে শহীদ করেছে, যেই মহান সত্ত্বা দিনে রোযা রাখতেন। সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। বুযুর্গী ও দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধে ছিল। তার (ইয়াযিদের) থেকে খিলাফতের অনেক বেশী হকদার ছিল। তিনি কুরআনের হিদায়াতের মুকাবিলায় পথভ্রষ্টতাকে, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কান্নাকাঁটি করার মুকাবিলায় গান বাজনা করাকে, রোযা রাখার মুকাবিলায় শরাব পানকে আর মজলিশে বসে আল্লাহর যিকিরের মুকাবেলায় শিকারী কুকুরের আলোচনা করা পছন্দ করতেন না।

তাঁর এ ভাষণ শোনার পর জনসাধারণ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি. পর এখন আমাদের দৃষ্টি আপনার প্রতি পড়েছে। সুতরং আপনি প্রকাশ্যে বায়'আত গ্রহণের আয়োজন করুন। কিন্তু তিনি তখন প্রকাশ্য ময়দানে আসা সমীচীন মনে না করে নীরবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইয়াযিদের প্রথমে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। সে যখন তার প্রস্তুতি গ্রহণের খবর অবগত হয়, তখন সে কতিপয় ব্যক্তির হাতে শিকল দিয়ে তাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করে। ওখানের অনুকূল না থাকায় তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

৬২ হিজরীতে ইয়াযিদ উসমান ইবনে মুহাম্মদ বিন আবু সফিয়ানকে হিজাজের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করে। উসমান মদীনাবাসীদের দমন করার জন্য মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক প্রতিনিদি দল সিরিয়ায় প্রেরণ করে। ঐ প্রতিনিধি দলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আমর ইবনে হাফছ মাখজুমী ও মুনজির ইবনে জোহায়ের রাযি. প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা যখন ইয়াযিদের দরবারে উপস্থিত হন, তখন তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জমকালো আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। আর বিদায়ের সময় অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়। ইবনে হাকামকে একলাখ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আর মুনজির ইবনে যুবায়েরকে ১লাখ রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হয়।

কিন্তু ইয়াযিদের এ ব্যবস্থা উপকারের চেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াযিদের

e-ilm.weebly.com

আচার-আচরণ তাঁরা স্বচোখে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। তাই তারা তার বিরোধী হয়ে যায়। আর মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করে বলে, আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, যার দ্বীনের সাথে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। মদ্যপান, তামাশা, ভ্রমণ ও শিকার নিয়ে সে ব্যতি-ব্যস্ত। দুষ্টু লম্পট লোকজন তার অতিপ্রিয়। আমরা তার বায়'আত ভংঙ্গ করে ফেললাম। আর তার দেওয়া অর্থ তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কাজে ব্যয় করব।

তখন মদীনাতে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে। মদীনা বাসীগণ উসমান ইবনে মুহাম্মদকে পদচুত্য করে দেয় এবং আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রাযি. কে নিজেদের গর্ভনর মনোনীত করে। মদীনাতে বসবাসকারী উমাইয়া বংশধরগণ ইয়াযিদকে মদীনার অবস্থা জানিয়ে দেয়। ইয়াযিদ তখন নমনীয়তার সাথে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল। তাই সে নুমানকে ইবনে বশির মদীনায় প্রেরণ করে। সে এসে মদীনাবাসীদের বুঝানোর চেষ্টা করে, দুশমন ভীষণ শক্তিশালী। তোমরা তার মুকাবিলায় বিজয়ী হতে পারবে না। কাজেই তার আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু নুমানের প্রস্তাব কেউ মানতে রাজী হল না।

নুমান বিন বশীর মদীনা থেকে বিদায় নেওয়ার পর মদীনাবাসীগণ সমস্ত উমাইয়া বংশধরদের মারওয়ান ইবনুল হাকামের গৃহে বন্দী করে ফেলে। উমাইয়াদের এক ব্যক্তিকে ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করে। সে মদীনার অবস্থা ইয়াযিদকে অবহিত করে। ইয়াযিদ হিজাজের সাবেক গভর্নর আমর বিন সাদকে পুনরায় মদীনায় যাওয়ার আদেশ করে। কিন্তু আমর ইয়াযিদের আদেশ অমান্য করে বলল, আমি কুরাইশদের রক্ত ঝরানোর জন্য সেখানে যেতে পারব না। তার পর ইয়াযিদ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে মদীনায় সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দেয়। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদও ইয়াজিদের আদেশ অমান্য করে বলল " আমি ইয়াযিদের জন্য রাসূল ﷺ এর বংশধরদের হত্যা করেছি। আর এখন হারামাইন শরীফাইনের অবমাননা করে দুটি বড় গুনাহকে একত্রিত করতে পারব না।

অবশেষে লঠারীতে এই জঘণ্য কাজের জন্য মুসলিম ইবনে উকবা মারবী নাম আসে, সে ছিল বৃদ্ধ ও রুগ্ন। কিন্তু সে ঐ অবস্থায় ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঐ বাহিনীতে যোগদানকারী সৈন্যদের ভাতা ছাড়াও মাথা পিছু প্রত্যেককে একশ' স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের লোভ দেখানো হয়।

যাত্রা পথে ইয়াযিদ মুসলিমকে উপদেশ দেয় যে, মদীনা বাসীদেরকে তিন বার আনুগত্যের আহবান জানাবে। যদি তারা এ আদেশে সাড়া না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করবে। সফলতা লাভে পর তিন দিন পূরা মদীনা নগরী লুণ্ঠন করবে। তিন দিন পর লুণ্ঠন বন্ধ করবে। আলী ইবনে হুসাইন

e-ilm.weebly.com

রাযি. কে কোনো কষ্ট দেবে না। তার চিঠি আমার নিকট পৌছেছে। সে এ বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আছে।

মুসলিম ইবনে ওকবা সিরিয়ার সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। মদীনাবাসী একথা জানতে পেরে বন্দীকৃত উমাইয়াদের সাথে কঠোর আচরণ শুরু করে এবং তাদেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু উমাইয়্যাগণ বলল, তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা শপথ করে বলছি, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে মুসলিমকে সাহায্য করব না। আমরা তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ও তার নিকট প্রকাশ করব না। মদীনা বাসীরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। ওয়াদিয়ে কুরা নামক স্থানে মুসলিমের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। আমর ইবনে উসমান বিন আফফান রাযি. কে ডেকে নিয়ে মুসলিম মদীনার খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করে। আমর বিন উসমান বললেন, আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছি যে, আপনাকে কোনো কথা বলব না।" মুসলিম উত্তেজিত হয়ে বলল, যদি তুমি হযরত উসমানেন পুত্র না হতে তাহলে আমি তোমাকে এক্ষুণি হত্যা করে ফেলতাম। তারপর মুসলিম, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে তলব করলে সে তাকে মদীনার সব অবস্থা-পরিস্থিতি খুলে বলল–

"এখান থেকে অগ্রসর হয়ে নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করুন আর ওখানের খেজুর ভক্ষণ করুন। পর দিন সকালে মদীনাকে বাম পাশে রেখে সামনে অগ্রসর হবেন। তারপর ঘুরে হারবার পূর্ব দিক দিয়ে আপনরারা মদীনায় প্রবেশ করবেন। তাহলে আপনাদের সূর্যোদয়ের কষ্ট ভোগ করতে হবে না। বরং মদীনা বাসীদের তা ভোগ করতে হবে। আর যখন সূর্যের আলো আপনাদের উপর ও অস্ত্র-শাস্ত্রের উপর পড়বে তখন শত্রুদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

মুসলিম আবদুল মালেকের প্রস্তাব সমর্থন করে হারবার দিক থেকে মদীনাকে অবরোধ করে ফেলে। ইয়াযিদের নির্দেশ মোতাবেক মুসলিম মদীনাবাসীদেরকে আনুগত্যের প্রস্তাব দিয়ে তিন দিনের অবকাশ দেয়। কিন্তু মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের বায়'আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অবশেষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

মদীনাবাসীগণ বিপুল পরিমান অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ময়দানে আসে। এ অবস্থা দেখে সিরিয়াবাসী সৈন্যগণ ভীত হয়ে যায় এবং তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। মুসলিম সৈন্যদের অনেক গাল মন্দ করে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতে শুরু করে। মদীনা বাসীগণ ভীষণ বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। হঠাৎ তারা তাদের পিছনের দিক থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনতে পায়। বুঝতে পারে বনু হারেছা মিসরীয় সৈন্যদের মদীনায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এ খবর শুনে মদীনাবাসীদের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে হয়ে যায়। তারা পলায়ান করতে শুরু করে। এ পলায়নের সময় মদীনার খন্দকের কথাও তাদের স্মরণ ছিল না। সুতরাং অনেকে খন্দকে পতিত হয়ে প্রাণ হারায়। তাদের সংখ্যা নিহতদের চেয়ে

e-ilm.weebly.com

অনেক বেশী ছিল। ঐ বিজয়ের পর মুসলিম মদীনা লুণ্ঠন করার নির্দেশ দেয়। তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় গণহত্যা ও লুটতরাজ চলতে থাকে। তারপর মুসলিম ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি এ শর্তে ইয়াজিদের বায়'আত করবে যে, তার জান মালের সকল প্রকার নিরপত্তার দেওয়া হবে। তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যারা বাই'আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। এই ঘোষণা কঠোরভাবে কার্যকর হয়। আর যারা উচ্চবাচ্য করেছে, তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে ফেলা হয়। ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম ইমাম জয়নাল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন রাযি. কে এ ধরনের বায়'আত গ্রহণে বাধ্য করেনি। তার সাথে সম্মান জনক আচরণ করে। এ নির্মান বর্বোরচিত ঘটনা ইয়াজিদের কপালের দ্বিতীয় কলঙ্ক তিলক। যা ২৮ জিলহজ্ব ৬৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। এ জঘন্য ঘটনায় কুরাইশদের সম্মানিত বুজুর্গ আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা, ফযল বিন আব্বাস বিন রাবীয়া, আদুল্লাহ বিন মুতীয়া রাযি. প্রমুখ শাহাদত বরণ করেন।

মক্কা অবরোধ

নুমান বিন বশীর মদীনাবাসীদের সাথে আলোচনা করার জন্য আসার পর এখান থেকে বিদায় হয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। মক্কা পৌছে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. কে ইয়াজিদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়। কিন্তু হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. নিজেকে ইয়াজিদের সাথে তুলনা করার পর নুমানকে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কি আপনি আমাকে এ পরিস্থিতিতে ইয়াযিদের বায়'আত গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন? নুমান বলল, আপনার মর্যাদা আমার জানা আছে। আমি না আপনাকে এ ধরনের কোনো পরামর্শ দেব, আর না ভবিষ্যতে এ উদ্দেশ্যে আপনার সাথে সাক্ষাত করব। মদীনার বিদ্রোহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর আহবানের পরিণতি ছিল। এ কারণে ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী মদীনা নগরীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার পর মুসলিম বিন উকবা মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। মুসলিম বৃদ্ধ ও পুরাতন রোগাক্রান্ত ছিল। মাশআলা নামক স্থানে পৌছার পর মৃত্যুর ফিরিশতা তাকে আর সে অবকাশ দেয়নি। মুত্যুর সময় সে বলেছিল, হে আল্লাহ! তোমার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালাতে বিশ্বাস করার পর আমার সবচেয়ে উত্তম আমল, যার উপর আমি আখেরাতের সাওয়াবের আশাবাদী ব্যাপকহারে মদীনা বাসীদের হত্যা করা। –ইবনে আসির– পৃঃ ৪/৪৯

মুসলিম হুসাইন ইবনে নুমাইরকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে ছিল। হুসাইন বিন নুমাইর ২৬ মহররম ৬৪ হিঃ মক্কা পৌছে শহর অবরোধ করে ফেলে। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. প্রথমে মক্কা থেকে বের হয়ে দুশমনদের মুকাবিলা করেন। ভীষণ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁর ভ্রাতা হযরত মুনযির ইবনে যুবাইর শহীদ হন। অবশেষে তিনি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা

e-ilm.weebly.com

করেন, উভয় দলের মাঝে থেমে থেমে যুদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু শত্রু বাহীনী মক্কা জয় করতে পারেনি। অবশেষে হুসাইন ইবনে নুমাইর ৩ রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরীতে মিনজানীকের সাহায্যে অগ্নিগোল নিক্ষেপ করে। এতে কাবা গৃহের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কা'বার গেলাফ ও দরজা পুড়ে যায়। -ইবনে আছীর- ৪/৪৯

এক দিকে যুদ্ধ চলছিল, অপর দিকে সিরিয়া থেকে ইয়াযিদের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছে। এতে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়।

বিজয়

আফ্রিকা বিজয়

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, উকবা ইবনে নাফে রাযি. কে আমীর মু'আবিয়া রাযি. পুনরায় আফ্রিকার গভর্নর নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার জীবন তাঁকে সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার অবকাশ দেয়নি। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদ ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে। উকবা তাৎক্ষণিক ভাবে কায়রোয়ান পৌঁছেন। আর ওখানের শাসনকর্তা আবুল মুহাজিরকে গ্রেফতার করে ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু উকবা একই স্থানে বসে থেকে স্বাদ উপভোগ করতে রাজী ছিলেন না। তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতির গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সভাসদদের সমবেত করে বললেন, "আমি আমার প্রাণকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বিক্রয় করে দিয়েছি। সুতরাং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাব।" তাই তিনি যুবাইর বিন কায়েস বিলবীকে কায়রোয়ানে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন।

প্রথমে বাগাহ পৌঁছে ওখানে বিরাট এক রোমান বাহিনীর বাঁধার সম্মুখীন হন। ফলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। আর বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ হস্তগত হয়। রোমান বাহিনী পরাজিত হয়ে শহরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। উকবা তাদেকে কিছু দিন অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু বেশী দিন অবরোধ করে রাখা ঠিক হবে না মনে করে অবরোধ তুলে নেন। তারপর জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ এলাকা ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। এখানে অনেক শহর-নগর ছিল। উকবা জাবের সর্ববৃহৎ শহর আরীয়াহ পৌঁছে অবস্থান করেন। আরীয়াহতে রোমান খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ হয়। এতে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। অনেক দুশমন নিহত হয়। কিছু সংখ্যক রোমান পাহাড়ী এলাকায় পলায়ণ করে। উকবা রাযি. সেখান থেকে কাহেরাতের পথে এগিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার রোমানরা মুসলমানদের আক্রমনের কথা জানতে পেরে বিপল সংখ্যক বারবারীদেরকে নিজেদের সাহায্যের জন্য ডেকে আনে। এ অবস্থায় মুসলমানদের ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অবশেষে মুসলমান বিজয়ী হয়। আর বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ হস্তগত হয়।

e-ilm.weebly.com

কাহিরাত থেকে উকবা তানজায় পৌঁছে। এটা আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকার সর্বশেষ শহর। এখানে শাসক জুলিয়ান মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। হাসি মুখে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়। তানজা থেকে উকবা সূস আদনা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে বারবারীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ফলে বিপুল সংখ্যক বারবারী নিহত হয়। আর অবশিষ্ট বারবারীরা পলিয়ে যায়। তারপর সূস আকসায় আশ্রয় নিয়ে বারবারীরা যুদ্ধের জন্য সংঘটিত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের পরাজিত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ লাভ করে।

উকবা একের পর এক রাজ্য জয় করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি স্থল ভাগ জয় করে ভূ-মধ্য সাগরের তীরে পৌঁছে বললেন,

হে আল্লাহ! যদি এ মহাসাগর আমার সামনে বাঁধার সুসৃষ্টি না করত, তাহলে আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়ে যেতাম।

–ইবনে আসির– ৪/৪৯

উকবা ওখান থেকে ফিরে মাউল কারাস হয়ে তানজা পৌঁছেন। উকবার বিজয় এতো ভীতি সঞ্চার করে যে, তার বাহিনী যে স্থান অতিক্রম করত সে স্থানে রোমান ও বারবারীরা ঐ স্থান ছেড়ে পলায়ণ করে অন্যত্র চলে যেত। উকবা এ বিজয় উল্লাসে তার বাহিনীকে বিভক্ত করে দেন। মাত্র ক্ষুদ্র একদল নিয়ে তিনি তাহোযাহ পৌঁছেন। সেখানকার রোমানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রোমানরা তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তাহোযাহর খ্রিষ্টানরা এক প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তাতে উকবার পুরো বাহিনীর সলিল সমাধি হয়।

এর বিস্তারিত বিবরণ হল, কাসিলাহ ইবনে মুকাররম একজন প্রভাবশালী বারবারী নেতা ছিল। সে আবুল মুহাজির শাসনকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আবুল মুহাজির তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় তার দাপট আরো বেড়ে যায়। কাসীলাহও স্বীয় কৃতকর্মে তা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। উকবা যখন পুনরায় গভর্নর হয়ে আসে; তখন আবুল মুহাজির তার নিকট কাসীলাহ সম্পর্কে সুপারিশ করে। আর তার মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেয়। উকবা কাসীলাহকে আবুল মুহাজিরের লোক মনে করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করেনি। তাকে একবার পশু যবাই করতে বাধ্য করে। কাসীলার নিকট তা ভীষণ অপমানজনক মনে হয়। তাই সে ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং উকবার উপরে এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু তার বাহ্যিক আচার-আচরণের কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। তাহোযার রোমান খ্রিস্টান অধিবাসীরা এ বিষয়ে অবগত ছিল। উকবার তাহোযার দূর্গ অবরোধ করে তথায় অবস্থান করছিল।

e-ilm.weebly.com

তাহোযার রোমানগণ কাসীলার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে, যদি উকবার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তাহলে এখনই তার উপযুক্ত সময়। আর তোমার দলবল নিয়ে এক্ষুণি চলে এসো। উকরার নিকট এখন হাতে গোনা কয়েক জন সৈন্য আছে। তাদের পরাজিত করা অতি সহজ। তদোপুরি আমরা তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি। কাসীলা এ সংবাদ জানার পর বিরাট বাহিনী নিয়ে পিছনের দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। ফলে মুসলমানগণ দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়। মুষ্ঠীমেয় মুসলমান বাহিনী প্রাণপণে লড়াই করে অবশেষে সকলে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে উকবা ইবনে নাফে আবু মুহাজিরকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আপনি ফিরে চলে যান এবং মুসলমানদের দেখাশুনা করুন। কিন্তু তার পক্ষে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করা দুঃস্কর হয়ে পড়ে। উকবার সাথে সাথে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হন। তাহোযার পরাজয় আফ্রিকায় মুসলমানদের ক্ষমতার ভিত নড়বড়ে করে দেয়। যুহাইর ইবনে কায়েস বিলভী কায়রোয়ানে মুসলমানদের সংঘঠিত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাতে মুসলমানগণ এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়নি। অবশেষে যুহাইর কায়রোয়ান ত্যাগ করে বরকা চলে আসেন। আর ফাসীলাহ কায়রোয়ান দখল করে নেয়। কায়রোয়ান ৬৯ হিজরী পর্যন্ত কাসীলার দখলে থাকে।

খোরাসান বিজয়

৬১ হিজরীতে ইয়াযিদ মুসলিম ইবনে যিয়াদকে খোরাসান ও সিজিস্তানের গভর্নর মনোনীত করে। আর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, ছয় হাজার অশ্বারোহী বাহিনীকে আমার ভ্রাতা মুসলিমের নেতৃত্বে ন্যাস্ত করে দিবে। মুসলিম ঐ বাহিনীকে সাথে নিয়ে। জায়হুন নদী পার হয়ে দিলেন। যাতে ইমরান বিন ফুযাইল, মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাহ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. প্রমুখ অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তারা জাইহুন নদী অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হন। খাওয়ারিজমের নিকটবর্তী খোরাসান-তুর্কিস্থানের সরদারগণ এ শহরকে তাদের কেন্দ্রে পরিণত করে নিয়েছিল। শীতের মৌসুমে যখন মুসলমান শাসক মারওয়া শাহজাহান চলে যেত, তখন ঐ সদরদারগণ সমবেত হয়ে নানা ফন্দি আটত এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার ষড়যন্ত্র করত। মুসলিম থেকে অনুমতি নিয়ে মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাহ শহর অবরোধ করে ফেলে। এখানে সরদারগণ ৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদের বিনিময়ে মুহাল্লাবের সাথে সন্ধি চুক্তি করে। এর পর মুসলিম সমরকন্দ ও খাজন্দান আক্রমণ করে।

সিজিস্তান বিজয়

মুসলিম ইবনে যিয়াদ তার ভ্রাতা ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদকে সিজিস্থানের গভর্নর মনোনীত করে। কিন্তু কাবুলবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবু উবায়দ ইবনে

e-ilm.weebly.com

যিয়াদকে বন্দী করে ফেলে। ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা করে। কিন্তু পরাজিত হয় এবং অনেক মুসলমান শহীদ হয়ে মুসলিম ঐ বিপর্যয়ের খবর জানতে পেয়ে তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ খুযাঈকে পাঠায়। সে পাঁচ লাখ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে আবু উবায়দকে মুক্ত করে নেয়। এরপর তালহা সিজিস্তানের গর্ভনর নিযুক্ত হয়। সফলতার সাথে শাসনকার্য পরিচলনা করে ইন্তিকাল করে।

ইয়াযিদের মৃত্যু

১৪ রবিউল আউয়াল ৬৪ হিঃ (১০ নভেম্বর ৬৮৩ খ্রিঃ) ইয়াযিদের জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। ৩ বছর ৮ মাস ১৪ দিন সে রাজত্ব করেছিল।

ইয়াযিদের সন্তান

ইয়াযিদ উম্মে হাশেম বিনতে উতবা বিন রাবিয়াকে বিবাহ করে। তার ঔরসে দু' পুত্র মু'আবিয়া ও খালিদের জন্ম হয়। উম্মে কুলসুম বিনতে আবদুল্লাহ বিন আমেরকে দ্বিতীয় বিবাহ করে। তার গর্ভে এক পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। এছাড়াও উম্মে ওয়ালাদ গুলো থেকে ইয়াযিদের এ সব পুত্র আবদুল্লাহ, আসগর, উমর, আবু বকর, উতবা, হরব ও আবদুর রহমানের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় মু'আবিয়া

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরীর রবউিল আউয়াল মাসে পুত্র মু'আবিয়া ইবনে ইয়াযিদ দামেশকের সিংহাসনে আরোহন করে। মু'আবিয়া ২১ বছরের সৎ নেককার যুবক ছিল। ইয়াজিদের শাসনামলে উমাইয়া সিংহাসনে আহলে বাইতের সাথে যে নিষ্ঠুর নিমর্ম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তা তার নিকট অসহনীয় ছিল। তাছাড়া সে অসুস্থও ছিল। বায়'আত গ্রহণের চল্লিশ দিন পর খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেয়–

"আমি খিলাফতের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অক্ষম। আমি চাই, আপনারাও হযরত আবু বকর রাযি. এর মত হযরত উমর রাযি. এর মত যোগ্য ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করুন। কিন্তু অনুরূপ কোনো যোগ্য ব্যক্তি আমি খুঁজে পাইনি। আমি আরও চাই, আপনারা হযরত উমর রাযি. এর মত মজলিসে শুরার জন্য কতিপয় যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করুন। কিন্তু এর জন্যও আমি কোনো যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাইনি। এখন আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করুন। যাকে আপনাদের খলীফা মনোনীত করা ভালো মনে করেন তাকে খলীফা মনোনীত করুন। এ ভাষণ দানের পর তিনি গৃহে নির্জনাবাস শুরু করেন। আর বাই'আত গ্রহণের তিন মাস পর ইনতিকাল করেন। কোন বর্ণনায় আছে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। – ইবনে আছীর– ৪/৫১

e-ilm.weebly.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি.

(৬৪ হিঃ ---৬৫ হিঃ)

হুসাইন বিন নুমাইর এদিকে মক্কা নগরী অবরোধ করে রেখেছে। অপর দিকে দামেশক থেকে ইয়াযিদের মৃত্যুর সংবাদ আসে। সর্বপ্রথম এ সংবাদ হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. অবগত হন। তিনি ঘোষণা করেন, হে সিরিয়া বাসীগণ তোমরা লড়াই করছ কেন? তোমাদের নেতা তো মারা গেছেন।

সিরিয়াবাসীগণ হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর কথায় আশ্বস্ত হতে পারেনি। কিন্তু যখন তাদের নিজস্ব বার্তাবাহক তাদেরকে এ সংবাদ দেয়, তখন তারা মক্কার অবরোধ তুলে নেয়। হুসাইন ইবনে নুমায়ের ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট দূত পাঠান যে, আজ আমি একান্ত গোপনভাবে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। অতঃপর তারা বাতহা নামক স্থানে মিলিত হন। তখন হুসাইন বললেন,

"বর্তমানে আপনার থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য আর কেউ নেই। তাই আমার সাথীগণ আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছে। আপনি আমাদের সাথে সিরিয়াতে গমন করুন। আমাদের সাথে সিরিয়ার অভিজাত শ্রেণীর লোকজন রয়েছে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের পর কেউ আপনার বিরোধীতা করার সাহস করবে না। তবে শর্ত হল, আপনি আপনার দুশমনদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে। আর আমাদেরও আপনার মধ্যে যে রক্তপাত হয়েছে, তা ক্ষমা করে দিতে হবে।

হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. বললেন,

হেরেমের অধিবাসীদের খুন ক্ষমা করা অসম্ভব। আল্লাহর কসম! আমি একেক জন হিজাজবাসীদের কিসাসের বিনিময়ে দশজন সিরিয়াবাসীকে হত্যা করলেও মানব না। হুসাইন ইবনে নুমায়ের বলল, আমি আপনাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার সে ধারনা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। আমি আপনার সাথে ধীরে সুস্থে শান্ত ভাষায় কথা বলছি। আর আপনি চিৎকার করে তার জবাব দিচ্ছেন। আমি আপনাকে খিলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি আমাকে হত্যা ও ধ্বংস করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। এ কথা বলে হুসাইন বিন নুমাইর তার বাহিনীর মাঝে ফিরে চলে যায়। আর মদীনার রাস্তায় সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। পরক্ষণেই ইবনে যুবাইর রাযি. নিজে ভুল বুঝতে সক্ষম হন এবং তিনি রাস্তায় হুসাইন ইবনে নুমাইরের নিকট লিখিত প্রস্তাব পাঠান।

"আমার সিরিয়া গমন করা অসম্ভব নয়। তবে যদি তোমরা এখানে আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু হুসাইন ইবনে নুমাইর জবাব দেয়, আপনি সিরিয়াতে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ হবে না। (ইবনে আছীর– ৪/৫১)

e-ilm.weebly.com

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর হিজাজে হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর একচ্ছ শাসন চলতে থাকে। তিনি তাঁর ভ্রাতা হযরত উবায়েদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে মদীনার শাসনকর্তা মনোনীত করেন। উবাইদুল্লাহ রাযি. সমস্ত বনী উমাইয়াদেরকে যাদের মধ্যে মারওয়ান ইবনে হাকাম ও তার পুত্র আবদুল মালেকও ছিল সকলকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ায় সবাই সিরিয়াতে চলে যায়। মিশরেও হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফতকে সমর্থন করা হয়। আবদুর রহামান ইবনে জাহদাম ফিহরীকে মিশরের গভর্নর মনোনীত করা হয়। তবে ইরাক ও সিরিয়া সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইরাক

বসরাতে যখন ইবনে যিয়াদের নিকট ইয়াজিদের মৃত্যুর খবর পৌছে, তখন সে এক সাধারণ সমাবেশে ভাষণ দিয়ে বলে–

হে বসরাবাসীগণ এখানে আমার জন্ম হয়েছে। এখানে আমি লালিত পালিত হয়েছি। এখন এখানের গভর্নরও নিয়োজিত হয়েছিল। আমি যখন এখানের শাসনভার গ্রহণ করি, তখন এখানে সৈন্যবাহিনীতে তোমাদের ৭০ হাজার লোক নিয়োজতি ছিল। বর্তমান ১ লাখ যুবক সৈন্য বাহিনীতে নিয়োজিত হয়েছে। অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে তোমাদের ৯০ হাজার লোক নিয়োজিত ছিল। কিন্তু বর্তমান ঐ সংখ্যা ১৪০ হাজারে উপনীত হয়েছে। তোমাদের সব দুশমনদের আমি কারাগারে বন্দী করে ফেলেছি। এখন এমন কেউ নেই যে, তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর সিরিয়ার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তোমরা শক্তি সামর্থ, অর্থ-সম্পদের দিক থেকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের তুলনায় বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছ। আমার মতে উত্তম হল, তোমরা কাউকে তোমাদের খলিফা মনোনীত করে নাও। তোমরা যাকে তোমাদের খলিফা মনোনীত করবে, আমিও তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করব। সিরিয়াবাসীদের যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করার অধিকার রয়েছে। হয় তোমরাও তাদের নির্বাচিত খলীফার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে নেবে। না হয় নিজেদের খিলাফত পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। তোমাদের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তারা তোমাদের মুখাপেক্ষি। উপস্থিত লোকজন বলল, আপনার এ প্রস্তাব সমর্থন যোগ্য। আমরা আপনার চেয়ে যোগ্য আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি হাত বাড়ান আমরা আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করব।

ইবনে যিয়াদ তিন বার তা অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের জোর তাকিদের কারণে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার খিলাফতের সমর্থনে বাই'আত গ্রহণ করে। কিন্তু ইরাক বাসীদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারেনি। এদিকে সে বাই'আত গ্রহণ

e-ilm.weebly.com

করে বের হচ্ছে। অপর দিকে তারা প্রাচীর সমূহে হাত ঘঁসতে ঘঁসতে বলতে শুরু করল, ইবনে মারজানা কি এটা মনে করছে, সে ক্ষমতা হারানোর পরও আমরা পূর্বের মতই তার আনুগত্য করব?

বসরাবাসীদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করার পর ইবনে যিয়াদ কুফায় দূত পাঠায়। সে ওখানে গিয়ে বলল, বসরাবাসীগণ ইবনে যিয়াদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে। তোমরাও ঐ বাই'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কিন্তু তারা বলল, আল্লাহর শোকর! আমরা ইবনে সুমাইয়ার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করেছি। আমরা কস্মিনকালেও তার সমর্থনে বাই'আত গ্রহণ করব না। তারপর তারা ইবনে যিয়াদের প্রেরিত দূতকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেলে। বসরাবাসীগণ যখন কুফাবাসীদের খবর জেনে যায়, তখন তাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। তারা প্রকাশ্যে ইবনে যিয়াদের বাই'আত গ্রহণে অস্বীকার করতে শুরু করে। ইবনে যিয়াদ যে কথা বলত তারা তার বিপরীত করত। এ অবস্থায় মাসলামাহ ইবনে যুবাইর তামীমী হযরত ইবনে যুবাইর রাযি.এর পক্ষে মানুষকে আহবান করতে শুরু করেন। মানুষ দলে দলে তার বাই'আত গ্রহণ করতে শুরু করে।

ইবনে যিয়াদ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এমনকি তার জন্য বসরাতে অবস্থান করাও বিপদজনক হয়ে যায়। তাই রাতের অন্ধকারে মুখ ডেকে পলায়ন করে। আর বনী আজদ গোত্রের সরদার মাসুদ বিন উমরকে ১ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা ঘুষ দিয়ে কয়েক দিন তার নিকটে অবস্থান করে। তার পর ওখান থেকে সিরিয়াতে চলে যায়। ইবনে যিয়াদের বসরা ত্যাগ করার পর বসরা বাসীরা সাময়িকভাবে আবদুল্লাহ বিন হারছ ওরফে বাহাকে তাদের গভর্নর মনোনীত করে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে খলীফা মেনে নেয়।

কুফাবাসীরাও ইবনে যিয়াদের নিয়োগকৃত গভর্নরকে পদচ্যুত করে আমে বিন মাসুদকে অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত করে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে বাই'আত কবুল করার সংবাদ দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. উভয় শহরে গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন।

সিরিয়া

সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভীষণ বিপদজনক। সিরিয়ায় বনী উমাইয়াদের শক্তির ধারক বাহক ছিল দুই গোত্র বনী কেলাব ও বনী কায়েস। বনী কেলাব ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার নানার গোত্র ছিল। তারা তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে খিলাফতের আসনে বনী উমাইয়াদের দেখতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু বনী কায়েস গোত্র হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এ হিতাকাংখী ছিল। অপরদিকে তথাকথিত বনী কালব ও তাদের সমমনা লোকজন ঐক্যমতে

e-ilm.weebly.com

উপনীত হতে পারেনি। কিছু লোক খালিদ বিন ওয়ালিদের সমর্থনে ছিল। আর কিছু লোক মারওয়ান বিন হাকামের সমর্থক ছিল। আবার কিছু লোক উমর বিন সাঈদ বিন আসের সমর্থক ছিল। দামেশকের গভর্নর যাহ্হাক বিন কায়েস ছিলেন বনী কায়েস গোত্রের সরদার ছিল। তিনি ইবনে যুবাইরের পক্ষে বাই'আতের আহবান জানাতে থাকেন। হিমসের শাসক নোমান বিন বশির ও কিননাসরীনের শাসক জাফর বিন হারেছ ছিলেন তার সহযোগী। ফিলিস্তিনের শাসক হাসসান বিন মালেক কালবী ছিল বনী কেলাব গোত্রের সরদার। সে বনী উমাইয়াদের অন্ধ সমর্থক ছিল।

মারওয়ান বিন হাকাম যখন মদীনা থেকে সিরিয়াতে পৌঁছেন, তখন বনী উমাইয়াদের ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র সিরিয়ার অবস্থা ছিল এই। মারওয়া বিন হাকাম এ অশান্ত পরিস্থিতিতে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর বাই'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু ঐ সময় উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইরাক থেকে সিরিয়াতে এসে পৌঁছে। সে মারওয়ানকে বলল, আপনি গোত্রের সরদার। আপনাকে সাহস হারালে চলবে না।

মারওয়ান বিন হাকাম বলল, যদি আপনার এমনই মনে হয়, তাহলে এখনো অনেক সময় আছে। সুতরাং মারওয়ান দামেশকে পৌঁছে, বনূ উমাইয়াদের ধ্বংস প্রায় ক্ষমতার প্রাচীরকে রক্ষা করার জোর প্রচেষ্টা চালায়।

দামেশকের জামে মসজিদে শোরগোল

একদিকে হাসসান বিন মালিক বনী উমাইয়াদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে জর্ডান এসে পৌঁছে। সে দামেশকের গভর্নর যাহ্হাক বিন কায়েসের নিকট বনী উমাইয়াদের প্রশংসা গেয়ে এক পত্র প্রেরণ করে। তাতে তাদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর উল্লেখ করে। তৎসঙ্গে উক্ত পত্রে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর কুৎসা বর্ণনা করে এবং তাঁকে বিদ্রোহী বলে উল্লেখ করে। যাহ্হাকের নিকট আবেদন করে, সে যেন জুমার নামাযের পর উক্ত পত্র মসজিদে পাঠ করে শোনায়। যাহ্হাক ঐ পত্র পাঠ করতে অস্বীকার করে। তখন পত্রবাহক হাসসানের উপদেশ অনুযায়ী নিজে মিম্বরে আরোহন করে ঐ পত্র পাঠ করে উপস্থিত মুসল্লীদের শুনিয়ে দেয়।

তার পত্র পাঠে দামেশকের জামে সমজিদে ভীষণ গোলযোগ শুরু হয়। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থক এবং বনী উমাইয়াদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। খালেদ বিন ইয়াজিদের মধ্যস্থতায় গোলযোগ বন্ধ হয়। বনী উমাইয়াদের সমর্থকদের মধ্যে যারা গোলযোগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, যাহ্হাক বিন কায়েস তাদের গ্রেফতার করে ফেলে। কিন্তু তাদের আত্মীয় স্বজন জোর পূর্বক তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

e-ilm.weebly.com

এ গোলযোগের পর যাহ্হাক বিন কায়েস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে তাতে কল্যাণ হবে। নতুবা মুসলমানদের রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে।

যাহ্হাক তার মনোভাবের কথা দামেশক অবস্থিত বনী উমাইয়াদের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের অবহিত করায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "জাবিয়া" নামক স্থানে এক বৈঠকের আয়োজন করা হোক। আলাপ-আলোচনার মাঝে সমস্যার সমাধান করা হোক। যাহ্হাক বিন কায়েস দামেশক থেকে জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু তার কোনো কোনো উপদেষ্টা তাকে পরামর্শ দেয়, ওখানে যাওয়া নিরর্থক হবে। আপনার উচিত হল, ওখানে না গিয়ে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. সমর্থনে প্রকাশ্যে ময়দানে আসা। যাহ্হাক জাবিয়া গমনের পরিকল্পনা বাতিল করে সমর্থকদের নিয়ে মারজে রাহা অবস্থান নেন।

জাবিয়ার সম্মেলন ও মারওয়ানের মনোনয়ন

জাবিয়ার সম্মেলনে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থকগণ যোগদান করেনি। কিন্তু বনী উমাইয়াদের সমর্থকরা সমবেত হয় এবং এ সমাবেশকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে উপকৃত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ মহা সম্মেলন চলতে থাকে এবং ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ চলতে থাকে। মালেক বিন হুবাইরা যুকুনী বলল, খালেদ বিন ইয়াযিদের সাথে আমরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তার পিতা আমাদের সাথে যে সদাচারণ করেছেন, তা ভোলার নয়। তাছাড়া খালেদ আমাদের আদর আপ্যায়ণে কোন ত্রুটি করেনি। আমরা তার হাতে বায়'আত হব। হুসাইন বিন নুমায়ের বলল, কি করে সম্ভব যে, আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের সামনে এক বৃদ্ধ লোককে পেশ করবে। আর আমরা নির্বোধ শিশুর মত তাকে আহবান করব। তবে উত্তম হল, মারওয়ান বিন হাকামের বাই'আত গ্রহণ করা হোক।

অবশেষে রাহ বিন যিম্বা মীমাংসা পূর্ণ এক প্রস্তাব পেশ করে বলল, মারওয়ান বিন হাকামকে খলিফা মনোনীত করা হোক। তার পরে ধারাবাহিকভাবে খালেদ বিন ইয়াযিদ ও আমর বিন সাদ বিন আসকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হোক। এ প্রস্তাব এরূপ মনঃপুত ছিল যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। সুতরাং ৩ জিলকাদ ৬৪ হিজরীতে সমস্ত বনী উমাইয়া ও তাদের সমর্থকগণ মারওয়ান বিন হাকামের হাতে বাআ'আত গ্রহণ করে।

মারজে রাহাতের যুদ্ধ

মারওয়ান খলিফা মনোনীত হওয়ার পর সে তার সমর্থকদের সাথে নিয়ে মারজে রাহাত অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থক যাহ্হাক বিন কায়েস অবস্থান করছিলেন। যাহ্হাক হিমছে নুমান বিন

e-ilm.weebly.com

বশীর ও জাফর বিন হারেছের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উভয় দলের মধ্যে চরম যুদ্ধ হয়। বিশদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অবশেষে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থকগণ পরাজিত হয়। কায়েস বিন যাহ্হাক ও বনু কায়েস গোত্রের খ্যাতনামা সরদারগণ যুদ্ধে নিহিত হয়। এ ঘটনা ৬৫ হিজরীর মহররম মাসে সংঘটিত হয়। এরপর সিরিয়ার ময়দান মারওয়ান বিন হাকামের জন্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থক ও পরিবারের সদস্যরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়। হিমসের গভর্নর নুমান বিন বশীর পলায়নের মনোস্থির করে। কিন্তু গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কিন্নাসরীনের যুফার ইবনে হারেস গভর্নর কারকীসার অভিমুখে পালিয়ে যায়।

মারওয়ানের মিশর দখল

মারওয়ান মারজে রাহাত দখল করার পর সিরিয়াতে গভর্নর নিয়োগ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন মিশরে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নর ছিল আবদুর রহামন বিন জাহদাম। সে মাওয়ানের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু মারওয়ান আমর বিন সাঈদকে কিছু সৈন্য বাহিনীসহ অন্যপথে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় এবং মিশরে প্রবেশ করে। ইবনে জাহদাম প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে মনে করে হাতিয়ার ত্যাগ করে। ফলে বিনাযুদ্ধে মিশর মারওয়ান দখল করে নেয়।

মারয়ানের মৃত্যু

মারওয়ান ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করার বেশী সময় পায়নি। ৬৫ হিজরীর রমাযান মাসে মারওয়ানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে খালিদ বিন ইয়াযিদ ও আমর নিব সাঈদকে পরবর্তী শাসকের পদ থেকে বরখাস্ত করে স্বীয় দুই পুত্র আবদুল মালেক ও আবদুল আযীযকে ধারাবাহিকভাবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। আর খালেদকে জনগনের দৃষ্টিতে হেয় করার উদ্দেশ্যে খালীদের মাকে বিবাহ করে।

বর্ণিত আছে, খালিদ বিন ইয়াযিদকে বরখাস্ত করার পর এক দিন মারওয়ান ভরা দরবারে বসে খালিদের কুৎসা বর্ণনা করে। খালিদ তার মাকে তার কুৎসা রটনার কথা জানিয়ে দেয়। খালীদের মা ক্ষোভে দুঃখে উত্তেজিত হয়ে মারওয়ানকে ঘুমের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

মারওয়ানের পরিচিতি

তার বংশধারা হল, মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস। মাতার নাম আমেনা বিনতে আলকামা বিন সাকওয়ান।

মারওয়ান দ্বিতীয় হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মারওয়ানের পিতা হাকাম মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু সে পর্দার আড়াল থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করত। সে কারণে হুযুর ﷺ তাকে তায়েফে বহিস্কার

e-ilm.weebly.com

করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের যুগ থেকে হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. খিলাফতকালে তিনি তায়েফে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি হযরত উসমান রাযি. এর চাচা ছিলেন। হযরত উসমান রাযি. পরে মদীনাতে ফিরে আসার বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করছিলেন। ফলে স্বীয় খিলাফতকালে তাকে তায়েফ থেকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

হযরত উসমান রাযি. মারওয়ানকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব মনোনীত করেন। তার খিলাফতের মহর মারওয়ানের দায়িত্বে ন্যাস্ত ছিল। মারওয়ান মিশরের কলহপ্রিয় লোকদের হত্যার নির্দেশ লিখে জাল মহর ব্যবহার করে। ফলশ্রুতিতে হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘঠিত হয়।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর শাসনামলে কয়েক বার তাকে মদীনার গভর্নর মনোনীত করা হয়। হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাযি. তার পেছনে নামায আদায় করতেন। কখনো সেই নামায পুনরায় আদায় করতেন না।

ইবনে আছীর– ৪/৭৫

বনু উমাইয়াদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম ঈদের নামাযের খুৎবা নামাযের পূর্বে পাঠ করেন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর মদীনা থেকে বের হয়ে সিরিয়াতে পৌঁছে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর হাতে বাই'আত গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু উবাইদুল্লা ইবনে যিয়াদ তাকে বাঁধা দেয় এবং খিলাফত লাভের জন্য উৎসাহ দেয়। সুতরাং সে প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করে। তার শাসন ব্যবস্থা সিরিয়া থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আবুদল মালেক বিন মারওয়ান
(৬৫ হিঃ –৮৬ হিঃ)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.
(৬৪ হিঃ – ৭৩ হিঃ)

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান বিন হাকাম হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে ২৬ হিজরীতে পবিত্র মদীনায় জন্মগ্রহণ করে। সেখানেই লালিত পালিত হয়। এ কারণে মদীনার জ্ঞানীগুনীদের সান্নিধ্য লাভের পুরোপুরি সুযোগ পান তিনি। অবশেষে সমকালের জ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য হন।

ইমাম শা'বী রহ. বলেন, আমি আবদুল মালেক ব্যতীত যার সাথে আলোচনা করেছি, নিজেকেই তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী পেয়েছি। আর আব্দুল মালেকের সাথে যখনই কোন হাদীস বা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তখনই আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। আবু যিয়াদের অভিমত হল, ঐ সময় পবিত্র মদীনায় চারজন খ্যাতনামা ফিকাহবিদ ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, কাবাসা ইবনে যুওয়াই ও আবদুল্লাহ মালিক বিন মারওয়ান।

ইবনে আছীর ঃ ৪/ ৯৯

e-ilm.weebly.com

জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তার সাথে সাহসী উদ্দমী দৃঢ় চিত্ততা ও উচ্চাকাংখী ছিল। যে সময় শাহী মসনদে আরোহন করে তখন ইসলামী সাম্রাজ্য বিদ্রোহ ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্জলিত হচ্ছিল। তখন এক দিকে তাকে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. প্রভাবশালী ব্যক্তির মুকাবিলা করতে হয়েছে। অপরদিকে শী'আ ও খারেজীদের অভ্যান্তরীন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আবদুল মালেক স্বীয় দূরদর্শীতা, বুদ্ধিমত্তা ও কঠোরতার সাথে বিদ্রোহীদের উপর জয়যুক্ত হন। আর বনী উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি যা ইয়াজীদের মৃত্যুর পর ভেংগে পড়েছিল, তা সম্পূর্ণ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণে আবুদল মালিককে উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

তাওয়াবীনদের উত্থান

মারওয়ান মৃত্যুর পূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে জাযীরাতে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার নির্দেশ দেন এবং কার কায়সাতে জাফর বিন হারেছের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। সেখান থেকে অবসর হয়ে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মারওয়ান উবায়দুল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাও করেছিল, যে পরিমাণ রাজ্য জয় করা হবে, ঐ পরিমান রাজ্যে তাকে শাসনকর্তা মনোনীত করা হবে। ঐ সময় ইবনে যিয়াদ জাজিরাতে অবস্থান করছিল। ঠিক তখন মারওয়ানের মৃত্যুর খবর পৌঁছে, সাথে সাথে এ ফর্মানও এসে পৌঁছে যে, মারওয়ান তোমাকে যেই কাজে নিয়োজিত করেছে, তুমি সে কাজ করতে থাকবে। সেহেতু উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ জাজিরা ও কারকীসার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে। আইনুল ওয়ারদা নামক স্থানে তাওয়াবিনদের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়।

তাওয়াবিনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হল, হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণের পর কিছু সংখ্যক কুফাবাসী হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য ভীষণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। অনন্তর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এ জঘন্য পাপের প্রায়শচিত্ত হল, ইমাম হুসাইন রাযি. এর ঘাতকদেরকে হত্যা করতে হবে অথবা আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ঐ সব লোক নিজেরা নিজেদেরকে সংঘটিত করে। আর সুলাইমান বিন সারদা খাজায়ী যে আহলে বাইতের খ্যাতনামা প্রেমিক ছিল। তাকে তাদের নিজেদের আন্দোলনের নেতা মনোনীত করে।

কুফার শাসক আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আনসারী তখন এ আন্দোলনের খবর পায়। সে তাওয়াবিনদের বাঁধা দেয়নি বরং তাদের উৎসাহ দিয়ে বলে, যদি তোমরা হযরত হুসাইন রাযি. এর ঘাতক ইবনে যিয়াদের মুকাবিলায় এসে থাক তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। সরকারের সমর্থন পেয়ে তারা প্রকাশ্যে হযরত হুসাইন রাযি.এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের দাওয়াত দিতে শুরু করে।

e-ilm.weebly.com

বিপুল পরিমাণে অস্ত্র খরিদ করতে থাকে। ৬৭ হিজরীর রবিউল আখের চাঁদ দেখার পর পাঁচ হাজার তাওয়াবীন কুফা থেকে যাত্রা করে নাখালীয়া নামক ময়দানে এসে সমবেত হয়। সুলাইমান বিন সারদা এক আবেগময়ী ভাষণ দেন।

"হে লোক সকল! যে ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও কিয়ামত দিবসের কল্যাণ প্রার্থী হতে চাও, সে আমাদের সাথে বেরিয়ে পড়। আর যে দুনিয়া প্রত্যাশী সে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দাও।"

চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করে, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের গুনাহের প্রায়শচিত্ত করা। আর হযরত হুসাইন রাযি. খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে সাদ বিন নোকাইন বললেন–

ভাই সকল! হযরত হুসাইন রাযি. এর বেশীর ভাগ ঘাতক কুফাতে রয়েছে। তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাত্রা করার কি অর্থ হতে পারে? উপস্থিত লোকজন বলল, বাস্তব সত্য কথা। কিন্তু সুলাইমান বিন সা'আদ বলল, হযরত হুসাইন রাযি. এর ঘাতকদের নেতা হল ইবনে যিয়াদ। প্রথম তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হোক। তারপর অন্যদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

মোটকথা, তারা সবাই নাখলা থেকে সিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি.-র কবরের নিকট হাজির হয়। সেখানে তারা ভীষণ কাকুতি মিনতী করে কান্না কাটি করে মুনাজাত করে। "হে আল্লাহ! শহীদ হুসাইন রাযি. এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা তাঁর দ্বীন, তাঁর তরিকার অনুসারী হয়েছি। তাঁর ঘাতকদের দুশমন ও তার মহব্বতকারীদের বন্ধু। হে আল্লাহ! আমরা রাসূল ﷺ এর কলীজার টুকরার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছি। তুমি আমাদের ঐ পাপ ক্ষমা করে দাও। আমাদের তাওবা কবুল কর। তারা কারবালা থেকে বিদায় হয়ে কার কাইসাতে পৌছে। সেখানে জাফর বিন হারেছের সাহায্য নিয়ে আইনুল ওয়ারদাহ অভিমুখে যাত্রা করে। এখানে ইবনে যিয়াদের এক অফিসার শুরাহবীল বিন কিলার সাথে মুকাবিলা হয়। তাওয়াবীনদের নিকট শুরাহবীলের বাহিনী পরাজিত হয়। ইবনে যিয়াদ তার পর হুসাইন বিন নুমায়েরের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করে। তাওয়াবীন তাকেও পরাজিত করে। তাওয়াবীনগণ ভীষণ সাহসীকতার সাথে লড়াই করে দুশমনদের পরাজিত করতে থাকে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাদের মুকাবিলায় একেরপর এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতে থাকে। অবশেষে সুলাইমান বিন সারদ নিহত হলে তারা কুফায় ফিরে যায়।

মুখতার সাকাফীর উত্থান

ঐ সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিশৃংঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখে দূরদর্শী ও সাহসী মুখতার বিন সাকাফীর মনে শাসন ক্ষমতা দখল করার উৎসাহ দেখা দেয়। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতের সময় ইবনে যিয়াদ মুখতারকে বন্ধী

e-ilm.weebly.com

করে ফেলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সুপারিশের কারণে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে তাকে কুফায় বসবাস করতে নিষেধ করা হয়। মুখতার কুফা ত্যাগ করে হিজাজে চলে যায়। মক্কায় পৌঁছে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট যাতায়াত করতে শুরু করে। ঐ সময় হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. গোপনে তার পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করতে বললেন। তখন মুখতার হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. কে বলল, আমি এক শর্তে আপনার বাই'আত গ্রহণ করছি যে, আপনি আমার পরামর্শ ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। আর তাতে আপনি যখন বিজয়ী হবেন, তখন আমাকে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে হবে। ইবনে যুবাইর রাযি. কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করে তার শর্ত মেনে নেন।

মুখতার হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট অবস্থান করতে থাকে। হুসাইন বিন নুমায়ের মক্কায় আক্রমণের সময় তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিজাজ ও ইরাকবাসীগণ হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর সমর্থনে বাই'আত গ্রহণ করে। তখন সে তার নিকট পাঁচ মাস অবস্থান করে। কিন্তু সে ইবনে যুবাইর রাযি. এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। কেননা সে ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট থেকে যা আশা করেছিল, তা পায়নি।

ইরাক সর্বদা বিশৃংঙ্খলা ও বিদ্রোহের স্থান ছিল। যে কোন আন্দোলন ও বিশৃংখলাকারীর জন্য ইরাক ব্যতীত অন্য কোনো উপযুক্ত স্থান ছিল না। মুখাতারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ইরাকের ওপর। কাজেই সে ইরাক থেকে আগত লোকদের কাছ থেকে ইরাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। একবার হানী বিন হুজ্জাতুল বিদায়ী হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন মুখতার অভ্যাস অনুযায়ী তার সাথে সাক্ষাত করে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়। হানী বলল, কুফাবাসীগণ ইবনে যুবাইর রাযি. এর বাই'আতে বহাল রয়েছে। কিন্তু ওখানে বিরাট এক দলের উত্থান হয়েছে। যদি তাদেরকে কোনো কাজে লাগানো যায়, তাহলে সারা বিশ্বকে স্বীয় পতাকাতলে সমবেত করা যাবে।

তখন মুখতার বলল, আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে সত্যের উপর সমবেত করব। আর তাদেরকে সাথে নিয়ে বাতিল পন্থীদের মুকাবিলা করব এবং সত্য ও হকের দুশমনদের হত্যা করে ফেলব। তখন মুখতার কুফা অভিমুখে যাত্রা করে। সে যখন কুফায় পৌঁছে, তখন ওখানে তাওয়াবীনদের জোর আন্দোলন চলছি। হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যার প্রতিশোধের জোরালো আওয়াজ হচ্ছিল। মুখতারও এ আন্দোলনের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে। কিন্তু সে সুলাইমান বিন সা'দের পথপ্রদর্শনকে নিজের উদ্দেশ্য পরিপন্থী মনে করে। এ কারণে সে স্বীয় মতাবলম্বীদের পৃথক দল গঠন করতে শুরু করে। সে হযরত আলী রাযি. এর

e-ilm.weebly.com

অনুসারীদের বলতে শুরু করে, সুলাইমান একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। সে নিজেও নিহত হবে; তোমারাও যেন নিহত হও। সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমাকে মাহদী ইবনে ওয়াছি মুহাম্মদ বিন হানীফীয়া রাযি. তাঁর উপদেষ্টা ও তোমাদের নেতা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। যাতে তোমাদের সাহায্যে ধর্মদ্রোহীদের হত্যা করতে পারি এবং আহলে বাইতের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পরি। (১) মুখতার এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং সুযোগ বুঝে নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করে বলে, জিবরাঈল আমার নিকট ওহী নিয়ে আগমন করেন। আমাকে অদৃশ্যের খবর দেন। সুতরাং সুলাইমান সারদের দল থেকে পৃথক হয়ে মুখতার পৃথক এক দল গঠন করে।

(ইবনে আছীর– ৪/৬৭)

সুলাইমান সারদের প্রস্থানের পর কোন কোন লোক আবদুল্লাহ বিন হাতামি ও ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন তালহাকে বলল, মুখতার একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। তার গতিবিধি ভাল মনে হচ্ছে না। একথায় আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ তাকে বন্দী করে ফেলে।

মুখতার কিছু দিন কয়েদ খানায় বন্দী থাকে। কিন্তু সে পুনরায় হযরত ইবনে উমর রাযি. এর নিকট থেকে সুপারিশমূলক চিঠি লিখিয়ে এ শর্তে মুক্তি লাভ করে যে, সে আর কখনো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। যদি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাহলে তার সব কৃতদাস ও দাসী আযাদ হয়ে যাবে। আর কাবা গৃহে পৌঁছে এক হাজার উট কুরবানী করবে।

মুখতারের কুফা দখল

মুখতার কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে পুনরায় তার পূর্বের কাজে ফিরে যায়। এমনকি ভীষণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। দিনদিন তাতে আনসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুখতারের আন্দোলনে ইমাম মুহাম্মদ বিন হানীফার সমর্থনে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে অবস্থা এরূপ হয় যে, কুফায় হযরত আলী রাযি. এর কোন কোন অনুসারী পরামর্শ করে যে, মুখতার মুহাম্মদ বিন হানীফার নামে এ আন্দোলন চালু করেছে। আমাদেরকে স্বশরীরে ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে সঠিক বিষয় অবগত হতে হবে। সুতরাং ইরাক থেকে এক প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে মুহাম্মদ বিন হানীফা এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা তাঁর সাথে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর অভিমত সম্পর্কে অবগতি লাভ করে।

মুহাম্মাদ বিন হানীফা রাযি. প্রথমে আহলে বাইতের প্রশংসা বর্ণনা করে। তারপর হযরত হুসাইন রাযি. এর মর্মান্তিক শাহাদাতের বিষয় আলোচনা করে। তারপর বলল, তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমার নিকট জানতে চাচ্ছ, যিনি আহলে বাইতের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। অতএব ভাই সকল!

e-ilm.weebly.com

আমি আন্তরিকভাবেই কামনা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুশমনদের নিকট থেকে ঐ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। হোক তা যে কোন লোকের মাধ্যমে। এ প্রতিনিধি দল বিদায় নেওয়ার পর মুখতার ভীষণ চিন্তা যুক্ত হয়ে পড়ে যে, না জানি মুহাম্মদ বিন হানাফী কি জবাব দিয়েছেন? না জানি আমার পাতানো খেলা শেষ হয়ে যায়! সুতরাং ঐ প্রতিনিধিদল ফিরে আসার পর মুখতার তাদের নিকট গমন করে জানতে চায়, তোমার কি খবর নিয়ে এলে? আমার মনে হয় তোমরা সন্দেহে পতিত হয়েছ। কিন্তু পরে তারা যখন হযরত মুহাম্মদ বিন হানীফা রাযি. এর জবাব তাকে শুনায়, তখন সে খুশির আতিশয্যে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করে এবং তাৎক্ষনিকভাবে এক সমাবেশের আয়োজন করে।

যেসব লোক ইমাম মাহদীর নিকট গিয়ে ছিল, সে তাদেরকে ডেকে বলল, আমি তার উপদেষ্টা, সাহায্যকারী পয়গাম্বর হয়ে এসেছি। আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং আহলে বাইতের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে আমার সাথী হও।

এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে মুতী' কুফার শাসক মনোনীত হয়ে কুফায় আগমন করে। সে মুখতারের আন্দোলন দমন করার প্রচেষ্টা শুরু করে। তখন মুখতার প্রকাশ্য ময়দানে এসে কুফা দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার কোন কোন উপদেষ্টা তাকে পরামর্শ দেয়, এ ধরনের আন্দোলন সফল করার জন্য প্রথমে কুফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আহলে বাইতের আশেক ইবরাহীম বিন আশতারের সমর্থন থাকা জরুরী। মুখতার মুহাম্মদ বিন হানীফার পক্ষ থেকে একটি নকল চিঠি নিয়ে ইবরাহীমের সামনে পেশ করে। চিঠির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

"মুহাম্মদ মাহদীর পক্ষ থেকে ইবরাহীম বিন আশতারের নামে!

পর সমাচার। আমি তোমাদের নিকট আমার নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা প্রেরণ করেছি। আমি তাকে আদেশ দিয়েছি, সে যেন আমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আহলে বাইতের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যথাসম্ভব তুমি তাকে সাহায্য করবে। কুফা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যতদূর এলাকা তোমার সাহায্যে বিজিত হবে, তোমাকে সে এলাকার শাসক নিয়োগ করা হবে।"

ইবরাহীম ঐ পত্রের ভাষ্য শুনে বলল, আমার নিকট মুহাম্মদ বিন হানীফার পত্র এসেছে। তিনি স্বয়ং কখনো নিজেকে মাহদী বলে লেখেননি। মুখতার বলল, এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। সময় পাল্টে গেছে।

ইবরাহীমের কতিপয় সাথী সাক্ষ্য দিল যে, ইমাম মুহাম্মদ বিন হানীফা এ পত্র আমাদের বরাবর লিখেছেন। এ কথা শুনে ইবরাহী বিন আশতার মুখতারকে সম্মানে তার পাশে বসায় এবং মুখতারের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। ইবরাহীম বিন আশতারের সমর্থনে মুখতারের শক্তি আরো বেড়ে যায়। ইবরাহীম তার সুসজ্জিত বাহিনীকে নিয়ে মুখতারের সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

e-ilm.weebly.com

একদিন ইবরাহীম তার একশত সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে মাঝ-বাজর দিয়ে মুখতারের নিকট যাচ্ছিল। তখন শহরের পুলিশ প্রধান আয়াস বিন মাজাবি তাদের গতিরোধ করে এবং তাদেরকে কুফার শাসক আবদুল্লাহ বিন মুতির নিকট নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ইবরাহীম আয়াসকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বলে, নতুবা তাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। অনন্তর তাকে হত্যাও করে।

এ ঘটনার পর ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৬ হিজরীতে। মুখতার কুফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শাহী মহল অবরোধ করে ফেলে। আবদুল্লাহ বিন মুতি সর্বাত্মক ভাবে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে বাধ্য হয়ে অস্ত্র বর্জন করে। এমনকি সে প্রাণ ভয়ে কুফা থেকে পলায়ণ করে। মুখতার কুফা দখল করার পর ইরাকের অন্যান্য শহর সমূহের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং এ সব এলাকায় নিজের পক্ষ থেকে শাসক নিয়োগ করে। কিন্তু বসরা ইবনে যোবায়ের রাযি. এর অধীনেই থেকে যায়।

হযরত হুসাইন রাযি. এর ঘাতকদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে মুখতার কুফায় একচ্ছত্র অধিকার লাভ করার পর সে হযরত হুসাইন রাযি. এর ঘাতকদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে শুরু করে। আর যারা প্রাণের ভয়ে কুফা থেকে পলায়ণ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে, তাদের বাড়ী ঘর ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সুতরাং সিমার জিল জাওশন, উমর বিন সাদ, আবদুল্লাহ বিন উসাইদ, জুহারী, মালেক বিন বাদ্দী, জামাল বিন মালেক মুহারীবী, খাওয়া আসহাবী, যিয়াদ বিন মালেক যাবঈ, ইমরান বিন খালেদ তাশরিরী, আবদুর রহমান বিন আবু কালাম, বাজিলী, আবদুল্লাহ বিন কায়েস খাওলানী, উসমান বিন খালেদ যুহানী, বাশীর বিন শামিত হানেফী প্রমুখকে হত্যা করা হয়। কারো কারো মৃত দেহ আগুনে পুড়ে ফেলা হয়। সিমার জিল জাওশানের মৃত দেহ কুকুরকে খাওয়ানো হয়।

মুহাম্মদ বিন হানীফাকে গ্রেফতার

হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. দীর্ঘ দিন থেকে মুহাম্মদ বিন হানীফা ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বাই'আত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু ঐ বুযুর্গদ্বয় বলতেন, যতদিন পুরো ইসলামী সাম্রাজ্য আপনার খিলাফতের বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করব না।

যখন মুখতার কুফা দখল করে নেয় তিনি তখন মুহাম্মদ বিন হানীফার নিকট থেকে রীতিমত খিলাফতের বাই'আত গ্রহণের অনুমতি তলব করেন। মুখতার ইতোপূর্বে হযরত জয়নাল আবেদীন রাযি. এর নিকটও এ ধরনের আবেদন পেশ করেছিল। কিন্তু তিনি তার চাতুরতা বুঝতে পেরে মসজিদে নববীতে তার মতবাদ প্রকাশ করে দেয় এবং আহলে বাইতের মহব্বতের বাস্তবতা প্রকাশ করে দেয়।

e-ilm.weebly.com

সে এ দিক থেকে নিরাশ হয়ে যখন মুহাম্মদ বিন হানীফার নিকট গমন করে তখন হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন মুহাম্মদ হানীফাকে বলেন, তিনি যেন তার ধোঁকায় পতিত না হন। সে শুধু আন্দোলন সফল করার উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের নাম ব্যবহার করছে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন হানীফা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত ইবনে যোবায়ের রাযি. এর মুকাবেলায় তার সমর্থন লাভের জন্য তার আবেদন মঞ্জুর করেন। (ইবনে আছীর– ৬/১৫৬)

এবার হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. মুহাম্মাদ হানীফাকে বাই'আত গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ আরম্ভ করেন। তিনি তখনও তাঁর বাই'আত গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অবশেষে তাকে জমজমের চার দেয়ালের পাশে অবরোধ করে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বিন হানীফা মুখতারকে তার অবস্থা অবহিত করায়। মুখতার এক বাহিনী প্রেরণ করে তাকে অবরোধ মুক্ত করে নিয়ে যায় এবং তার জীবীকা নির্বাহ করার জন্যে চারলাখ দেরহাম পাঠিয়ে দেয়।

ইবনে যিয়াদকে হত্যা

ইবনে যিয়াদ মুসুলে অবস্থান করেছিল এবং সে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত করেছিল। মুখতার কুফার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার সাথে সাথে ইয়াযিদ বিন আনাস আসদীর নেতৃত্বে তার মুকাবিলায় এক বাহিনী প্রেরণ করে। ইবনে যিয়াদ এ খবর জানার পর সে ইয়াযিদকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রবিয়া বিন মুখরিক ও আবদুল্লাহ বিন জাবালাহকে তিন হাজার সৈন্য বাহিনীসহ প্রেরণ করে। বাকেল্লা নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে মুকাবিলা হয়। ইয়াযিদ বিন আনাস সিরিয় বাহিনীকে পরাজিত করে দেয়। তাদের বহু লোক নিহত হয়।

কিন্তু ইয়াযিদ কঠিন রোগাক্রান্ত থাকায় বিজয়ের কিছুক্ষণ পর সে মারা যায়। ওরাকাহ বিন আযেব আসাদী তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হয়। ওরাকাহ যখন জানতে পারে যে, ইবনে যিয়াদ ৮০ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী নিয়ে নিজেই মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। ওকার মুকাবিলা করা ঠিক হবে মনে করে চলে আসে। মুখতার কয়েক দিন পর ইবরাহীম বিন আশতারের নেতৃত্বে যিয়াদের মুকাবিলায় জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করে। ঐ বাহিনীতে মুখতারের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য অফিসারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে যিয়াদ যখন ঐ বাহিনীর আগমনের খবর পায়, তখন স্বয়ং বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। নহরে খাযীর নদীর তীরে উভয় বাহিনীর মাঝে মুকাবিলা হয়। কায়েস গোত্রের লোকেরা ইবরাহীমের সাথে মিলিত হয়ে যায়। যুদ্ধে ইবনে যিয়াদ পরাজিত হয় এবং আশতারের হাতে নিহত হয়। ইবনে যিয়াদ ছাড়াও সিরিয়ার দ্বিতীয় প্রধান বিখ্যাত সেনাপতি হুসাইন বিন নুমায়ের এ যুদ্ধে নিহত হয়। ইবরাহীম বিন আশতার ইবনে যিয়াদের মস্তক ছিন্ন করে দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ইবনে যিয়াদের খণ্ডিত মস্তক কুফায় মুখতারের নিকট পাঠিয়ে

e-ilm.weebly.com

দেয়। কথিত আছে যে, ইবনে যিয়াদ ও অন্যান্য সিরিয়া সৈন্যদের কর্তিত মাথা কুফার রাজ প্রসাদের এক কোণে ফেলে রাখা হয়। সরু একটি সাপ এসে সে কর্তিত মস্তক সমূহের মাঝে এক চক্কর দেয়। তারপর ইবনে যিয়াদের মুখে প্রবেশ করে নাক দিয়ে বের হয়। আর নাক দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হয়।

(ইবনে আছীর– ৪/১০০৩ বরাতে তিরমিযী।)

এ বিজয়ের পর ইবনে আশতার জাজিরার শাসনভার গ্রহণ করে ওখানে অবস্থান করতে থাকে। সে জাজিরার অন্যান্য শহরেও তার পক্ষ থেকে শাসন কর্তা নিয়োগ করে।

মুখতারের সাথে আরববাসীদের বৈরীতা

মুখতারের বেশীর ভাগ সহচরই অনারব মাওয়ালী বা দাস ছিল। তার আন্দোলন তাদের মধ্যে ভীষণ সাড়া জাগিয়ে ছিল। কুফার শাসনক্ষমতা দখল করার পর সে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সম্মানে ভূষিত করে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করে। তৎসঙ্গে তাদেরকে বিপুল পরিমাণে উপহার সামগ্রী দান করে। এ সব গোলাম তাদের মনীব থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অসংখ্য আরববাসীদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে যায়। কুদরতীভাবে মুখতারের এ কাজ আরবদের নিকট অসহনীয় হয়। মুখতার যখন ইবনে যিয়াদের মুকাবিলায় প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করে তখন আরববাসীরা তার বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ইবনে আশতারের সাহায্যে সে এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এর পর মুখতার আরববাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য অভিজাত আরব কুফা থেকে পলায়ণ করে বসরায় চলে যায়। ওখানে চলছিল ইবনে যিয়াদের রাজত্ব।

হযরত আলী রাযি. এর আসন

তাছাড়া মুখতার তার আন্দোলন জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে হযরত আলী রাযি. এর মিথ্যা প্রচারনা চালাতে শুরু করে। অর্থাৎ, কুফাতে হযরত আলী রাযি. এর ভাতিজা জায়দা বিন হুরাইরা বসবাস করতেন, তাঁর ইন্তিকালের পর মুখতার তার পুত্র তোফায়েল বিন জায়াদাকে বলল, তোমাদের গৃহে হযরত আলী রাযি. এর যে চেয়ার আছে তা আমাকে দিয়ে দাও। জায়াদা সে চেয়ার দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু মুখতার যখন ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন সে তার প্রতিবেশী তেল বিক্রেতার নিকট থেকে একখানা পুরাতন চেয়ার এনে মুখতারকে দিয়ে দেয়। মুখতার ঐ চেয়ারের উপর রেশমের গোলক আবৃত করে, তা অতি মনোরম সিন্দুকে ভরে সাধারণ লোকজনকে দেখানোর জন্য তা জামে মসজিদে রেখে দেয়। অনন্তর জনসাধারণের মাঝে ঘোষণা করে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে বনী ইসরাঈলদের জন্য তাবুতে বিজয় ও সাহায্যের নির্দশন হিসেবে সাকিনা পাঠিয়েছেন, অনুরূপভাবে উম্মাতে মুহম্মদীয়ার জন্যও এ চেয়ার প্রেরণ করেছেন।

e-ilm.weebly.com

সে ইবনে যিয়াদের মুকাবিলায় প্রেরিত বাহিনীর সাথে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ চেয়ারকে গাঁধার পিঠে চড়িয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করে। যুদ্ধে যখন কুফাবাসীদের বিজয় হয়, তখন সে এটা উক্ত কুরসীর কারামত বলে জোর প্রচার না চালায়।

সরল প্রকৃতির অসংখ্য লোক তার এ মিথ্যা প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে যায়। ফলে ঐ কুরসীর সম্পর্কে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিরকি আকীদা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ কাবা গৃহের মত ঐ কুরসীর চার পাশে তাওয়াফ করতে শুরু করে।

বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী লোকজন এ ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে ক্ষোভ এবং মুখতারের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সুতরাং আ'শা হামদানী বলেন–

شهدت عليكم انكم سبئية وانى بكم باشرطة الشرك عارف
فاقسم ماكرسيكم بسكينة وان كان قدلفت عليه الفائف
وان ليس كالتابوت فينا وان سعت شبام حواليه ونهد وخارف
وانى امر احببت ال محمد وتابعت وحياضمته المصاحف .

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সাবায়ী মতাবলম্বী ও শিরকের সাহায্যকারী। আমি ভালো করে জানি! আমি শপথ করে বলিছি, তোমার এ কুরসী তাবুতে সাকিনা নয়। চাই তুমি এর উপর যতই গেলাফ চড়াও না কেন। আর না এটা সাকিনায়ে তাবুতের মত হবে। সিরিয়ার নির্বোধ লোকেরা এর চার পাশে শতই ঘোরা ফেরা করুক না কেন। আমি মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধরদের মহব্বত কারী। আর শুধু ঐ ওহীকে মান্য করি, যা কুরআন মজীদে সংরক্ষিত।

মুস্'আব ও মুখ্তারের মুকাবিলা

মুখতার কুফার নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. তাঁর ভ্রাতা হযরত মুস'আব বিন যুবাইর রাযি. বসরার শাসক মনোনীত করে প্রেরণ করেন। তিনি কুফার জামে মসজিদে এ আয়াত পাঠ করে কুফাবাসীদের মাঝে তাঁর আহবান পৌছান।

طٰسٓمٓ * تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ * نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ * اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ۔

(১) তোয়া-সীন-মীম। (২) আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। (৩) আমি আপনার উপর পাঠ করছি মুছা ও ফিরাউন সত্য সংবাদ, সে সব লোকের জন্য, যারা ঈমান রাখে। ৪। বস্তুতঃ ফিরাউন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ করেছিল এবং তার দেশের নাগরিকদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একটা

e-ilm.weebly.com

দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। –সূরা কাসাস– ১-৪

এ ছিল বনী উমাইয়া কর্তৃক বনী উমাইয়াদের অত্যাচারের প্রতি ইশারা।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا ..... فِى الْاَرْضِ

আর আমি চাচ্ছিলাম, ঐ দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে। আর তাদেরকেই দেশ ও ধন-সম্পদের অধিকারী বানাতে।

এটি ছিল ইবনে যুবাইর রাযি. ও তার অনুসারীদের সফলতা লাভের প্রতি ইশারা।

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ..... مَاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ط

আর ফিরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্য বাহিনীকে তাই দেখিয়ে দিতে, যা তাদের আশংকা ছিল।

এ আয়াত দ্বারা মুখতার সাকাফী ও তার ভীতির প্রতি ইশারা করা হয়। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুফা বাসীগণ! আমার জানি যে, তোমরা তোমাদের শাসন কর্তার জন্য বিশেষ উপাধী নির্ধারণ করেছ। তাই তোমরা শুনে রাখো, আমি আমার উপাধী جزار (কসাই) নির্ধারণ করেছি।

বসরায় এসে সমবেত কুফার অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আমাকে মুখতারের উপর হামলা করার জন্য জোর তাকিদ দিচ্ছে। হযরত মুস'আব রাযি. খ্যাতনামা সেনাপতি পারস্যের শাসক মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাহকে বসরায় ডেকে পাঠান। অতঃপর তাকে এবং অন্যান্য কুফাবাসীদের সাথে নিয়ে কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্খতার এ খবর জানার পর আহমদ বিন সালীতের নেতৃত্বে ৬০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করে। মাযার নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয়। মুসয়াব বিজয়ী হয় আর মুখতার বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে কুফার কাছাকাছি পৌঁছেন।

কুফায় মুখতার নিজেই মুকাবিলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু তখন ওখানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে হয়ে যায়। যখন মুখতার ও তার বাহিনী বাজার অতিক্রম করত, তখন বাড়ীর ছাদ থেকে তার প্রতি তীর এবং ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। তখন মুখতার নিরূপায় হয়ে দুর্গে আশ্রয় নেয়।

মুস'আব দূর্গ কঠোরভাবে অবরোধ করে নেয়। মুখতার নিরুপায় হয়ে তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলল, এভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করে মরার চেয়ে লড়াই করে মরা উত্তম। কিন্তু তার সংগী-সাথীরা তার সাথে যুদ্ধ করতে রাজী হয়নি। অবশেষে মুখতার ১৯ জন প্রাণ উৎস্বর্গী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে দূর্গের দরজা খুলে দেয় এবং বীরের মত লড়াই করতে করতে নিহত হয়।

e-ilm.weebly.com

জীবন বাজী রাখার পূর্বে মুখতার তার এক বিশ্বস্ত সাথী সাইব বিন মালেক আশয়ারী বলেছিল, হে শাইখ! দুর্গ থেকে বের হওয়া দ্বীনের জন্য নয় বরং দুনিয়ার মহব্বতে স্বীয় দুশমনদের মুকাবিলা করার জন্য। সাইব বলল,

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

হে আবু ইসহাক! মানুষ তো ধারনা করছে, আপনি দ্বীনের স্বার্থে এ কাজ বেছে নিয়েছেন। মুখতার বলল, আমার জীবনের শপথ করে বলছি– না, আমি এ সব দুনিয়া লাভের জন্য করছি। আমি দেখলাম, সিরিয়া আবদুল মালেকীদের নিয়ন্ত্রণে, হিজাজ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিয়ন্ত্রণে। আমি তাদের থেকে কোনো অংশে কম নই। তাই আমার মনেও রাজত্ব করার সাধ জেগেছে। আমি আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হুসাইন রাযি. এর হত্যার প্রতিশোধকে বাহানা বানিয়েছি। –আখ্‌বারুত তিওয়াল ঃ ২৯৮

মুসয়াব ইবনে যুবাইর রাযি. মুখতারের খণ্ডিত মাথা মক্কায় হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তার হাত কেটে কুফার জামে মসজিদের পাশে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এ ঘটনা ৬৭ হিজরীতে সংঘঠিত হয়।

আবদুল মালিকের ইরাক আক্রমণ

মুখতারের পতনের পর হিজাজ ছাড়াও ইরাক পুনরায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অপর দিকে সিরিয়া ও মিশর আবদুল মালিকের দখলে ছিল। কেউ কেউ আবদুল মালিককে পরামর্শ দিয়েছিল, আপনি ইবনে যুবাইর রাযি. এর সাথে সন্ধি করুন এবং নিজের অধীনস্থ এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুক। কিন্তু আবদুল মালেক এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে ইরাক আক্রমণের মনোস্থির করেন। হযরত মুস'আব ইবনে যুবাইর রাযি. মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দীরে জাসালিক নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। –আখবারুত্‌তিওয়াল-২৯৮ পৃঃ

আবদুল মালিক ইরাকীদের বিদ্রোহী স্বভাবের কথা ভলোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে প্রায় সমস্ত ইরাকী নেতাদেরকে যুদ্ধের মুহূর্তে যুদ্ধ করা থেকে বিরত করে নেয়। কিন্তু ইবরাহীম বিন আশতার আবুদল মালিকের ফাঁদে পতিত হয়নি বরং সে আবদুল মালিকের প্রেরিত পত্র পাঠ করাও অপছন্দ করে। তা সরাসরি মুখ বন্ধ অবস্থায় মুস'আব রাযি. এর সামনে পেশ করে। ইবরাহীম মুস'আব রাযি. কে বলল, এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্র প্রেরণ করে আবুদল মালিক আপনার সব বিশ্বস্ত সৈনিকদের খরিদ করে নিয়েছে। তাই যুক্তিসংগত কাজ হল, আপনি সে সব নেতাদেরকে আবিয়াজ মহলে বন্দি করুন। কিন্তু মুস'আব রাযি. ঐ প্রস্তাব সমর্থন করা সমীচীন মনে করেননি। তিনি আক্ষেপ করে বলল– আল্লাহ তা'আলা আহনাফ বিন কায়েসের প্রতি দয়া করুন। সে আমাকে ইরাকবাসীদের বিশ্বাস ঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কতা

e-ilm.weebly.com

অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছে। আরো বলেছেন, ইরাকবাসীরা দ্বি-চারিনী নারীর মত। তাদের যেভাবে প্রতিদিন একজন করে নতুন পুরুষের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে এদেরও প্রতিদিন একজন করে নতুন শাসকের প্রয়োজন হয়, অবশেষে উভয় বাহিনীর মাঝে মুকাবিলা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক মূল যুদ্ধের সময় মুস'আব রাযি. এর অধিনস্থ ইরাকী বাহিনীর সরদারগণ হাত ঘুটিয়ে বসে থাকে। তবে ইবরাহীম প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিজের জীবন বিসর্জন করে দেন।

ইবরাহীম নিহত হওয়ার পর মুস'আব রাযি. নিরাশ হয়ে যান। ইরাকী সরদাররা বিশ্বাস ঘাতকতা করে কারবালার দৃশ্য চোখের সামনে এনে দেয়। কিন্তু তিনিও কারবালার সেনাপতির সুন্নাতের উপর আমল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর এ কবিতা আবৃতি করেন–

الا ان لى بالطف من ال هاشم ـ قاسو افتوا الكرام التاسيا

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান মুস'আব রাযি. এর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমার আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা নেই। আমি আপনাকে নিঃশর্তে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। মুস'আব রাযি. তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে জীবন বাজী রেখে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

দীরে জাসালিকের বিজয়ের পর ইরাক পুনরায় আবদুল মালিক দখল করে নেন এবং কুফায় ও বসরায় তার নিজের পক্ষ থেকে শাসক নিয়োগ করেন।

মক্কা অবরোধ

আবদুল মালিক ইরাক দখল করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি. এর বিরুদ্ধে বিরাট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ৭৩ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসে এ বাহিনী তায়েফ পৌঁছে তাবু স্থাপন করে। হাজ্জাজ ওখান থেকে অল্প অল্প সৈন্য আরাফাতের মাঠে পাঠাতে থাকে। আর তারা এখানে ইবনে যুবাইর রাযি. এর বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করতে থাকে। কিন্তু মীমাংসার কোনো উপায় পরিলক্ষিত হয়নি।

তখন হাজ্জাজ আবদুল মালিকের নিকট হারাম শরীফে প্রবেশ করে ইবনে যুবাইর রাযি. কে অবরোধ করার অনুমতি চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। তৎসঙ্গে জরুরী ভিত্তিতে সাহায্যের জন্য আবেদন করে। আবদুল মালিক তাকে হারাম শরীফে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। তারিকের নেতৃত্বে তার সাহায্যে পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীও প্রেরণ করেন। হাজ্জাজ মক্কা নগরী অবরোধ করে নেয়। আবু কুবাইস পাহাড়ে অবস্থান করে মিনজানিকের সাহায্যে কাবা গৃহে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তখন হজ্জের মৌসুম ছিল। হযরত ইবনে উমর রাযি. এর সুপারিশক্রমে হজ্জের দিন সমূহের জন্য পাথর বর্ষণ বন্ধ রাখা হয়। হজ্জের দিন শেষ হওয়ার পর পুনরায় কাবা গৃহের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

e-ilm.weebly.com

দীর্ঘ অবরোধের কারণে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দিন দিন ইবনে যুবাইর রাযি. এর শক্তি খর্ব হতে থাকে। তার অনুসারীগণ একে একে তার সঙ্গ ত্যাগ করে। এমনকি তার জেষ্ঠ দুই পুত্রও তাকে ছেড়ে হাজ্জাজের আশ্রয়ে চলে যায়। এ বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ইবনে যুবাইর রাযি. নিরাশ হয়ে যান। এমতাবস্থায় তিনি তার পুণ্যবর্তী জননী হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করেন–

"আম্মাজান! আমার সাথী-সংগীগণ এমনকি আমার পরিবারের সদস্যবর্গও আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। অল্প কয়েকজন যারা আমার সাথে রয়েছে, তারাও দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধারণ করতে অপ্রস্তুত। এমতাবস্থায় আমার জয়লাভের কোনো আশা নেই। তবে আমার শত্রুরা আমাকে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? হযরত আসমা রাযি. বললেন, বৎস! যদি তুমি মনে করো যে তুমি সত্যের উপর আছ এবং সত্যের প্রতি আহবান করছ, তাহলে তুমি তোমার শহীদ সাথীদের মত সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দাও। নিজের ক্ষমতার রশিকে বনী উমাইয়াদের গণ্ডার্দের হাতে সোপর্দ করো না। আর যদি তুমি দুনিয়া লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তোমার জন্য আক্ষেপ যে, তুমি তোমার নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ এবং নিজের সংগী-সাথীদেরও হত্যা করিয়েছ। অনন্তর তুমি যদি বল, আমি সত্যের পথে রয়েছি। কিন্তু সংগী-সাথীদের দুর্বলতার কারণে এখন মুকাবিলা করতে অক্ষম, তাহলে বলব– এটা তো কোনো দ্বীনের অনুসারীদের উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, সে মনোবল ও সাহস হারিয়ে ফেলবে। দুনিয়াতে কেউ চিরদিন জীবিত থাকবে না। তাই সত্যের পথে প্রাণ উৎসর্গ করে দেওয়া শ্রেয়।

হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. আরয করলেন, আম্মাজান! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমার মৃত্যুর পর আমার দুশমনরা আমার লাশ বিকৃত করে ফেলবে এবং আমার মৃত দেহ ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখবে। হযরত আসমা রাযি. বললেন,

প্রিয় বৎস! বকরি যখন যবাই হয়ে যায়, তখন তার চামড়া ছিলায় কষ্ট হয় না। যাও! যা ইচ্ছা তা করো। আর আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করো। অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. স্বীয় শ্রদ্ধাভাজন মায়ের মস্তক চুম্বন করে আরয করেন–

"আমি আপনার অভিমতের সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমি কখনো দুনিয়ার প্রতি অভিলাশী হইনি। আর না আমার নিকট দুনিয়ার জীবন পছন্দীয়। আমি জানতে চাই, এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি? আপনি আমার অর্ন্তদৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আম্মাজান! আমি নিহত হওয়ার পর আপনি চিন্তিত হবেন না। আর এ বিষয়ে আল্লাহর উপর সোপর্দ করুন।

e-ilm.weebly.com

হযরত আসমা রাযি. বললেন, আমি আশাবাদী যে, আমি ধৈর্য্য ও শোকরের সাথে তোমার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারব। যাও, আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে পড়। এরপর হযরত আসমা রাযি. স্বীয় পুত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন। বিদায় দেওয়ার সময় গলার সাথে মিলিত করেন। তাঁর হাত হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর বর্ম্মের উপর পড়লে তিনি বললেন, বৎস! মৃত্যু পদযাত্রী বর্ম্ম পরিধান করে না। এটি খুলে ফেল। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. বর্ম্ম খুলে ফেললেন। অতঃপর আস্তিন গুটিয়ে জামা ও পায়জামা পরিধান করে হাতে গোনা কয়েক জন সংগী-সাথী নিয়ে দুশমনের সারীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি যে দিকে ধাবিত হতেন, সেই দিক দুশমনদের সারীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতেন। অবশেষে অসংখ্য শত্রুকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে তিনি সাকুন গোত্রের জনৈক ব্যক্তির হাতে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের পর সিরিয়া বাহিনী খুশীতে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করে। এ দৃশ্য দেখে হযরত ইবনে উমর রাযি. বললেন, ঐ সব লোকদের প্রতি তাকিয়ে দেখো! হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. একদিন হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর জন্মের খুশিতে তাকবীর ধ্বনী দিয়েছেন। আর আজ এরা তাঁর মৃত্যুর খুশিতে তাকবীর ধ্বনী দিচ্ছে।

শহীদ হওয়ার পর হাজ্জাজ তাঁর খণ্ডিত মস্তক সিরিয়াতে আবদুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আর মস্তক বিহীন দেহ জাহুন নামক স্থানে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। হযরত আসমা রাযি. সে দিক দিয়ে যাত্রা কালে বললেন, এখনো কি এ অশ্বারোহীর অবতরণের সময় হয়নি? আবদুল মালিক এ খবর শুনার পর হাজ্জাজকে তিরস্কার করে তাঁর লাশ হযরত আসমা রাযি.-র নিকট হস্তান্তর করার আদেশ করেন। সুতরাং জাহুন নামক স্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদাতের পর রাজনৈতিক অংগনে আবদুল মালিকের কোনো প্রতিদ্বন্ধি থাকল না। তাই সে নিজেকে পুরো ইসলামী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র খলীফা রূপে ঘোষণা করে।

হাজ্জাজের ইরাক গমন

হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী দু' বছর পর্যন্ত হিজাজের গভর্নর ছিল। ইরাকের কলহ প্রিয় জমিন তখন পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র বলে চিহ্নিত ছিল। ঐ সব বিদ্রোহীদের মূলোৎপটনের জন্য কঠোর স্বভাবের শাসন কর্তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং৭৫ হিজরীতে হাজ্জাজকে বসরা ও কুফার গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানো হয়।

হাজ্জাজ শুধু বার জন আরোহী নিয়ে কুফা অভিমুখে যাত্রা করে। সর্বপ্রথম সে কুফার জামে মসজিদে পৌছে ভাষণ দানের ঘোষণা দেয়।

e-ilm.weebly.com

যখন সে ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে মিম্বারে আরোহন করে তখন সে মাথায় লাল রেশমী পাগড়ী বেঁধে রাখে। কুফাবাসীর কর্মপদ্ধতি আন্দাজ করার জন্য কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকে। পরে যখন কুফাবাসীগণ তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করে তখন সে মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে এবং নিম্নোক্ত ভাষায় ভাষণ দান করে।

"হে কুফাবাসীগণ! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পাকা ফলের মত অনেক মস্তক ঝেরে ফেলার উপযুক্ত হয়ে আছে। আমি আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পাগড়ি ও দাঁড়ির মাঝে রক্তের ফোয়ারা উথলে উঠছে। আল্লাহর কসম! আমাকে অতি সহজে দমন করা যাবে না। আমি বিদ্রোহ-বিশৃংখলাকে ভয় করি না। আমি গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ের স্বাদ উপভোগ করেছি।

খলীফা আবদুল মালিক তার তীরদানীর সবচাইতে কঠোর নির্মম তীর তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। তোমরা বিদ্রোহকে তোমাদের লক্ষ্যস্থল ও পথভ্রষ্টতাকে তোমাদের আবরনী বানিয়ে নিয়েছ। স্মরণ রেখো! আমি তোমাদের সকলের সব কাঁচা চুল পরিস্কার করে ফেলব।"

তোমাদের অবস্থা ঐ জনপদের লোকদের মত, যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওখানে সকল প্রকার শান্তি নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য্য বিদ্যমান ছিল। সকল প্রকার নিয়ামতের আধিক্য ছিল। কিন্তু ঐ জনপদের লোকজন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ক্ষুধা ও ভীতির শাস্তি প্রবল করেছেন।

আল্লাহর কসম! আমি যা বলেছি তা বাস্তবে পরিণতি করে দেখিয়েছি। আর যা ইচ্ছা করি তা বাস্তবে রূপ দান করি। আমীরুল মুমিনীন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের ভাতা পরিশোধ করি। আর সবাই মুহাল্লাব বিন আবু সুফরার সাথে খারিজীদের মুকাবেলা করার জন্য বেরিয়ে যাও। ভাতা পরিশোধ করার তিন দিন পর যদি তোমাদের কাউকে আমি কুফাতে উপস্থিত দেখি তাহলে আমি তার মস্তক উড়িয়ে দেব। ঐ ভাষণের পর পুরো মসজিদ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যারা হাতে পাথর নিয়ে ছিল, তারও মনের অজান্তে স্তিমিত হয়ে যায়।" এরপর হাজ্জাজ তার কৃতদাসকে আবদুল মালিকের পত্র পাঠ করে শোনানোর আদেশ করে। আদেশ অনুযায়ী কৃতদাস পত্র পাঠ করতে শুরু করে।

"পরকথা, আসসালামু আলাইকুম! হাজ্জাজ কৃতদাসকে থামিয়ে দিয়ে স্বয়ং কুফাবাসীদের সম্বোধন করে বলল, হে আমার সাথী-বন্ধুগণ! আমীরুল মুমিনীন তোমাদেরকে সালাম পাঠিয়েছেন। অথচ তোমরা তার সালামের জবাব দাওনি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আদব শিক্ষা দেব। এ কথা বলার পর কৃতদাসকে পুনরায় পত্র পাঠের আদেশ করে। এবার মসজিদের এমন কেউ ছিল না, যে সালামের জবাব দেয়নি। তারপর হাজ্জাজ ভাতা বণ্টন করা শুরু করে।

e-ilm.weebly.com

উমায়ের বিন খেয়ালী নামক জনৈক বৃদ্ধ ছিল কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত। সে হাজ্জাজের নিকট এসে বলল, হে আমীর! আমি একজন বৃদ্ধ ব্যধিগ্রস্থ লোক। আমার পরিবর্তে আমার পুত্রকে সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি করে নিন। হাজ্জাজ তার আবেদন মঞ্জুর করে। জনৈক ব্যক্তি বলল! আপনি কি জানেন, এ বৃদ্ধ কে? এ বৃদ্ধ হযরত উসমান রাযি. এর ঘাতকদের একজন। এ ব্যক্তি হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদতের পর কেউ তার দু'বাহু ভেংগে ফেলেছে। হাজ্জাজ এ কথা শুনে তাকে পুনরায় ডেকে বলল– হে বৃদ্ধ! তুমি হযরত উসমান রাযি. কে হত্যা করার জন্য তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠালে না কেন? তারপর তাকে হত্যা করে ফেলে। হাজ্জাজের এরূপ কঠোর আচরণের ফলে কুফাবাসীগণ ভাতা না নিয়ে মুহাল্লাবের নিকট রওনা হয়। কুফার পুল অতিক্রম করার মত রাস্তাও ছিল না। কুফা থেকে বিদায় হয়ে হাজ্জাজ বসরায় পৌছে। সেখানেও অনুরূপ রুঢ় ভাষায় ভাষণ দেয়।

শারীক বিন আমর ইয়াশাকারী তার নিকট এসে বলল, হে আমীর! আমি একশিরা রোগে আক্রান্ত। সাবেক আমীর বশীর বিন মারওয়ান আমাকে সৈন্য বিভাগ থেকে বাদ দিয়েছেন। আপনার নিকটও আমার ঐ আবেদন। হাজ্জাজ তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়। এরূপ কঠোর আচরণ দেখে বসরাবাসীগণ মহাল্লাবের বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কালক্ষেপণ করার কারো সাহস হয়নি। মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা এ অবস্থা দেখে বলল, হাঁ, এখন ইরাকে বীর পুরুষের আগমন হয়েছে।

ইবনে জারুদের উত্থান

মুহাল্লাবের সাহায্যার্থে হাজ্জাজ ইসতিকাবাজ নামক স্থানে এসে পৌছে। সেখান থেকে মুহাল্লাবের বাহিনী ৫৪ মাইল দূরে ছিল। হাজ্জাজের ইচ্ছা ছিল এখানে অবস্থান করে মুহাল্লাবের বাহিনীকে সাহায্য করা। এখানে অবস্থানকালে ভীষণ এক ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তা থেকে পিছনে ফেরা হাজ্জাজের জন্য ভীষণ কঠিন হয়। সারকথা হল, মুস'আব ইবনে যুবাইর রাযি. তাঁর শাসন আমলে সৈন্য বাহিনীর ভাতা দু'শ দিরহাম বৃদ্ধি করেছিলেন। হাজ্জাজের পূর্বসুরি উমাইয়া শাসক বশীর বিন মারওয়ান তা বহাল রেখেছিল। হাজ্জাজ তা রহিত করার ইচ্ছা করেছিল। একদিন ভাষণে বলেছিল–

আমি ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাসন আমলের বর্ধিত ভাতা রহিত করার ঘোষণা জারী করছি।"

এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইবনে জারুদ তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদ করে বলল, এটা ইবনে যুবাইর রাযি. বর্ধিত করেননি। বরং আবুদল মালিক বিন মারওয়ানও তা স্বীকার করে বহাল রেখেছেন। এ প্রতিবাদ হাজ্জাজের নিকট ভীষণ অসহনীয় মনে হয়। তাই সে ইবনে জারুদকে হত্যা করার ঘোষণা জারী

e-ilm.weebly.com

করে। তখন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী উভয় দল নীরব হয়ে যায়। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। কেননা তাতে সৈনিকের স্বার্থ জড়িত ছিল। তাতে অনেক সরদার ইবনে জারুদের সমর্থক হয়ে যায়। আর তারা তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

অবশেষে রবিউল আখির ৭৬ হিজরীতে ইবনে জারুদ বিরাট এক বাহিনী সাথে নিয়ে হাজ্জাজের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। প্রথম দিকে ইবনে জারুদ বিজয়ী হয়। এমনকি হাজ্জাজের বিশেষ তাবুও লুণ্ঠিত হয়। আর তার দু'স্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ আক্রমণে ইবনে জারুদ তীর বিদ্ধ হয়। ফলে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার বাহিনী ছত্রভংগ হয়ে যায়। এদিকে হাজ্জাজ পরিস্থিতি অনুকূল মনে করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে কৌশলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করে।

রাতবীলের বিদ্রোহ

সিজিস্তানের সীমান্ত এলাকায় জনৈক তুর্কী সরদার রাতবিল মুসলমানদেরকে কর দিত। কিন্তু মুসলমানদের আভ্যন্তরীন গৃহযুদ্ধের কারণে কিছু দিন থেকে তার মনোভাব পরিবর্তন হতে শুরু করে। সে দীর্ঘদিন ধরেই টালবানা করতে থাকে। ইচ্ছে হলে কখনও বার্ষিক কর পরিশোধ করত আবার কখনো পরিশোধ করত না। ৭৮ হিজরীতে হাজ্জাজ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকরকে সিজিস্তানের গভর্নর মনোনীত করে পাঠায়। তখন এক বছর পর্যন্ত রাতবিলের মনোভাব ভালো ছিল। এরপর সে বার্ষিক কর পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। তাই হাজ্জাজ উবাইদুল্লাহকে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়। সে তার বাহিনী নিয়ে রাতবিলের এলাকায় প্রেবেশ করে হামলা করে। তার সব দূর্গ ধ্বংস করে দেয়। তার সব ধনাগার দখল করে নেয়। রাতবিল পেছনের দিকে সরে যেতে শুরু করে। সে তার রাজধানীর নিকটবর্তী পৌঁছে তুর্কীদের নির্দেশ দেয়, তারা যেন পেছনের দিকে ফিরে মুসলমানদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। সুতরাং মুসলমানগণ তুর্কীস্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে রাতবিলকে সাত লাখ দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু সৈন্য বাহিনীর এক অংশ মুক্তিপণের মাধ্যমে কৃত সন্ধি করা অপছন্দ করে। তাই তারা শরাইই বিন হানীর নেতৃত্বে প্রাণপণে লড়াই করে শহীদ হয়ে যায়।

হাজ্জাজ মুসলমানদের এ পরাজয়ের খবর জানার পর আবদুল মালিকের নিকট রাতবিলে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং সে ৮০ হিজরীতে ৪০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আশআসের নেতৃত্বে সিজিস্তান অভিমুখে প্রেরণ করে। আবদুর রহমান সিজিস্তান বাসীদেরও তার সাথে নিয়ে বিরাট বাহিনীর সাহায্যে রাতবিলে হামলা করে।

e-ilm.weebly.com

রাতবিল এ আক্রমণের পরিণতি অনুধাবনে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আবদুর রহমান তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আবদুর রহমানের একজন চৌকশ সেনাপতি ছিল। সে যে শহরই দখল করত, সেই নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করত এবং সাহায্যের জন্য কিছু সৈন্য রেখে যেত। পাহাড়ের চূড়ায় সেনা ছাওনী তৈরী করত। আর আশঙ্কাজনক স্থানসমূহে সৈন্য বাহিনী নিযুক্ত করত। তার নিজের বিজীত এলাকা সমূহের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করত। এভাবে সে রাতবিলের বিরাট এলাকা দখল করে নেয়। এরপর সে সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দিয়ে বলল, এ বছরের জন্য এ পর্যন্তই যথেষ্ট। আমরা বিজীত এলাকায় যখন পূর্ণ শান্তি-শৃংঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হব এবং আমাদের লোকজন যখন এ দেশের পথ-ঘাট সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি লাভ করবে, ইত্যাবসরে আমরাও কিছুটা বিশ্রাম করে নেব, তখন আগামী বছর আমরা পুনরায় সামনে অগ্রসর হব। সে তার সিদ্ধান্তের বিষয় হাজ্জাজকেও জানায়।

ইবনে আশআসের উত্থান

হাজ্জাজ ও আবদুর রহমানের অন্তর পরস্পরের প্রতি পরিস্কার ছিল না। হাজ্জাজ আবদুর রহমানকে পত্র লিখেছিল–

"মনে হয় তুমি সন্ধি চুক্তি করার মনোভাব পোষণ করছ। আনুগত্যের বান করে আরাম-আয়েশ উপভোগ করছ। দুর্বল ও নির্বোধ দুশমন যারা মুসলমানদের প্রশংসার যোগ্য সৈন্য বাহিনীর সাথে প্রতারনা করেছে; তাদের সাথে নমনীয় আচরণের ইচ্ছা করেছ। আমি তখন আত্মতৃপ্তি লাভ করব, যখন তুমি আমার একজন সৈনিক দ্বারা তাদের মুকাবিলা করে সফল হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, তোমার এ মনোভাবের পেছনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু তাতে তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং আমি তোমাকে যা আদেশ দিয়েছি, তুমি তা পালন করে দুশমনদের সব এলাকায় নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর। তাদের দূর্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দাও। প্রতিরোধ কারীদের হত্যা করে ফেল। তাদের পরিবার-পরিজন সকলকে বন্ধী করে ফেল।

এরপর দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করে। যার ভাষ্য নিম্নরূপ। "যদি তুমি আমার আদেশ পালন করতে অপ্রস্তুত থাক, তাহলে আমার ভ্রাতা ইসহাক বিন মুহাম্মাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

ইবনে আশআসের নিকট যখন এ চিঠি পৌছে, তখন বুঝতে পারে যে, হাজ্জাজের উদ্দেশ্য পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়া। সে তার বাহিনীকে সমবেত করে বলল, হে লোক সকল! আমি যুদ্ধা বিলম্বিত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তা আপনাদের কল্যাণের চিন্তায় আপনাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে করেছি। এখন হাজ্জাজের এ আদেশ এসেছে। এ বিষয়ে যা কিছু

e-ilm.weebly.com

করতে হয়, আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করুন।" এ কথা শুনে সকল সৈন্য একবাক্যে বলল, "আমরা আল্লাহর এ দুশমনের কথা শুনব না।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবু তোফায়েল আমের বিন ওয়াসিলা রাযি. বলল, "হাজ্জাজ এমন কাজ করছে, যেন সে নিজের গোলামদের যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছে। যদি মারা যায় তাহলেও তারই লাভ হবে। আর যদি তারা জীবিত থাকে তাহলে তাতে তার পরোয়া নেই। নিজের ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধির আশা পোষণ করছে।

এর পর সকলে পরামর্শ করে যে, আমরা হাজ্জাজের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম। আর আবদুর রহমান বিন আশআসকে আমাদের নেতা মনোনীত করলাম।

আবদুর রহমান বিন আশআস নেতৃত্বের বাই'আত গ্রহণের পর রাতবিলের সাথে এ শর্তে সন্ধি স্থাপন করে যে, যদি সে কৃতকার্য হয় তাহলে রাতবিল থেকে খাজনা গ্রহণ করবে না। আর যদি সে পরাজিত হয় তাহলে রাতবিল তাকে সাহায্য করবে। এ দিকে আশ্বস্ত হয়ে ইবনে আশআস হাজ্জাজের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে। পারস্যে পৌঁছে ইবনে আশআসের সাথীগণ পরামর্শ করে যে, হাজ্জাজকে নিয়োগকারী আবদুল মালেকের বাই'আত ভংগ করতে হবে। সুতরাং তারা এখানে আবদুল মালিকের বাই'আত ভংগের ঘোষণা দেয়। আর ইবনে আশআসের হাতে খিলাফতের বাই'আত গ্রহণ করে। হাজ্জাজ এ খবর শোনার পর তার পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে হয়ে যায়। সে তাৎক্ষণিকভাবে আবদুল মালিককে পুরো ঘটনা অবহিত করে এবং তার নিকট সাহায্য পাঠানোর আবেদন করে। অনন্তর নিজেই কুফা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। আবদুল মালিক তাৎক্ষণিকভাবে হাজ্জাজের সাহায্যে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

তাসতারের যুদ্ধ

হাজ্জাজ সিরিয় সৈন্যের এক বাহিনী সাথে নিয়ে বসরা থেকে যাত্রা করে তাসতার নামক স্থানে অবস্থান নেয়। সে তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে দাজিলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। আবদুর রহমানের এক বাহিনীর সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। তাতে হাজ্জাজের বাহিনী পরাজিত হয়। তার অনেক সৈন্য নিহত হয়। হাজ্জাজ বসরার দিকে ফিরে আসে। কিন্তু আবদুর রহমান তার পেছনে ধাওয়া করে। হাজ্জাজ মুকাবিলা করার সাহস না পেয়ে বসরা ত্যাগ করে জাবিয়া চলে যায়। আবদুর রহমান বসরা দখল করে নেয়। বসরাবাসীগণ পূর্ব থেকেই হাজ্জাজের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তাই তারা স্বেচ্ছায় আবদুর রহমানের পতাকার নিচে সমবেত হয়। বসরার জ্ঞানী গুণীজনও তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। এ ঘটনা ৮১ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে সংঘঠিত হয়।

e-ilm.weebly.com

জাবিয়ার যুদ্ধ

৮৩ হিজরীর মহররম মাসে জাবিয়া নামক স্থানে হাজ্জাজ ও আবদুর রহমানের বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। প্রথম অবস্থায় আবদুর রহমানের বাহিনী বিজয়ী হতে থাকে। একদিন হাজ্জাজ নিরাশ হয়ে হাটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহ তা'আলা মুস'আব ইবনে যুবাইর রাযি. কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সে বিবাদের সময়ের পলায়ণের লজ্জা পছন্দ করেনি।" তারপর সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অনুরূপভাবে সেও প্রাণ বিসর্জন দেবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ণ করবে না।

হাজ্জাজের এ সাহসিকতা ফলে তার সৈন্যদের মধ্যেও সাহসের সঞ্চার হয়। তারা পূর্ণ উদ্যমে আবদুর রহমানের ডান বুহ্যের উপর আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে দেয়। এরপর আবদুর রহমানের বাহিনীর পায়ের তলার মাটি শূন্য হয়ে যায়। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী যুদ্ধে নিহত হয়। এভাবে হাজ্জাজ বসরা দখল করে নেয়। আবদুর রহমান কুফায় প্রবেশ করে ওখানের দুর্গে আশ্রয় নেয়। আবদুর রহমানের অসংখ্য লোক বসরা থেকে কুফা এসে সমবেত হয়।

দীরে জমাজিমের যুদ্ধ

হাজ্জাজ বসরা থেকে যাত্রা করে দীরে কুররাহ নামক স্থানে অবস্থান করে। নতুন সিরিয় বাহিনীও তার সাহায্যে এখানে এসে সমবেত হয়। আবদুর রহমান ইবনে আশআসও ২ লাখ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে যাত্রা করে এবং দীরে জামজিম নামক স্থানে এসে অবস্থান নেয়। উভয় দল পরিখা খনন করে নিজেদের নিরাপত্তাবলয় তৈরী করে। অতঃপর এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে।

আবুদল মালিক যুদ্ধের দীর্ঘতা ও নিষ্ফল গৃহযুদ্ধে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি স্বীয় উপদেষ্টাদের সমবেত করে বললেন, ইরাক বাসীদের এ মনোভাব হাজ্জাজের উপর অসন্তুষ্টির কারণ। যদি আমি তাকে পদচ্যুত্য ঘোষণা করে ইরাক বাসীদের বশ করতে পারি, তাহলে এ সদায়ের মূল্য চড়া হবে না। আবদুল মালিকের উপদেষ্টাগণ তার এ প্রস্তাব সমর্থন করে। সুতরাং আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে রাজ কমিশন তার ভ্রাতা মুহাম্মদ বিন মারওয়ান ও তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে ইরাক এসে পৌছে। তারা উভয়ে ইরাকবাসীদের সম্মুখে ঐ শাহী ঘোষণা প্রকাশ করে।

"আমীরুল মুমিনীন হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ইরাকের গভর্নরের পদ থেকে পদচূত্য ঘোষণা করতে প্রস্তুত। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, ইরাক বাসীদেরও সে অধিকার দেওয়া হবে, যা সিরিয়াবাসীদের দেওয়া হয়েছে। আর আবদুর রহামন সাম্রাজ্যের যে এলাকার রাজত্ব করতে চায়, তাকে সারা জীবনের জন্য সে এলাকা দিয়ে দেওয়া হবে। যদি সে এ শর্তে সুন্ধি চুক্তি করতে সম্মত হয়, তাহলে

e-ilm.weebly.com

আমীরুল মুমীনিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ানকে ইরাকের নতুন গভর্নর মনোনীত করবেন। নতুবা পূর্বের রীতি অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্নর হিসেবে বহাল থাকবে। আর তার ইখতিয়ার থাকবে, সে যেভাবে পারে ইরাকবাসীদেরকে দমন করবে। আশআসের সাথীগণ আবদুল মালিকের এ প্রস্তাব সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করে। আবদুর রহমানের অভিমত ছিল, প্রস্তাব সন্মানজনক। এ সন্ধি চুক্তি গ্রহণ করা হোক। কিন্তু তার সাথীগণ তার প্রস্তাবে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারে নি। তারা বলল, আমরা যখন সিরিয়া সৈন্যদের সর্বত্র পরাজিত করে দিয়েছি, সেখানে সন্ধি চুক্তি করব কেন। অবশেষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তারপর ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। ৮৩ হিজরীর ১৪ জমাদিউল আখির তারিখে অবশেষে ভাগ্য পরীক্ষা মূলক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। প্রথম দিকে সৈন্য বাহিনী বীরত্বের পরিচয় দেয়। ১০৩ দিনের ধারাবাহিক যুদ্ধে আবদুর রহমানের বাহিনী পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ান করতে বাধ্য হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিজয়ীর বেশে কুফায় প্রবেশ করে। আর সে এ এই বলে বিজীত লোকদের বাই'আত গ্রহণ করে যে, আমি আমীরুল মুমিনিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কুফরী করেছি। আমি ঐ কুফরী থেকে তাওবা করছি। যে কেউ এ বাক্য উচ্চারণ করতে কোনো প্রকার বিলম্ব করত, তাকে নিষ্ঠুরভাবে তৎক্ষণাত হত্যা করে ফেলত। (ইবনে আছীর–৪/১৮৫)

শা'বী ও আ'শা

ইবনে আশআসের সমর্থনে যে সব কলামিষ্ট কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে ইরাকের ফিকহা বিদ আমের শাবীও ছিলেন। বিজয়ের পর হাজ্জাজ ঘোষণা জারী করল, যে ব্যক্তি কুতাইবা বিন মুসলিমের নিকট চলে যেতে চায়, তাকে বাঁধা দেওয়া হবে না।

সুতরাং তিনিও কুতাইবার নিকট চলে যান। হাজ্জাজ কুতাইবার নিকট খবর পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে। শাবী বলেন, তিনি যখন কুফায় পৌছেন তখন তাঁর বন্ধুগণ পরামর্শ দিয়েছিল, যতদূর সম্ভব ওজর-আপত্তি পেশ করে কাজ উদ্ধার করুন। কিন্তু তাঁর সাহস ছিল বিজ্ঞজনুচিত। তিনি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখান করেন। অনন্তর তাকে হাজ্জাজের দরবারে উপস্থিত করা হলে তিনি জবাব দেন,

"হে আমীর! আমি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। অন্যদেরকেও বিদ্রোহে উৎসাহ দিয়েছি। আর এ বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাই হয়েছে, যা আল্লাহর ইচ্ছায় মঞ্জুর ছিল। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিজয়ী-সফলতা দান করেছেন। এখন আপনি যদি আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান, তাহলে আমি তার উপযুক্ত। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। তাহলে তা হবে আপনার সহনশীলতা। হাজ্জাজ তাঁর এ স্পষ্ট কথা শুনে হতবাক হয়ে যায়। বলতে শুরু করে–

e-ilm.weebly.com

"হে শাবী! তোমার এ স্পষ্ট ভাষা আমার নিকট ঐ ওজর-আপত্তি পেশ করা থেকে বেশী প্রিয়, যার তরবারী থেকে এখন রক্তের ফোটা ঝরছে। সে বলেছিল– আমি কিছুই করিনি। আমি এ সম্পর্কে কিছুই অবগত নই। যাও তুমি মুক্ত।" আরবী কবি মিষ্টভাষী হামদানীও এসব যুদ্ধে ইবনে আশআসের সমর্থন করেছিল। তার অগ্নিঝরা কবিতায় সৈন্যদের উত্তেজিত করে ছিল। যখন ইবনে আশআস সিজিস্তান থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন আ'শার এক কবিতা সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল।

كذا بها الماضى وكذاب ثانى ـ امكن ربى من ثقيف همدانى

অর্থাৎ বনী সাকীফ গোত্রে দু'জন মিথ্যাবাদী জন্মেছে। একজন সাবেক মুখতার। আর দ্বিতীয়জন হাজ্জাজ। আহ! আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে বনী সাকীফ হামদান থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দান করতেন!

হাজ্জাজ তাঁকেও তলব করে বলেন, আপনার কিছু কবিতা শোনান। আ'শা বললেন, পিছনের কবিতার কথা বাদ দিন। আমি আপনাকে নতুন কবিতা শুনাচ্ছি। এ কথা বলে হাজ্জাজের প্রশংসায় একদীর্ঘ কবিতা আবৃতি করতে শুরু করেন।

যার শুরুটা নিম্বরূপ,

الى الله الا ان يتم نوره ـ ويطفى نور الفاسقين فتخمدا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, তিনি সত্যের জ্যোতিকে পূর্ণাঙ্গ করে দেবেন।

আর ফাসিকদের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিবেন, যাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আ'শার এ আবেগপূর্ণ কবিতা শোনার পর চতুর্দিকে বাহঃ বাহঃ রব উঠে। কিন্তু হাজ্জাজ তাকে ক্ষমা না করে হত্যা করে ফেলে।– ইবনে আছীর –৪/১৮৮

ইবনে আশআসের মৃত্যু

দীরে জামাজিমের যুদ্ধের পর ইবনে আশআসের শক্তির ভিত দুর্বল হয়ে যায়। এ পরাজয়ের পর বসরায় পৌছে বিক্ষিপ্ত শক্তি সংগঠিত করে মুকাবিলা করে। কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে কিরমান, সিজিস্তান ও বাসত হয়ে তার মিত্র রাতবিলের নিকট তার এলাকায় চলে যায়। এখানে পৌছার পর যক্ষা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাতবিলের নিকট খবর পাঠায় যে, যদি তুমি ইবনে আশআসের মাথা কেটে আমার নিকট পাঠাতে পার, তাহলে আমি তোমার ৭ বছরের খাজনা মাফ করে দিব। রাতবিল তার মৃত্যুর পর মাথা কেটে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে ৭ বছরের খাজনা মাফ করে নেয়।

কথিত আছে, রাতবিল পুরস্কারের লোভে জীবিত থাকা কালে তার মাথা কেটে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, রাতবিল ইবনে আশআসকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু রাস্তায় সে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনা ৮৫ হিজরীতে সংঘঠিত হয়। ইবনে আছীর–৪/১৯২

e-ilm.weebly.com

খারেজিদের উত্থান

ইবনে যিয়াদ মক্কায় খরিজীদের উপর কঠোরতা আরোপ করায় খারিজীরা স্থির করে যে, মক্কায় ইবনে যুবাইর রাযি. এর অবস্থা দেখতে হবে। যদি তিনি আমাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন, তাহলে তার সাথে মিলিত হয়ে বনী উমাইয়াদের মুকাবিলা করব। আর যদি তিনি দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেব। সুতরাং খারিজীরা মক্কায় পৌঁছে। সে সময় ইয়াযিদ সিরিয় সৈন্যদেরকে ইবনে যুবাইর রাযি. এর বিরুদ্ধে মক্কায় পাঠাচ্ছিল।

ইবনে যুবাইর রাযি. এর তখন সৈন্য বাহিনীর সাহায্যের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। কাজেই তিনি আকাঈদ সংক্রান্ত বিষয়ে তর্কবিতর্ক না করে খারিজীদেরকে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। কিন্তু সিরিয়া থেকে ইয়াজিদের মৃত্যুর খবর মক্কায় পৌঁছালে সিরিয় বাহিনী অবরোধ তুলে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। তখন খারিজীরা পরস্পর আলোচনা করে যে, আমরা এমন এক ব্যক্তির সাহাযার্থে যুদ্ধ করছি, যার আকীদা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কাজেই তাঁর নিকট থেকে হযরত উসমান, তালহা ও যুবাইর রাযি. সম্পর্কে তার অভিমত জেনে নেওয়া উচিত। সে মতে নাফে ইবনে আজরাক উবাইদাহ বিন বিলাল প্রমুখ স্বীয় দলের সাথে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট আসেন। আর ঐ খ্যাতনামা তিন সাহসীর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. তখন তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। দ্বিতীয় দিন খারিজীদের উৎপাত থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করে এক জোরালো ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি ঐ খ্যাতনামা তিন সাহাবী সম্পর্কে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির পূর্ণাঙ্গ জবাব দেন। বললেন, আমি এ সমবেত জনতার সামনে আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী করে ঘোষণা করছি যে, আমি হযরত উসমান রাযি. এর বন্ধুদের বন্ধু আর তার দুশমনদের দুশমন।"

খারিজীদল তার জ্বালাময়ী ভাষণ শোনার পর একে অন্যের প্রতি তাকাতে শুরু করে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে মক্কা থেকে বিদায় হয়ে যায়। তখন এক দল আহওয়াজ অভিমুখে যাত্রা করে। অপর দল ইয়াসামাহ অভিমুখে যাত্রা করে। আহওয়াজগামী দলের নেতা ছিল নাফে বিন আরজাক। সে আহওয়াজ পৌঁছে খলীফার মনোনীত শাসককে বের করে দিয়ে স্বয়ং খাজনা আদায় করতে শুরু করে। এতদিন পর্যন্ত তারা একত্রে সংঘঠিত ছিল। কিন্তু আহওয়াজে নাফের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের আকীদায় মতদ্বৈততা দেখা দেয়।

নাফে বলল, সকল গাইরে খারিজী মক্কার কাফিরদের মত কাফির। আমাদের জন্য তাদের শিশুদেরকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ। তাদের যবাইকৃত পশু আমাদের জন্য খাওয়া অবৈধ। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকারী সম্পর্ক রাখা অবৈধ। তাদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের নিকট

e-ilm.weebly.com

আসলে তার আকীদা পরীক্ষা করতে হবে। যদি সে আমাদের আকীদায় বিশ্বাসী হয় তাহলে তো ভালই। নতুবা তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলতে হবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত থাকা পছন্দ করে এবং সত্যের সাহায্যে তরবারী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে না আসবে, সেও কাফির।

আবদুল্লাহ বিন উব্বায বলল, আমাদের দুশমনের খুন বৈধ। এ ক্ষেত্রে তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুশমনদের খুনের মত বৈধ। এরা তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসী বলে আমরা তাদেরকে কাফির ঘোষণা করতে পারি না। তবে তাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে অকৃতজ্ঞ বলা যাবে নিঃসন্দেহে। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও উত্তরাধিকারী সম্পর্ক রাখা বৈধ।

আবু হুসাইন, হাইছাম বিন জাবির যাবঈ বলল, আমাদের দুশমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুশমনের মত। কিন্তু এরা বাহ্যতঃ মুসলমান আর পরোক্ষভাবে মুনাফিক। বিধায় তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে বৈবাহিক ও উত্তরাধিকারী সম্পর্ক রাখা যায়। আবদুল্লাহ বিন সাফফার বলেন, যারা এ হাঙ্গামার সময় পৃথক হয়ে নীরবতা অবলম্বন করবে, তারা তাওহীদে বিশ্বাসের যোগ্য হবে না। এ ভাবে খারিজীরা চার দলে বিভক্ত হয়ে যায়। (১) আযরাকিয়া (২) আবাযিয়া (৩) হুমাইসি (৪) সিফরি। উক্ত চার দলই একে অপরকে কাফির বলা শুরু করে।

আযরাকিয়াদের উত্থান

নাফে ইবনে আযরাক তার মতবাদে কঠোর ছিল। বিধায় আহওয়াজে হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার সরগরম হয়ে যায়। তারপর সে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে বসরার পুল পর্যন্ত পৌঁছে। আবদুল্লাহ বিন হারেছ হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর মনোনীত তৎকালীন বসরার শাসক ছিল। তিনি মুসলিম বিন উবাইসকে তার মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম বিন উবাইস নাফেকে পরাজিত করে দুলাবের দিকে তাড়িয়ে দেয়। এখন উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। তাতে নাফে ও মুসলিম উভয় মারা যায়। বসরাবাসী হাজ্জাজ ইবনে বারকে, খারিজীরা আবদুল্লাহ বিন মাহুজকে তাদের নেতা মনোনীত করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তারা দু'জনও যুদ্ধে নিহত হয়। তখন বসরাবাসী রবিয়া বিন আহরামকে আর খারিজীরা উবাইদুল্লাহ বিন মাহুজকে তাদের নেতা মনোনীত করে। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হয়। লড়াই চলতে থাকে। যুদ্ধ চলা অবস্থায় উভয় দলই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খারিজরা একটু বিশ্রাম নিয়ে যুদ্ধ করে বসরা বাসীদের পরাজিত করে দেয়। আর তাদের নেতা রবিয়া নিহত হয়। এখন খারিজীদল পূর্ণোদ্যমে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। বসরাবাসীগণ এ খবর পেয়ে ভীত হয়ে যায়। হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. আবদুল্লাহ বিন হারিছকে বসরার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে হারাছ বিন আবু রবীয়াকে নিয়োগ দেয়। –ইবনে আসির– ৪/৭৬

e-ilm.weebly.com

হারছ বিন আবু রবীয়া বসরা পৌঁছে বসরাবাসীদের সাথে পরামর্শ করে। তখন আহনাফ বিন কায়েস ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একযোগে ঐক্যমতে পৌঁছে যে এ কাজ মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা তখন খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে খোরাসান অভিমুখে যাত্রা করছিল। কিন্তু তিনি এ শর্তে এ কাজ করতে রাজী হন, যে এলাকা তিনি দখল করবেন, ঐ এলাকা তার শাসনাধীনে দিতে হবে। আর তার যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে, তিনি তা সরকারী কোষাগার থেকে নিতে পারবেন। তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী তার অধীনস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

অতঃপর মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে খারিজীদের দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদেরকে বসরার নিকট থেকে তাড়িয়ে আহওয়াজ পর্যন্ত নিয়ে যান। এখানে পৌঁছার পর সালীসাবরী নামক স্থানে উভয় দলে মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। প্রথম দিকে খারিজীরা জয়ী হয়। কিন্তু মুহাল্লাব তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে পুণর্গঠিত করে খারিজীদের পরাজিত করে। যুদ্ধে তার নেতা আবদুল্লাহ বিন মাহুয নিহত হয়। আর অবশিষ্ট খারিজীরা তরবারীর ভয়ে কিরমান ও ইস্পাহানের দিকে পালিয়ে যায়। মুহাল্লাব সর্বদা খারিজীদের নির্মুল করায় লিপ্ত থাকেন। পরবর্তীতে মুস'আব বিন যুবাইর রাযি. বসরার গভর্নর মনোনীত হয়ে আসেন। তখন তিনি মুহাল্লাবকে সমূলের শাসক নিয়োগ করে মসূলে পাঠিয়ে দেন। আর খাওয়ারীজদের নির্মুল করার কাজে উমর বিন উবাইদুল্লাহ বিন আমরকে নিয়োজিত করেন।

ঐ সময় খারেজীরা আরজান নামক স্থানে ছিল। তাদের নেতা ছিল যুবাইর বিন আলী সালীলি। উমর বিন উবাইদুল্লাহ খারেজিদেরকে পরাজিত করে আরজান থেকে বিতাড়িত করে দেন। খারিজীদল ইস্পাহানে চলে যায়। ইস্পাহানে সে শক্তি সঞ্চয় করে সাবুর নামক স্থানে আসে। উমর বিন উবাইদুল্লাহও তার বাহিনী নিয়ে সাবুর পৌঁছেন। খারিজীরা এক রাতে উমর বিন উবাইদুল্লাহর বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। তারপর উমর বিন উবাইদুল্লাহ খারিজীদের দিকে অগ্রসর হোন। তখন উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। খারিজীরা পরাজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধে উবাইদুল্লাহর পুত্র উবাইদুল্লাহ নিহত হয়। তারপর খারিজীদল পারস্যে চলে যায়। উমর বিন উবাইদুল্লাহ তাদের ইস্পাহানের দিকে তাড়িয়ে দেন। কিছু দিন পর সে পুনরায় আহওয়াজে প্রবেশ করে। উমর বিন উবাইদুল্লাহ তখন আসতাখোর ছিল। মোটকথা, খারিজীদল এভাবে হত্যা-লুণ্ঠন ও বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করতে করতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরা ফেরা করতে থাকে। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়নি।

e-ilm.weebly.com

মুসআব বিন যুবাইর রাযি. অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করেন। সকলেই ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা তাদেরকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারবেন। সুতরাং মুহাল্লাবকে মসূল থেকে ফেরৎ নিয়ে এসে খারিজীদের দমনে নিয়োজিত করা হয়।

তখন খারিজীদের নেতা ছিল কাতারী বিন ফাজ্জারাহ। মুহাল্লাব তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কাতারী এ খবর পেয়ে কিরমান পালিয়ে যায়। মহাল্লাব আহওয়াজে এসে অবস্থান করে। খারিজীরা পুণর্গঠিত হয়ে ময়দানে আসে। মুহাল্লাব তাদেরকে রামাহুরমুজের দিকে তাড়িয়ে দেন।

ইত্যাবসরে মুসআব বিন যুবাইর রাযি. শহীদ হন। আর ইরাক আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের দখলে চলে যায়। আবদুল মালিক খালিদ বিন আবদুল্লাহ বিন উবাইদকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। খালিদ মুহাল্লাবকে ফেরৎ নিয়ে এসে আহওয়াজের কর আদায়কারী নিয়োগ করে এবং স্বীয় ভ্রাতা আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহকে খারিজীদের দমনে নিয়োজিত করে। লোকজন তাকে পরামর্শ দেয়, খারিজীদের মুকাবিলায় মুহাল্লাব ও উমর বিন উবাইদুল্লাহর আহওয়াজ ও পারস্যের ঘাটিসমূহে বহাল রাখা জরুরী। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি। আবদুল আযীযের সাথে দারূল জাবরদ নামক স্থানে খারিজীদের মুকাবিলা হয়। খারিজীদল তাকে পরাজিত করে দেয়। খালিদ আবদুল মালিককে পরাজয়ের খবর পৌঁছায়। তখন আবদুল মালিক কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তার নিকট পত্র পাঠান।

"এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার একমাত্র কারণ, তুমি মক্কার এক বেদুইনকে খারিজীদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণের কাজে নিয়োজিত করেছ। আর মুহাল্লাবের মত সেনাকর্মকর্তাকে খাজনা আদায়ের কাজে নিয়োজিত করেছ। মুহাল্লাবকে লিখো, সে যেন খারিজীদের দমনে আহওয়াজ অভিমুখে যাত্রা করে। আর তুমি নিজেও বসরাবাসীদের সাথে নিয়ে আহওয়াজ গিয়ে পৌঁছ। আমি আমার ভ্রাতা বশীরকে কুফায় পত্র পাঠাচ্ছি, সে যেন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তোমার সাহায্যে বের হয়। আর মনে রেখো, মুহাল্লাবের পরাপর্শ ছাড়া তুমি কোনো কাজ করবে না। উক্ত আদেশ অনুযায়ী মহাল্লাব খারিজীদের দমনের উদ্দেশ্যে আহওয়াজ অভিমুখে যাত্রা করে। অপরদিকে বসরা থেকে খলিদ বিন আবদুল্লাহ আর কুফা থেকে আবদুল রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আশ'আছ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

খারিজীদের এ বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাহস হয়নি। তারা এ অবস্থা দেখে পলায়ন করতে শুরু করে। খালিদ, দাউদ বিন কাহযামকে তাদের পিছু নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বসরায় ফিরে যায়। অপর দিকে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আশআস রায় চলে যান। মুহাল্লাব আহওয়াজে অবস্থান করতে থাকেন। দাউদ বিন কাহ্যাম তাড়া খেয়ে এত দূর পর্যন্ত চলে যায় যে, তার

e-ilm.weebly.com

বাহিনীর ঘোড়াগুলো মারা পড়ে। তাদের সব রসদ শেষ হয়ে যায়। অবশেষে তার ক্ষুধার্থ বাহিনীকে নিয়ে পায়ে হেটে আহওয়াজ পৌছে।

কাতারী আহওয়াজে ক্ষমতাসীন থাকাকালে বাহরাইনে আবু ফুদাইক নামক জনৈক খারিজীর আবির্ভাব হয়। সে নাজদায় আমের হানাফীকে হত্যা করে বাহারাইন দখল করে নেয়। খালেদ বিন আবদুল্লাহ আবু ফুদাইককে দমন করার জন্য তার ভাই আমীর উমাইয়া বিন আবদুল্লাহকে বিশাল এক বাহিনীসহ প্রেরণ করে। আবু ফুদাইক উমাইয়াকে পরাজিত করে দেয়। আবদুল মালিক এ খবর পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বসরা থেকে খালিদকে পদচ্যুত করে তার ভাই বাশার বিন মারওয়ানকে কুফার সাথে বসরার গভর্নর মনোনীত করে। এ ঘটনা ৭৩ হিজনীতে সংঘঠিত হয়।

ইরাকীদের গভর্নর নিয়োগ করার পর আবদুল মালিক বাশারকে পত্র মারফত নির্দেশ দেয় যে, মুহাল্লাবকে আযরাকার খারিজীদের নির্মূল করার জন্য বসরার খ্যাতনামা বীর অশ্বারোহীদেরসহ পাঠিয়ে দাও। আর কুফার বীর রণকৌশলী সাহসী সৈনিকদের এক বাহিনীকেও তার সাহায্যে পাঠিয়ে দাও। তাহলে উভয় বাহিনী যৌথভাবে খারিজীদের ধাওয়া করে নির্মূল করে দেবে। আবদুল মালিক কর্তৃক মুহাল্লাবকে সরাসরি সেনাপ্রধান নিয়োগ করার আদেশটি বাশারের নিকট অপছন্দ হয় সে ক্ষোভে দুঃখে জ্বলতে শুরু করে।

আবদুল মালিকের আদেশ পালনে বাশার কুফা ও বসরা থেকে মুহাল্লাবের সাহাযার্থে দুই বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু সে বসরা থেকে এমন লোকদের মনোনীত করে, যারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। আর কুফায় বাহিনীর সরদার আবদুর রহমান বিন মুখান্নাফকে কুপরামর্শ দেয় যে, তুমি মহাল্লাবের আদেশ সঠিকভাবে পালন করবে না বরং তাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার কৌশল অবলম্বন করবে। রামাহুরমুজ পৌছে উভয় বাহিনী খরিজীদের মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হয়। ইত্যাবসরে বসরা থেকে বাশার বিন মারওয়ানের মৃত্যুর খবর আসে।

তার মৃত্যু খবর শোনার পর অধিকাংশ বসরা ও কুফা বাসী স্ব গৃহে ফিরে যায়। বাশারের স্থলাভিষিক্ত খালেদ বিন আবদুল্লাহ তাদেরকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আবদুল মালিকের কঠোর শাস্তির ভয়ও দেখায়। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি।

অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুফা ও বসরার গভর্নর পদে মনোনীত হয়ে আসে এবং প্রথম ভাষণে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে দেয়। তারা তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর বিবরণ হাজ্জাজের গভর্নর মনোনীত হওয়ার পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কুফা ও বসরা বাসীগণ যখন মহাল্লাব ও ইবনে মুখান্নাফের নিকট দ্বিতীয়বার পৌছে, তখন ঐ দুই

e-ilm.weebly.com

সেনাপ্রধান খারেজিদেরকে রামাহুরমুজ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং সাবুর নামক স্থানে চলে যান। মুহাল্লাব ও ইবনে মুখান্নাফ তার পেছনে ধাওয়া করে সাবুর পর্যন্ত পৌছে তাবু স্থাপন করেন। মুহাল্লাবের নীতি ছিল, যখন তিনি খারেজিদের পেছনে ধাওয়া করতেন, তখন তিনি বাহিনীর চার দিকে পরিখা খনন করতেন। তিনি ইবনে মুখান্নাফকেও এ পরামর্শ দেন। কিন্তু ইবনে মুখান্নাফ এ পরামর্শ গ্রহণ করে নি। ফলশ্রুতিতে খারেজিরা তার বাহিনীকে পরাজিত করে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। মুহাল্লাব সাবুর নামক স্থানে একবছর পর্যন্ত অবস্থান করে খারেজিদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। তারপর মুলতানের যুদ্ধে তিনি ভীষণ বীরত্বের পরিচয় দেন।

সে সময় কিরমান খারেজিদের দখলে ছিল। আর পারস্য ছিল মুহাল্লাবের দখলে। খারেজিদের জন্য সে সময়টা বড় কঠিন ছিল। পারস্য থেকে কোনো খাদ্য-দ্রব্যাদি ও সাহায্য পেত না। ফলে খারেজিরা কিরমান এসে অবস্থান করে। মুহাল্লাব তার বাহিনী নিয়ে তার পিছু নেন এবং কিরমানের জিরাত শহরে এসে অবস্থান নেন। এখানে খারেজিদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। অবশেষে মুহাল্লাব পুরো পারস্য দখল করে নেন। তখন হাজ্জাজ এখানে উমাইয়া শাসক নিয়োগ করে। আর দারুল জাবরদ ও আসতারের বার্ষিক আর খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করে দেয়। খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। হাজ্জাজ বারা ইবনে কারীছাকে মুহাল্লাবের নিকট খবর দিয়ে প্রেরণ করে যে, খারেজিদের বিরুদ্ধে কঠিন মুকাবালা করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

মুহাল্লাব হাজ্জাজের বার্তা পৌছা মাত্রই সমস্ত সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হওয়ার আদেশ করে। মুহাল্লাবের সাত পুত্র তাদের সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাত্রা করে। সৈন্যদের সাথে সৈন্যের এবং অস্ত্রের সাথে অস্ত্রের সংঘর্ষ হয়। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত উভয় দল বিশ্রাম গ্রহণ করে। আসরের পর পুনরায় যুদ্ধের ময়দান গরম হয়। উভয় পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকে। এমনকি রাতের অন্ধকার উভয় দলের মাঝে অন্তরায় হয়ে যায়।

বারা ইবনে কারীসাহ পাহাড়ের চূড়ায় বসে রণাঙ্গনের দৃশ অবলোকন করছিল। সে মুহাল্লাবকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি তোমার পুত্রদের চেয়ে রণকৌশলী এবং তোমার বাহিনী থেকে সাহসী আর কাউকে দেখিনি। আর তোমার প্রতিপক্ষ থেকে বেশী দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বাহাদুর আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তোমার মধ্যে কোনো অলসতা দেখতে পাইনি। মুহাল্লাব বারাকে বিপুল পরিমান উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় করে দেয়। বারা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিয়ে মুহাল্লাবের অপারগতা হাজ্জাজের সামনে পেশ করে।

e-ilm.weebly.com

এর পর মুহাল্লাব ধারাবাহিকভাবে ১৮ মাস খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু কোনভাবে খারেজিদের শক্তি খর্ব করতে সক্ষম হয়নি। ঐ সময় খারেজিদের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে, যা আদৌ কেউ কল্পনা করেনি।

কাতারী বাহিনীর এক অফিসার মুকা'আতির খায়বীর অপর এক খারিজীকে হত্যা করে ফেলে। সে-ও তার দলে উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিল। নিহত সৈনিকের আত্মীয় স্বজন মুকা'আতিকে হত্যার বদলে ঘাতকদের হত্যা করার দাবী উত্থাপন করে। কাতারী বলল, ঘাতকের চিন্তা-ভাবনায় ভুল হয়ে গেছে। সে জ্ঞানী ও দ্বীনদার ব্যক্তি। আমি তাকে হত্যা করব না। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। বিরাট একদল কাতারী বাই'আত ভংগ করে আবদে রাহ্‌বিহী কাবিরকে তাদের নেতা মনোনীত করে। এতে কাতারী ও আবদে রাহ্‌বিহী কাবিরের সাথীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে খারিজী দল একে অন্যের হাতে মৃত্যুর ঘাটে পৌছে যায়। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অভিমত ছিল, এমতাবস্থায়ই তাদের উপর হামলা করা হোক। কিন্তু মহাল্লাব বলল, যতক্ষণ তারা একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে ততক্ষণ তাদের উপর হামলা করে আমাদের শক্তি ক্ষয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। খারিজীদল পুরো এক মাস পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অবশেষে কাতারী তার দল বল নিয়ে তাবারিস্থান অভিমুখে চলে যায়। আর কিরমান আবদে রাহবিহী কবির দখল করে নেয়।

মুহাল্লাব আবদে রাহ্‌বিহী কবিরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তাকে জিরকাত নামক স্থানে অবরোধ করে ফেলে। খারিজীদল পলায়ণ করার ইচ্ছা করে। মুহাল্লাব তাদের পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর তাদের গতি রোধ করেন। এখানে উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। খারিজীর এমন তীব্র আক্রমণ করে যে, মুহাল্লাবকে স্বীকার করতে হয়েছে, ইতোপূর্বে আমাকে কখনও এত তীব্র আক্রমণের মুকাবিলা করতে হয় নি। কিন্তু অবশেষে খারিজীদল পরাজিত হয়। তাদের অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। মুহাল্লাব বিপুল পরিমাণ গণিমত লাভ করে। খারিজী মহিলাদের দাসী বানানো হয়। কেননা খারিজীরা সাধারণ মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ করেছিল।

মুহাল্লাবকে সংবর্ধনা

এ বিশাল বিজয়ের সংবাদ মুহাল্লাব জনৈক দূতমারফত হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করে। হাজ্জাজ দূতকে মুহাল্লাবের পুত্রদের গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন সে সাবলীল ভাষায় প্রত্যেকের গুণাবলীর বর্ণনা করে। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাহদুর কে? দূত বলল, তারা সকলে প্রশস্ত বর্ম্মের মত, যার কোনো কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

হাজ্জাজ মুল্লাবকে পত্রযোগে অবহিত করে, যে সব সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে, তাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব অবদানের বিনিময় দান

e-ilm.weebly.com

করো। আর যারা এসব অবদানে বিশেষ সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছে, তাদের পরস্পরও সম্মানে ভূষিত করো। তাদের মধ্যে যাকে যোগ্য মনে করো, তাকে কিরমানের শাসক নিয়োগ করো এবং তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করো। আর তুমি স্বয়ং আমার সাথে কুফায় সাক্ষাৎ করো।

মুহাল্লাব কুফায় পৌছার পর হাজ্জাজ তাকে উষ্ণ সংর্বধনা জানায়। বিশেষ আসন নির্ধারণ করে মুহাল্লাবের গুণাবলী বর্ণনা করে এবং তার স্তুতি গেয়ে দরবারে উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলল, হে ইরাক বাসীগণ! মুহাল্লাব তোমাদের মনিব। তোমরা তার গোলাম। তারপর লকিত বিন তামীর প্রসিদ্ধ কবিতা আবৃতি করে বলল–

وقلدوا امركم لله دركم ـ وجب الذراع بامر الحرب مضطلعا

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। তিনি এমন ব্যক্তিকে তোমাদের সরদার মনোনীত করেছেন, যিনি বীরবিক্রমও ভীষণ রণকৌশলী। মহাল্লাবকে শুনিয়ে বলল, হে মুহাল্লাব! তোমার গুণাবলী এ কবিতার বিষয়বস্তু মোতাবেক হয়েছে।

–ইবনে আছীর–৪/১৭১ পৃঃ

কাতারীর হত্যা

পূর্বেই বলা হয়েছে, আযরাকার প্রথম নেতা কাতারী তার সাথীদের নিয়ে তাবারিস্তান অভিমুখে যাত্রা করে। আবদে রাহবিহী কাবীরের হত্যার পর হাজ্জাজ সুফিয়ান বিন আবরাদকে ইসহাক বিন মুহাম্মদ বিন আশআসের সাথে বিরাট এক বাহিনীরসহ কাতারীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। সুফিয়ান তাবারিস্তানের এক গিরিপথে কাতারীকে ঘেরাও করে ফেলে। কাতারীর সাথীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। সে একাকী নিজের প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় রত থাকা অবস্থায় ঘোড়ার উপর থেকে উপত্যাকায় পতিত হয়ে আহত হয়। কতিপয় কুফাবাসী তাকে দেখতে পেয়ে হত্যা করে ফেলে। কাতারী নিহত হওয়ার পর সুফিয়ান তার বাহিনীকে তাড়া করে কাউস মহলে অবরোধ করে ফেলে। তারা অবরোধে ভীত হয়ে জীবনবাজী রেখে বের হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে সকলে নিহত হয়। এ ঘটনা ৭৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়। কাতারী নিহত হওয়ার পর খারেজিদের উপদল আজরাকা যারা দীর্ঘ বিশ বছর থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের উন্নতিকে বাঁধাগ্রস্থ করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়।

সালেহ ও শাবীবের গণ্ডগোল

আজরাকাদের ফিতনা তখনও নির্মুল হয়নি, এমতাবস্থায় জাজিরায় এক নতুন বিদ্রোহের সূচনা হয়। সালেহ ইবনে সারাহ তামীমী একজন আলেম ও দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তার শিষ্য ও একই আকীদায় বিশ্বাসীদের বসতি মসুল ও জাজিরায় বিস্তৃত ছিল। সালেহ একদিন তার অনুসারীদের সমবেত করে বলল–

e-ilm.weebly.com

বনী উমাইয়াদের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে। আদল ও ইনসাফ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সামরিক শাসক গোষ্ঠি অত্যাচার ও নির্যাতনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। সত্যের অনুসরণ ও আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে মোটেও নেই। এখন ধৈর্য্যের বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তাই তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বাতিলের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অপর এক খারিজী সাওয়ার সাবীব বিন নাঈম শায়বানীও সে সময় বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করেছিল। সে সালেহের মনোভাব জানার পর তার সাথে একত্রে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

মোটকথা, এর পর সালেহ ও শাবীব উভয়ে যৌথভাবে ৭৬ হিজরীর সফর মাসে ১২০ জন সমর্থক নিয়ে দারা নামক স্থানে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জাজিরার শাসক মুহাম্মদ বিন মারওয়ান আদী বিন আদীকে তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আদী প্রথমে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করে। সালেহ এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আদী পরাজিত হয়। আর তার বিপুল যুদ্ধাস্ত্র সালেহের হস্তগত হয়।

মুহাম্মদ বিন মারওয়ান খালিদ বিন জয় ও হারিছ বিন জাউনার নেতৃত্বে সালেহের মুকাবিলার জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করে। আবাদ নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সালেহ যখন দেখল, গণিমত লাভ করা সম্ভব হবে না। তখন সে তার বাহিনী নিয়ে জাজিরার পথে মসূলের দিকে চলে যায় এবং ওয়াছকা নামক স্থানে পৌছে তাবু স্থাপন করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী যখন জানতে পারল, এ ফিতনা তার সীমানায় এসে পৌছেছে, তখন সে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে হারিছ বিন উমাইরার নেতৃত্বে প্রেরণ করে। খাদীজ নামক স্থানে সালেহের ৯০ জন সংগীর সাথে তার বাহিনীর মুকাবিলা হয়। এতে সালেহ পরাজিত ও নিহত হয়।

সালেহ নিহত হওয়ার পর তার সংঙ্গী-সাথীরা তাদের আমীর নিযুক্ত করে শাবীককে। সে হারেছ বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হারেছ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে মাদায়েনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শাবীব তার মুষ্ঠিমেয় সংগী-সাথীদের নিয়ে (যাদের সংখ্যা ২০০ জনের মত) ব্যাপক হারে গণহত্যা ও লুণ্ঠণ শুরু করে। হাজ্জাজ একের পর এক তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে থাকে। কিন্তু শাবীব সবাইকে পরাজিত করে দেয়।

অবশেষে শাবীবের স্পর্ধা এত দূরে বেড়ে যায় যে, সে লুটপাট করতে করতে হাজ্জাজের রাজধানী কুফাতে এসে উপস্থিত হয়। এখানে সে বীর দর্পে শাহী মহলের দিকে যাত্রা শুরু করে। শাহী মহল পৌছে দরজায় পদাঘাত করে। তারপর কুফায় জামে মসজিদে পৌছে। ওখানে কতিপয় লোককে হত্যা করে ফেলে। তারপর শহরের বিভিন্ন মহল্লায় খুন-খারাবী করে কুফা চলে যায়।

e-ilm.weebly.com

হাজ্জাজ ধারাবাহিকভাবে শাবীবের বিরুদ্ধে ইরাকী বাহিনী প্রেরণ করতে থাকে। কিন্তু কেউ কৃতকার্য হতে পারেনি। সরকারী বাহিনীর মুকাবিলায় শাবীবের সফলতা দেখে ইরাকের কতিপয় কলহপ্রিয় লোক তার সাথে যোগ দেয়। এর কিছু দিন পর শাবীব ৮০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করে। বাবেল মোহরুজের জমিদার হাজ্জাজকে শাবীবের অবস্থা অবহিত করে। হাজ্জাজ এ সংবাদ পেয়ে কুফাবাসীদের সমবেত করে তাৎক্ষণিকভাবে এক ভাষণে বলল, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও স্বদেশের নিরাপত্তা রক্ষায় যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করো। নতুবা আমি এ কাজের দায়িত্ব এমন এক জাতির উপর ন্যাস্ত করব, যারা তোমাদের চেয়ে বেশী ধৈর্য ও সহনশীল এবং আনুগত্য পরায়ণ। তারা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করবে এবং তোমাদের গনিমতের মালের অংশ নিয়ে যাবে।

হাজ্জাজের এ ভাষণের পর কুফাবাসীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। বহু সংখ্যক ইরাকী শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নাম লিখাতে শুরু করে। কিন্তু হাজ্জাজ ইরাকীদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। তাই সে আবদুল মালিককে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে সিরায় বাহিনী প্রেরণের আবেদন পেশ করে। আবদুল মালিক ছয় হাজার সিরীয় সৈন্য মনোনীত করে। সুফিয়ান বিন আবর কালবী ও হাবিব বিন আবদুর রহমানের নেতৃত্বে কুফার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রেরণ করে। সিরীয় বাহিনী রাস্তায় থাকা অবস্থায় হাজ্জাজ ৫০ হাজার ইরাকী বাহিনী আত্তাব বিন ওরাকার নেতৃত্বে শাবীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। সৈন্য বাহিনীকে বিদায়ের সময় হাজ্জাজ তাদের সম্বোধন করে বলল, "যদি তোমরা পূর্বের মত কাপুরষতা প্রকাশ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে অত্যাচারী শাসকদের হাতে সোপর্দ করে দেব। তারা তোমাদের মত বিরাট বাহিনীকে পদদলিত করে নিঃশেষ করে দেবে। সামাযার নিকটবর্তী স্থানে শাবীব ও আত্তাবের মধ্যে মুকাবিলা হয়। ইরাকী বাহিনী বীরুত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু খারিজীদের জানবাজী দ্রুত তাদের পায়ের তলার মাটি উপড়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, এক হাজার খারেজী বাহিনীর হাতে ৫০ হাজার ইরাকী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হয়। আত্তাব বিন ওযাকার ও তার অপর এক বাহাদুর সাথী যাহর বিন হুওয়াইরিয়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়। ইত্যাবসরে হাজ্জাজের নিকট সিরিয়া বাহিনী পৌঁছে যায়। ফলে তার ইরাকীদের সহায়তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সে বিদায়ী ভাষণে কুফাবাসীদের সম্বোধন করে বলল,"হে কুফাবাসীগণ! যে ব্যক্তি তোমাদের মুকাবিলা করে বিজয়ী হতে চায়, আল্লাহ না করুন সে যেন বিজয়ী না হয়। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাহায্যে বিজয়ী হতে চায়, আল্লাহ না করুন সে যেন তোমাদের সাহায্যে বিজয়ী না হয়। তোমারা

e-ilm.weebly.com

আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আর কোনো যুদ্ধে আমার সাথে যোগদান করো না। যাও! হীরাতে গিয়ে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বসবাস করতে শুরু কর। শাবীব সামায়া ছেড়ে সূর চলে যায়। সেখান থেকে "হামামুল আ'ইয়ুন" নামক স্থানে এসে অবস্থান করে। হাজ্জাজ হারিছ বিন মু'আবিয়া সাকাফীর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য যারা আত্তাবের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাদেরকে প্রেরণ করে। শাবীব হারেছকে হত্যা করে কুফার নিকটবর্তী এসে অবস্থান নেয়।

এবার হাজ্জাজ নিজেই সিরিয়া বাহিনীকে সাথে নিয়ে কুফা থেকে যাত্রা করে। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়। তখন হাজ্জাজ সিরিয় বাহিনীকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে অগ্নিজরা ভাষণ দিয়ে বলল,

হে সিরিয়াবাসীগণ! তোমরা সবাই আমার অনুগত আজ্ঞাবহ বাহাদুর, প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিক। দেখুন! এ অপবিত্র দুশমনদের ভ্রান্ত ধারনা তোমাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে না দেয়। তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করে হাটুর উপর বসে যাও। আর তোমাদের বর্শার অগ্রভাগ শত্রুদের প্রতি অগ্রসর করো।" অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। সিরিয়া বাহিনী কংকরময় জমীতে কংকরের মত মিশে যায় এবং খারিজীদেরকে বর্শার লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে। খারিজী দলও তাদের রীতি অনুযায়ী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। সারাদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষই একে অপরের বীরত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। অবশেষে খালিদ বিন আত্তাব শাবীবকে পেছনের দিক থেকে হামলা করে বসে। তার ভাই মুসাদ ও তার স্ত্রী গাজালাকে হত্যা করে ফেলে এবং তাবুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শাবীব এ অবস্থা দেখে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পেছনে সরতে শুরু করে। হাজ্জাজ আক্রমণ বন্ধ করে শাবীবকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। এই প্রথম বারের মত শাবীব পরাজয়ের মুখ দেখেছে। হাজ্জাজ বলল, আল্লাহর কসম! আজকের দিনের পূর্বে কখনো শাবীবের সাথে মুকাবিলা করা হয়নি।

এরপর শাবীব প্রথমে আম্বার গমন করে। তারপর দজলা নদী অতিক্রম করে আহওয়াজ পৌঁছে। তারপর সেখান থেকে পারস্য হয়ে কিরমান পৌঁছে। সেখান থেকে সিসস্তান পৌঁছার ইচ্ছায় অবস্থান করতে থাকে। শাবীব যেখানে যেত, সেখানেই সিরিয় বাহিনী তার পেছনে ধাওয়া করত। আর উয়য় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে থাকে।

শাবীব বিশ্রাম গ্রহণ শেষ করে কিরমান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আহওয়াজে দাজীলের পুলের উপর সুফিয়ান বিন আররার এর সাথে তার সর্বশেষ যুদ্ধ হয়।

সুফিয়ান নদীর এক তীরে সিরিয় বাহিনীদের নিয়ে অবস্থান নেয়। আর অপর তীরে শাবীব তার বাহিনী নিয়ে অবস্থান নেয়। শাবীব তার অভ্যাস অনুযায়ী নদী অতিক্রম করে। প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষ বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে সারা দিন লড়াই করতে থাকে। সন্ধ্যা হতেই খারিজী বাহিনী তরবারী ও

e-ilm.weebly.com

বর্শা নিয়ে সিরিয়াবাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। সুফিয়ান সিরিয় বাহিনীর পদঙ্খলন ঘটার উপক্রম দেখে তাদেরকে তীর নিক্ষেপনের নির্দেশ দেয়। খারিজীদল পূর্ণ উদ্যমে সিরিয়া বাহিনীর উপর হামলা করে তাদের অসংখ্য সৈন্যকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দেয়। শাবীবের ইচ্ছা ছিল, সে সুফিয়ানের উপর হামলা করে তার কাজ সমাপ্ত করে দেওয়া। কিন্তু অন্ধকার তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, কেউ কারো চেহারা পর্যন্ত সঠিকভাবে দেখতে পায়নি। ফলে শাবীব যুদ্ধ বন্ধ করে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তাবুতে ফিরে যায়।

শাবীব নদীর উপর পুল অতিক্রম করছিল। অপর এক মাদী ঘোড়া দেখে তার ঘোড়া লাফ দেয়। ফলে শাবীর নদীতে পড়ে যায়। পানিতে নিমোজ্জিত হওয়ার সময় তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়।

لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً

আর যখন হাবুডুবু খেয়ে উপরে ভেসে উঠে তখন তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

এভাবে ঐ বাহাদুরের জীবন দাজীল নদের পানিতে নির্মোজ্জিত হয়ে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। যার কারণে সর্বগৃহে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হতে থাকত।

বিজয়

যদিও তখন পরিস্থিতি প্রতিকূল ছিল, আভ্যন্তরীন গৃহযুদ্ধ সর্বদা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তথাপি মুসলমানগণ যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই বিদ্যুত গতিতে তরবারী পরিচালনা করেছে। আর তাদের লোভাতুর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

পূর্বাঞ্চল বিজয়

মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা যখন খারিজীদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিল। তখন হাজ্জাজ তাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। সুতরাং ৮০ হিজরীতে সে বলখ শহর অতিক্রম করে কাশ নামক স্থানে অবস্থান নেয়। মুহাল্লাবের সাথে ৫ হাজার সৈন্য ছিল। আর তার বন্ধু আবুল আদহাম যিম্মানীর সাথে ৩ হাজার সৈন্য ছিল। সে ছিল একজন চৌকশ সেনাধক্ষ্য।

মুহাল্লাব কাশে অবস্থানকালে সম্রাট খাতলের চাচাতো ভাই এসে তার সাথে মিলিত হয়। তাকে খাতলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। মুহাল্লাব তার পুত্র ইয়াযিদকে তার সঙ্গী করে দেয়। ইয়াযিদ ও সম্রাট খাতলের চাচা তো ভাই সর্বদা তার মুকাবিলায় ব্যস্ত থাকে। সম্রাট খতল তার চাচাতো ভাইয়ের প্রতি রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমন করে। ইয়াযিদ তার বাহিনীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাকবীর ধবনী দিতে শুরু করে। সম্রাট খাতলের চাচা তো ভাই মনে

e-ilm.weebly.com

করে যে, মুসলমানগণ তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে তার উপর হামলা করেছে। এ ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে খাতল তার চাচা তো ভাইকে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলে।

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব সম্রাট খতলের দূর্গ অবরোধ করে। সম্রাট খাতল বাধ্য হয়ে জাজিরার সন্ধি চুক্তি করে। ইয়াযিদ তার পিতা মুহাল্লাবের নিকট ফিরে যায়। মুহাল্লাব তার দ্বিতীয় পুত্র হাবিবকে বুখারার সম্রাটের মুকাবিলায় প্রেরণ করে। বুখারার সম্রাট ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়। উভয়ের মধ্যে কয়েক বার যুদ্ধ হয়। কিন্তু বিশেষ কোনো পরিণতি পরিলক্ষিত হয়নি। বিধায় হাবিব ফিরে চলে আসে।

মুহাল্লাব কাশে দু' বছর অবস্থান করে। এ সময় তার কোন কোন উপদেষ্টা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মুহাল্লাব বলল, যে পর্যন্ত বিজয় হয়েছে তাই যথেষ্ট। এখন আমি যদি আমার বাহিনী নিয়ে নিরাপদে মার্ভে পৌছে যেতে পারি, তা-ই হবে গণিমত। মুহাল্লাবের সাথে কর দেওয়ার শর্তে কাশবাসীগণ সন্ধি চুক্তি করে।

মুহাল্লাব ছিলেন কাশে অবস্থানকালে তার পুত্র মুগীরার (যে মার্ভে তার স্থলাভিষিক্তও ছিল) মৃত্যুর খরব পৌছে। তাতে মুহাল্লাব ভীষণ শোকাহত হন। তিনি তার দ্বিতীয় পুত্র ইয়াযিদকে মার্ভের শাসক নিযুক্ত করে মার্ভে পাঠান। আর জিজিয়া আদায় করার পর নিজেও দ্রুত মার্ভে অভিমুখে যাত্রা করেন।

মুহাল্লাবের মৃত্যু

মুহাল্লাব মার্ভে পৌছার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে সে তার সন্তানদের সমবেত করে বলল– "আমি আমার পর ইয়াযিদকে বংশের নেতা মনোনীত করলাম। তোমরা সকলে তার আনুগত্য করবে। তার পর সে কিছু তীর এনে তীরসমূহ এক রশিতে বেঁধে সন্তানদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি এ তীর গুলো ভাঙতে পারবে? মুহাল্লাবের পরিবারের সদস্যগণ জবাব দিল, না। মুহাল্লাব বলল, যদি এগুলোকে পৃথক পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে কি ভাঙতে পারবে? মুহাল্লাবের পরিবারের সদস্যগণ জবাব দিল, হ্যাঁ! ভাঙতে পারব। মুহাল্লাব বলল, বৎস! একতা ও মতবিরোধের মধ্যে এ হল পার্থক্য। তোমরা সকলে একত্রে মিলে মিশে থাকবে। তারপর মুহাল্লাব নিম্নোক্ত উপদেশ দান করে– "আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার এবং রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার উপদেশ দিচ্ছি। তাতে হায়াত বৃদ্ধি হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায়। শক্তি বৃদ্ধি পায়। অসদাচরণ ও অন্যায় করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। যার ফলশ্রুতিতে আখিরাতে দোযখ ও দুনিয়াতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। একে অন্যের আনুগত্য এবং একত্রে মিলে মিশে বসবাস করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। দয়া যা বলবে তার চেয়ে বেশী করে দেখাবে। মুখে উচ্চারণ করার পূর্বে

e-ilm.weebly.com

খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। কথার পদস্খলন ঘটাকে ভয় করবে। কেননা মানুষের পা নড়বড় হলে তা সামলে নেওয়া যায়। আর কথা নড়বড় হলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার নিকট আগত লোকদের অধিকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তাদের সকাল সন্ধ্যার আগমন তোমাদের স্মরণের জন্য যথেষ্ট। সৎকাজকে প্রিয় মনে করবে। সকলের সাথে সদাচারণ করবে। যদি তোমরা কোনো আরববাসীর সাথে কল্যাণের ওয়াদা কর, তাহলে সে তোমার জন্য তার প্রাণ উৎসর্গ করে দেবে।

যুদ্ধের সময় বিচক্ষণতা ও কৌশলের সাথে কাজ করবে। কেননা তা বীরত্ব থেকে বেশী উপকারী। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায়, তখন খোদায়ী তকদীর অনুযায়ী এর ফয়সালা হয়। বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা হলে সফলতা লাভ হয়। তখন বলা হয়, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় সফলতা লাভ হয়েছে। আর যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে বলা হয়, চেষ্টায় কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি করা হয়নি। কিন্তু তাকদীরে সফলতা লেখা ছিল না। তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক মনে করবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত শিক্ষা করার চেষ্টা করবে। বুযুর্গানে দ্বীনের রীতিনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। দেখো! তোমাদের বৈঠকে অনর্থক আলাপ আলোচনা করবে না।"

মুহাল্লাবের এ অসিয়ত প্রত্যেক নবযুবকদের জন্য ভীষণ উত্তম উপদেশ। তা জীবনের কঠিন মঞ্জিল আলোর মশাল হিসেবে কাজে আসবে।

৮৩ হিজরীর জিলহজ্ব মাসে মুহাল্লাবের মৃত্যু হয়। আবদুল মালিক তার ওসিয়ত অনুযায়ী তার পুত্র ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে খোরাসানের শাসক হিসেবে বহাল রাখেন। ইয়াযিদ তার শাসনামলে নাইযাকের বাদগিস দূর্গ জয় করে। ঐ দূর্গ অত্যন্ত মজবুতও নিরাপদ ছিল। নাইযাক যখন দূর্গে প্রবেশ করত তখন মানুষ সম্মানার্থে তার সামনে মস্তক অবনত করত, ইয়াযিদ ঐ দুর্গ দখল করার পর নাইযাক ইয়াজিদের নিকট পরিবারসহ দুর্গ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। ইয়াযিদ তার আবেদন মঞ্জুর করে। ঐ দূর্গ মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ও অস্ত্রের ভাণ্ডার ছিল। সবই মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মুহাল্লাবের বংশধরের অপসারণ

মুহাল্লাব পরিবারের উল্লেখ্যযোগ্য প্রশংসনীয় কীর্তি ও বদান্যতার কারণে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি লাভ করে। হাজ্জাজ এটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে বলল, এটা যুবাইরিয়া খান্দান।" ইয়াযিদকে খোরাসানের মত রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু আবদুল মালিক হাজ্জাজের অভিমতের সাথে ঐক্যমতে উপনীত হননি। হাজ্জাজ যখন ইয়াযিদকে পদচ্যুত করার বিষয়ে জোর চাপ প্রয়োগ করে তখন তিনি লিখেন, ইয়াযিদকে অপসারণ করে তার ভ্রাতা মুফায্যলকে খোরসানের

e-ilm.weebly.com

শাসক নিয়োগ কর। সুতরাং ৮৫ হিজরীতে ইয়াযিদ খোরাসানের শাসক থেকে পদচ্যুত হয়। আর তার স্থলে তার ভ্রাতা মুফায্যল স্থলাভিষিক্ত হয়। ইয়াযিদ যখন খোরাসান থেকে খাওয়ারিজম জয় করে ইরাক প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে যে শহর অতিক্রম করত, সে শহরেই তাকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে রাস্তায় ফুলের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হত। (১) ইবনে আছীর- ৪/১৯৩।

মুফায্যল তার শাসনামলে বাদগীস দূর্গ আক্রমণ করে তা জয় করে। এরপর সে আখেরুন উশূমানে আক্রমণ করে। এখানে মুসলমানগ বিপুল পরিমান গণীমতের মাল লাভ করে। মুফায্যল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা করত না। কিন্তু যা তার হস্তগত হত, তা তাৎক্ষণিকভাবে সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিত। হাজ্জাজ যখন ইয়াযিদকে অপসারণ করে মুফায্যলকে তার স্থলাভিষিক্ত করে, তখন ইয়াযিদ মুফায্যলকে বলেছিল, হাজ্জাজ আমার বিরোধিতা করার ভয়ে তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছে। তুমি তোমার নিজের দায়িত্ব বুঝে নাও। ইয়াজিদের এ অভিমত সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। মুফায্যলের শাসন ক্ষমতা বুঝে নেওয়ার পর সবে মাত্র নয় মাস হয়েছে। ইত্যাবসরে তার পদচ্যুতির ঘোষণা এসে যায়। আর কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ঐ খ্যাতনামা বিজয়ীর কৃর্তি সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

আফ্রিকা বিজয়

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইয়াযিদের শাসনামলে ৬২ হিজরীতে কাসীলা বিন মুকার্‌রম বারবারী উকবা বিন নাফে রাযি. কে পরাজিত করে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয়। কায়রোয়ানের নতুন ইসলামী জনপদ তার অনুগ্রহের উপর টিকে ছিল। ৬৯ হিজরীতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এ দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান। তখন তিনি যুহাইর বিন কায়েস বালাভীকে আফ্রিকার শাসক নিয়োগ করে এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ান আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

যুহাইর বিন কায়েস কায়রোয়ান পৌছে জানতে পারেন যে, কাসীলাহ কায়ারোয়ান ত্যাগ করে মামাশ চলে গেছে। যুহাইর তিন দিন শহরের বাইরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তারপর কাসীলার পিছু নেন। মমাশের নিকট পৌছার পর কাসীলার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা হয়। এসময় কাসীলার সাথে বারবারীরা ছাড়াও রোমানদের বিরাট সৈন্য দল ছিল। উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উভয় দলই প্রাণপনে যুদ্ধ করে। অবশেষে বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করে। কাসীলা ও তার সমর্থক বড় বড় বারবারী নেতা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়।এ বিজয়ের পর যুহাইর কায়রোয়ান হয়ে বারাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে রোমান বাহিনী বারাকা খালি পেয়ে সাকলীয় দ্বীপ থেকে বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বারাকা আক্রমণ করে। যুহাইর বারাকার নিকট পৌছে এ বিপদের খবর পায়।

e-ilm.weebly.com

তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবু তিনি সে তার মুষ্ঠিমেয় হাতে গোনা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে বীরের মত মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসেন। রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যার কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। যুহাইর সংগী সাথীগণ একে একে সকলেই শহীদ হয়ে যায়। রোমান বাহিনী হত্যা ও লুণ্ঠন করে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে চলে যায়।

আবদুল মালিক এ পরাজয়ের খবর শুনে ভীষণ ব্যথিত হন। কিন্তু তখন ইবনে যুবাইর রাযি. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদতের পর ৭৪ হিজরীতে তিনি বিরাট এক বাহিনী তৈরী করেন এবং হাসসান বিন নু'মান গাসসানীকে আফ্রিকার গভর্নর মনোনীত করে ঐ বাহিনীর সাথে আফ্রিকা অভিমুখে প্রেরণ করে।

হাসসান প্রথমে কায়রোওয়ান পৌছেন। ওখান থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে কারতাজিন্না আক্রমণ ন কারতাজিন্নাহর বাদশাহ আফ্রিকার সব চেয়ে বড় বাদশাহ ছিল। ইতোপূর্বে তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করার সুযোগ হয়নি। মুসলমানগণ কারতাজিন্না পৌছার পর ওখানে রোমান ও বারবারীদের বিরাট এক বাহিনীকে প্রস্তুত দেখতে পায়। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। অবশেষে রোমান ও বারবারী বাহিনী পালিয়ে যায়। হাসসান কারতাজিন্না সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন। আর বারাকায় রোমানদের নিষ্ঠুর হত্যা যজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

হাসসান যখন জানতে পারে যে, কিছু রোমান ও বারবারী সাতফুরাহ ও নাইজারাতে সংঘটিত হয়ে পুনরায় মুকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাসসান তাৎক্ষণিকভাবে হামলা করে তাদের পরাজিত করে দেন। এ ছাড়াও হাসসান যেখানে রোমান ও বারবারীদের সংঘঠিত হতে দেখেছেন, সেখানেই তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে নির্মুল করে দিয়েছেন। হাসসানের এ বিজয়ের পর আফ্রিকায় মুসলমানদের হারানো ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হাসসানের বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আহতদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এ কারণে হাসসান কায়রোয়ান ফিরে আসেন। এখানে কিছু দিন বিশ্রামের পর যখন সৈন্য বাহিনী নবজীবন লাভ করে, তখন হাসসান চিন্তা করলেন, আফ্রিকার বাদশাহদের মধ্যে শক্তিশালী কোনো বাদশাহ বাকী নেই। লোকজন বলল, কাহিনা (ভবিষ্যত বক্তা) নামে প্রসিদ্ধ রাণী দামিয়া, জাবালে উরাসে রাজত্ব করছে। সে বর্তমান আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক। কাসিলার মৃত্যুর পর সব বারবারীই তাকে নিজেদের নেতা মনোনীত করেছে। যদি তাকে হত্যা করা যায়, তাহলে সারা আফ্রিকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

হাসসান যথাযোগ্য বাহিনী সঙ্গে নিয়ে কাহিনার মুকাবিলায় যাত্রা করে। কাহিনার ধারনা ছিল, হাসসান দূর্গসমূহ দখল করতে চায়। তাই সে বাগবার মজবুত দুর্গ ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু হাসসান সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। নীল

e-ilm.weebly.com

নদের তীরে রাণী কাহেনার বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করেন। বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানগণ পরাজিত হয়। অসংখ্য মুসলমান যুদ্ধে নিহত হয়। বহু সংখ্যক গ্রেফতার হয়। এ পরাজয়ের পর আফ্রিকার ইসলামী এলাকা সমূহ পুনরায় মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। তাই হাসসান বাধ্য হয়ে বারাকায় ফিরে আসেন। আবদুল মালিক এ সময় খরিজীদের বিদ্রাহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি হাসসানকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারেনি। এ সুযোগে রাণী কাহেনা দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত আফ্রিকা শাসন করতে থাকে। কিন্তু সে আফ্রিকাবাসীদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। তার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যায়। ৭৮ হিজরীতে যখন আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবদুল মালিক বিপুল পরিমান সৈন্য ও অস্ত্র হাসসানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন এবং তাকে সম্রাজ্ঞী কাহেনার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দান করে।

সম্রাজ্ঞী কাহেনা পূর্ববর্তী যুদ্ধে যেসব মুসলমানদের গ্রেফতার করে ছিল, তাদের মধ্যে খালিদ বিন ইয়াযিদ কায়সী নামে এক নবযুবকও গ্রেফতার হয়েছিল। খালিদ বিন ইয়াযিদ কায়সীকে তার বিশেষ গুণাবলীর কারণে সম্রাজ্ঞী কাহেনা পালক পুত্র বানিয়ে নেয়। হাসসান সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার পূর্বে কাহেনার খোঁজ-খবর জানার উদ্দেশ্যে গোপনে খালিদের নিকট পত্র প্রেরণ করে। খালিদ জবাব দেয়, বর্তমানে বারবারীগণ বিছিন্ন হয়ে আছে। তাই আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়। সম্রাজ্ঞী কাহেনা গোপনে এ খবর অবগত হয়। সে মনে মনে ধারনা করে যে, মুসলমান অর্থ– সম্পদের লোভে বারবার আফ্রিকা আক্রমণ করছে। তাই সে আফ্রিকার দূর্গসমূহ ধ্বংস করে দেয় এবং পুরো দেশ ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে।

সম্রাজ্ঞীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে তার সম্রাজ্যের জনগন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপর দিকে হাসসান যখন তার বাহিনী নিয়ে আফ্রিকা প্রবেশ করেন, তখন বারবারী লোকজন তাকে স্বাগত জানিয়ে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে হাসসানের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। হাসসান যখন কাবস, কাফছা, কাসতিলা ও নাফজাদা দখল করে রাজধানীর নিকটবর্তী পৌছেন, সম্রাজ্ঞী তখন নিজের পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন সে স্বীয় পুত্রকে বলল, তোমরা খালিদকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম সেনাপতির নিকট যাও এবং নিজের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নাও। আমার আর জীবিত থাকার আশা নেই। সুতরাং তার দুই পুত্র নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে হাসসানের আশ্রয়ে থেকে যায়। অবশেষে সম্রাজ্ঞী ও হাসসানের বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মুসলমান বিজয়ী হয়। আর সম্রাজ্ঞী গ্রেফতার হয়ে নিহত হয়। সম্রাজ্ঞীর পরাজয়ের পর পুরো আফ্রিকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ দেশে তাদের আর কোনো প্রতিদ্ধন্দ্বী বাকী রইল না। হাসসান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এরপর বার হাজার বারবারী

e-ilm.weebly.com

ইসলামী বাহিনীতে নাম লিখায়। আর সম্রাজ্ঞী কাহেনার দু' পুত্রকে তাদের নেতা মনোনীত করা হয়। এরপর হাসসান কায়রোয়ানে ফিরে আসেন। আবদুল মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত ওখানে বসবাস করেন। ঐ সময় তিনি ইসলামের প্রসারে মনোযোগী হন। ফলে অসংখ্য বারবারী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

–ইবনে আছীর–৪/১৪২-৪৩

উত্তরাঞ্চল বিজয়

আফ্রিকার অঞ্চলসমূহ ছাড়াও মুসলনমগণ সিরিয়া উপকূলীয় শহর সমূহের রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ৭০ হিজরীতে আবদুল মালেক মুস'আব বিন যুবাইর রাযি. এর মুকাবিলায় ব্যস্ত ছিলেন। ইত্যাবসরে রোমান বাহিনী সিরিয়া উপকূলীয় শহর সমূহে হামলা করে বসে। আবদুল মালেক সন্ধি করার সুযোগ বুঝে সপ্তাহিক এক হাজার দিনারের বিনিময়ে রোমানদের সাথে সন্ধি করে নেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্ত হন, তখন সাওয়ায়েক ও সাওয়াতা তথা প্রদাতিক ও অশ্বারোহী পুনরায় গঠন করে রোম সম্রাজ্যে হামলা করতে শুরু করেন। প্রথমে কায়সারীয়া যুদ্ধে আবদুল মালিক রোমানদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন। ৮১ হিজরীতে উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিক কালকীয়া দখল করে নেন। তারপর ৮৪ হিজরীতে মাসীসা দখল করে নেন। মাসীসা দখল করার পর সর্বপ্রথম মুসলমানদের বসতী স্থাপন করেন। সাথে সাথে বিরাট এক দূর্গ তেরী করে ৩০০ সৈন্যকে সেখানের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

মারওয়ান ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ছিল। ৮৫ হিজরীতে আবদুল মালিক তার ভ্রাতা আবদুল আযীযকে যিনি ঐ সময় মিশরের গভর্ণর ছিলেন তাকে পদচ্যুত করে স্বীয় পুত্র ওয়ালিদকে মিশরের গভর্নর নিয়োগ করেন।

আবদুল মালিক এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত সচিব কারীসা বিন জুরাইবের সাথে পরামর্শ করেন। সে তাকে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু রাওহ বিন জুহামীর সাথে পরামর্শ করলে সে বলল, এ কাজ খুবই সহজ। আবদুল মালিক তখন আবদুল আযীয সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ইত্যাবসরে আবদুল আযীযের মৃত্যুর খবর এসে যায়। তখন আবদুল মালিক ধারা বাহিকভাবে তার দু'পুত্র ওয়ালিদ ও সুলাইমানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং প্রাদেশিক শাসকদেরকে তার বাই'আত গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। সকলে এক বাক্যে বাই'আত গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু মদীনার ফিকাহবিদ ও খ্যাতনামা তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রাযি. বললেন, আমি এক খলীফার জীবদ্দশায় অপর খলীফার বাই'আত গ্রহণ করতে পারব না।

e-ilm.weebly.com

মদীনার শাসনকর্তা হিশাস বিন ইসমাঈল হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রাযি. কে বাই'আত গ্রহণে বাধ্য করতে চাপ প্রয়োগ শুরু করে। তিনি বাই'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করায় তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। এমনকি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আবদুল মালিক এ খবর শোনার পর হিশামকে ভর্ৎসনা করে পত্র প্রেরণ করেন যে, সাঈদের অন্তর আমাদের ব্যাপারে অতি পরিস্কার। তার সাথে কঠোর আচরণ করার স্থলে নমনীয়তা ও সদাচারণ করতে হবে।'

আবদুল মালিকের মৃত্যু

৮৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে দামেশকে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে, সে তার দু' পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন–

"আমি তোমাদের আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, এটাই উত্তম অলংকার এবং সবচেয়ে বেশী নিরপদ আশ্রয়। বয়োজেষ্ঠদের ছোটদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে। ছোটদের বয়োজষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। মাসলামার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে। তার অভিমত অনুযায়ী কাজ করবে। কেননা সে তোমাদের শক্তির বাহু। হাজ্জাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। সে তোমাদের জন্য ক্ষমতার পথ পরিস্কার করেছে। এক মায়ের সৎ পুত্র হয়ে থাকবে। পরস্পর গভীর মহব্বত ও ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখবে। অভিজাত লোকদের মত লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। কেননা মুত্যু নির্দিষ্ট সময়ে আসে। সত্যের ধারকবাহক হওয়ার চেষ্টা করবে। কেননা এর সাওয়াব ও স্মৃতি স্থায়ী থাকে। অভিজাত লোকদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।

তারা তা স্মরণ করে এবং এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অপরাধীদের অপরাধ নজরে রাখবে। যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবে। আর যদি সে অপরাধের পর অপরাধ করতে থাকে তাহলে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬০ বছর। সে প্রায় ২১ বছর দেড় মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিল। ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদতের পর ১৩ বছর ৪ মাস জীবিত ছিল। দামেশকের বাবে জাবীরায় তাকে দাফন করা হয়। দাফনের সময় তার পুত্র হিশাম এ কবিতা পাঠ করে ছিল।

فما كان قيس هلكه هلك واحد ـ ولكنه بنيان قوم تهدما

"কায়েসের মৃত্যু এক ব্যক্তির মৃত্যু নয়। বরং তার মৃত্যু পুরো জাতী সত্ত্বা ধ্বসে পড়ার নামান্তর।

ওয়ালীদ বলল, অনর্থক কথা বল না বরং আউস বিন হাজারের কবিতা পাঠ কর–

اذا مقرم منا ذرى حد نابه ـ تخمط مناناب اخر مقرم

"যখন আমাদের কোনো নেতার দাঁত নিস্তেজ হয়ে যায়, তখন অপর নেতার দাঁত তেজস্বী হয়ে যায়। [(১) ইবনে আছীর–৪/১৯৯]

বস্তুতঃ কোনো জাতির জীবন তাদের উল্লেখ যোগ্য ভূমিকার দ্বারা প্রমাণ হয়।

e-ilm.weebly.com

আবদুল মালিকের উত্তরসূরী

আবদুল মালিক ৮ বিবাহ করেছেন। তাদের নাম ও সন্তানদের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) বিলাদাহ বিনতে আব্বাস। তার ঔরসে ওয়ালীদ, সুলাইমান ও মারওয়ান আকবর ভূমিষ্ট হয়।

(২) আতেকা বিনতে ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়া। তার ঔরসে জন্ম হয় ইয়াযিদ, মারওয়ান আছগর, মু'আবিয়া ও উম্মে কুলসুমের।

(৩) উম্মে হিশাম বিনতে হিশাম মাখযূমী। তার গর্ভে হিশামের জন্ম হয়।

(৪) আয়েশা বিনতে মূসা তাইমী। তার ঔরসে আবু বকর বাকার ভূমিষ্ঠ হয়।

৫। উম্মে আইয়ূব বিনতে আমর বিন ওসমান রাযি.। তাঁর গর্ভে হাকাম ভূমিষ্ট হয়।

৬। উম্মে মুগীরাহ বিনতে মুগীরাহ বিন খালিদ মাখযূমী। তার গর্ভে এক কন্যা ফাতিমা ভূমিষ্ট হয়েছে।

৭। শাক্‌রা বিনতে মাসলামাহ তাঈ।

৮। উম্মে আবীহা বিনতে আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালেব।

এ স্ত্রীগণ ছাড়াও উম্মহাতুল আওলাদ (কৃত দাসীর) থেকে তার একাধিক পুত্রের জন্ম হয়েছে। তারা হলেন– আবদুল্লাহ, মাসলামাহ, মুনযির, আম্বাসা, মুহাম্মদ, সাইদ, খায়ের, হাজ্জাজ।

আবদুল মালিকের চরিত্র

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান জ্ঞান-প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তা, সাহসীকতা, সহনশীলতা ও বীরত্বে জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। ৬৫ হিজরীতে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন ইসলামী সাম্রাজ্য বিশৃংখলা-অশান্তি ও বিদ্রোহে টলটলায়মান ছিল। কিন্তু ৮৬ হিজরীতে যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় হন, তখন শান্তি ও নিরাপত্তার সূর্যের আলো ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি অলীগলিকে আলোকিত করে রেখেছিল। তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্পর্কে আবু যিয়াদ ও শা'বীর অভিমত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাহসীকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে এ ঘটনায় আন্দাজ করা যায় যে, ৬৬ হিজরীতে যখন তিনি মুখতার সাকাফীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য যাত্রা করছিলেন, ঐ রাতে তাকে ধারাবাহিক ভাবে চারটি দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে। প্রথমে দূত এসে সংবাদ দেয়, উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মুখতারের প্রতিরোধ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অতঃপর খবর আসে, তার এক খ্যাতনামা সেনা কর্মকর্তা ইবনে যুবাইর রাযি. হাতে নিহত হয়েছে এবং মুস'আব বিন যুবাইর রাযি. তার বাহিনী ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছে। তারপর জনৈক দূত খবর নিয়ে আসে, রোমান সম্রাটের বাহিনী সিরিয়া উপকূলীয় শহর মিসাসাহ দখল করে নিয়েছে। অপরকে সংবাদ দাতা আরেক দুঃখ জনক সংবাদ দেয় যে, দামেশকের কতিপয় দুস্কৃতিকারী শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করেছে। আর বেদুইনরা হিমছ ও

e-ilm.weebly.com

বা'লাবাক শহরে লুটতরাজ শুরু করেছে। ঐতিহাসিক মাসউদী বলেন, আবদুল মালিক এসব দুঃসংবাদ শুনে সামান্যও চিন্তিত হননি বরং ঐ রাতে তাকে বেশী হাসি খুশি ও উৎপুল্ল দেখা যায়। (১) মাসউদী– ৮৩/৪।

তার উচ্চাকাঙ্খাও অসীম সাহসীকতার এ ঘটনায় অনুমান করা যায় যে, ৭১ হিজরীতে তিনি যখন মুস'আব বিন যুবাইর রাযি. এর সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ইরাক যাত্রার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তিনি তার হিতাকাংঙ্খীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল, হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. এর মত প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে টক্কর দেওয়া ঠিক হবে না। আপনি আপনার বিজীত এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আর ইবনে যুবাইর রাযি. কে তার দখলকৃত এলাকা ছেড়ে দিন। আবদুল মালিক অতি ঘৃণার সাথে উক্ত পরামর্শ উড়িয়ে দেন। অনন্তর তার কোন কোন হিতাকাংঙ্খী আরয করল, যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে কোন সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিন। আর আমীরুল মুমিনীনের জন্য রাজধানীতে অবস্থান করে তাকে সাহায্য করাই সমীচীন।

আবদুল মালিক এ অভিমতও প্রত্যাখান করে বললেন, মুস'আবের মত বীর যোদ্ধার মুকাবিলায় আমার মত অভিজ্ঞ যোদ্ধার ময়দানে যাওয়া জরুরী। অবশেষে তিনি যখন যুদ্ধে রওনা হন, তার স্ত্রী আতেকা বিনতে ইয়াযীদ মনের অজান্তেই অজোর ধারায় কান্না কাটি শুরু করে। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে তার সখীগণও কাঁদতে শুরু করে। আবদুল মালিক কাছির উয্যার দুটি কবিতা আবৃতি করে বিনা বাক্য ব্যয়ে রণাঙ্গনে যাত্রা করেন। অবশেষে বিজয়ী ও সফলকাম হয়ে ফিরে আসেন।

(১) ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, তিনি তার বিরোধীতা কারীদের সাথে কঠোরতা ও প্রতিশ্রুতি ভংগের ধারা অব্যাহত রেখে ছিলেন। সুতরাং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত অত্যাচারী ব্যক্তিকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। সে অসংখ্য মানুষের রক্তে জমীনকে রঞ্জিত করেছে। আর আমর বিন সাদকে নিরাপত্তা দিয়ে প্রতারণা করে হত্যা করে ফেলেছেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, আবদুল মালিক একজন বাদশাহ ছিলেন; খোলাফায়ে রাশেদা ছিলেন না। সাম্রাজ্যের আলখাল্লা অপরাধী ও নিরাপরাধ লোকের রক্তে রঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া আবদুল মালিকের ঘনিষ্ঠ জনরা অস্বাভাবিক দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। তারা ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে ইসলামের কেন্দ্রকে ছিন্নভিন্ন করতে কখনো বিন্দুমাত্র কালক্ষেপন করেনি। রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতার মুকুট নিয়ে খেলা করা তাদের নিকট অতিপ্রিয় ছিল। সুতরাং স্বয়ং তিনিই বলতেন, প্রত্যেক যুগের শাসকদের দৃষ্টিভংগী ঐ যুগের জনসাধারণের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমাকে যেসব লোকদের সাথে সম্পর্কিত হতে হয়েছে, যদি হযরত উমর রাযি. এর এসব লোকদের সাথে সম্পৃক্ত হতে হত, তাহলে তিনিও আমার মত ব্যবস্থা নিতেন।

e-ilm.weebly.com

মোটকথা, এটা আবদুল মালিকের অনেক বড় অনুগ্রহ। চাই তার উদ্দেশ্য সফল হোক বা না হোক। তিনি এমন এক সুদৃঢ় ইসলামী আরব সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করে গেছেন, যা ইসলামের শত্রুদের ভ্রান্ত ইচ্ছা পূর্ণ করার পথে ইস্পাত কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসারও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ হয়েছে। ইসলামী বিজয় ছাড়াও আলোচিত বিষয়ে বিশেষ করে আবদুল মালিকের শাসনামলে ইসলামের বিপুল উন্নতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে, তন্মধ্যে কতিপয় বিষয় সুখ্যাতি লাভ করেছে।

কাবাগৃহ পূনঃ নির্মান

১৬৭৫ বছর পর হুযুর ﷺ এর নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশরা কাবাগৃহ সম্পূর্ণ ভেংগে পুনরায় তা নির্মান করে। ঐ সময় তারা অর্থের অভাবে হিজরে ইসমাঈলের দিক থেকে হযরত ইব্রাহীম আ. এর ভিত্তিটা কয়েক হাত বাদ দিয়ে দেয়াল নির্মান করে। তাছাড়া কাবা গৃহের দরজা মানুষের পা সমান উঁচু করে দেয়। যাতে কুরাইশদের অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ কাবাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

পরবর্তী সময় ৬৪ হিজরীতে যখন ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া রাযি. হযরত ইব্ন যুবাইর রাযি. এর মুকাবিলায় হুছাইন বিন নুমায়েরকে হিজাজে প্রেরণ করে, তখন সে কাবাগৃহে পাথর নিক্ষেপ করে। তার পাথর নিক্ষেপে কাবা গৃহের দেয়াল ঝুকে যায়। তাছাড়া কাবা গৃহের অগ্নি সংযোগের কারণে গেলাফ ও দেয়ালের বেশীর ভাগ আগুনে পুড়ে যায়।

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর যখন হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. পুরো হিজাজ তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন, তখন তিনি ইরানী, মিশরী ও রোমান কারিগরদের দ্বারা কাবাগৃহ ভেংগে স্পূর্ণরূপে নতুন করে নির্মান শুরু করেন। তখন তাঁর খালা হযরত আয়েশা রাযি. নিকট থেকে হুযুর ﷺ এর এ হাদীস অবগত হন যে, যদি কুরাইশরা নও মুসলিম না হত, তাহলে আমি কা'বাকে হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মান করতাম এবং হিজরে ইসমাঈলের দিক থেকে কাবাগৃহের বাদ দেওয়া অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম। সুতরাং নতুন নির্মানে ঐ অংশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া তিনি জমীনের সাথে মিলিত করে সামনের দিকে দু' দরজা রাখার ব্যবস্থা করেন, যাতে যিয়ারত কারীগণ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হতে পারে। আর দেয়ালের উচ্চতাও নয় হাত বৃদ্ধি করা হয়।

৭৩ হিজরীতে হযরত ইব্নে যুবাইর রাযি. এর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ ইব্নে ইউসুফ যখন মক্কার শাসক নিযুক্ত হয়, তখন সে হিজরে ইসমাঈলকে কাবাগৃহের অংশ থেকে পুনরায় বাদ দেয় এবং নতুন দরজাকে কড়া লাগিয়ে বন্ধ

e-ilm.weebly.com

করে দেয়। আর পুরাতন দরজাকে উঁচু করে দেয়। তখন কাবাগৃহ পুনরায় কুরাইশদের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মিত হয়। বর্তমান কাবাগৃহের ইমারত এটাই আছে। তিন দিক হযরত ইব্নে যুবাইর রাযি. এর তৈরী আর উত্তর দিকের দেয়াল হাজ্জাজ নিব ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত।

ইসলামী মুদ্রার প্রচলন

ইসলামের পূর্বে আরবে ইরানী দিরহাম ও রুমী দীনারের প্রচলন ছিল। ১৮ হিজরীতে হযরত উমর রাযি. নতুন দিরহামের প্রবর্তন করেন। এ দিরহাম ইরানী দিরহামের অবিকল নকল ছিল। কিন্তু এর নকশায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ও لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

মুদ্রিত ছিল। এরপর হযরত উসমান রাযি. ও মু'আবিয়া রাযি., ইবনে যুবাইর রাযি. স্ব-স্ব শাসনামলে নতুন নতুন দিরহামের প্রবর্তন করেন। ৭৬ হিজরীতে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, খালিদ বিন ইয়াযীদ ইব্নে মু'আবিয়ার পরামর্শে নতুন দিরহামের প্রবর্তন করে।

বস্তুতঃ আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট প্রেরিত পত্র সমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও হযরত রাসূল ﷺ এর রিসালাতের বিবরণ উল্লেখ থাকত। তাই রোম সম্রাট আবদুল মালিককে পত্র লিখে– এ এক নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে, যা আমার অপছন্দ। যদি এ পদ্ধতি বন্ধ করা না হয়, তাহলে আমি এখানকার প্রচলিত মূদ্রার উপর তোমাদের নবীর শানে অশালীন শব্দ খচিত করে পাঠাব।

রোম সম্রাটের ঐ ধৃষ্ঠতার জবাবে আবদুল মালিক বলেন, রোমান দিনার সমূহ ইসলামী সম্রাজ্যে অচল ঘোষণা করা হল। অতঃপর সম্পূর্ণ নতুন করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তত্ত্বাবধানে ইরাকে ইসলামী ট্যাকশাল স্থাপন করা হয়। আর অন্য কেউ মুদ্রা তৈরী করতে পারবে না বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সুতরাং সমীর নামক এক ইয়াহুদী মুদ্রা তৈরী করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে সমীর দিনার ও দিরহাম ওজন করা নতুন কাটার উদ্ভাবন করেছিল, যাতে হাজ্জাজের কঠোর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু হাজ্জাজ তাকে হত্যা করে ফেলে। আবদুল মালিকের ট্যাকশাল থেকে তৈরী মুদ্রার একদিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ আর অপর দিকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অঙ্কিত ছিল। উভয় দিকের কিনারায় এক গোল বৃত্ত ছিল। এক বৃত্তে মুদ্রা তৈরীর তারিখ আর অপর বৃত্তে মুদ্রনের স্থান উল্লেখ করা হত। আর অপর বৃত্তে

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

লেখা হত।

–ইবনে আছীর ১৬১/ ৪।
তারিখ উম্মুল ইসলাম– ৩৩/ ৪।

e-ilm.weebly.com

প্রথম ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক

(৮৬ হিঃ –৯৬ হিঃ)

ওয়ালীদ ছিল আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের জৈষ্ঠ্য পুত্র। তিনি ওলাদাহ বিনতে আব্বাস বিন জুয আবাসীর ঔরষে ৫৫ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন বিধায় জ্ঞান-শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপরি অভিজ্ঞ এবং কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা আবদুল মালিকের দাফন শেষ করে সরাসরি মসজিদে গিয়ে ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে পিতা আবদুল মালিকের গুণাবলী বর্ণনা করেন। তারপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন,

"হে লোক সকল! তোমাদের কর্তব্য হল, সরকারের আনুগত্য করা। আর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করা। যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে শয়তানের ভাই। হে লোক সকল! যে বিদ্রোহের চেষ্টা করবে, তার মস্তক ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর যে বিদ্রোহ গোপন করে রাখবে, সেও ঐ ব্যধিতে ধ্বংস হয়ে যাবে। ওয়ালীদের শাসনামল বনী উমাইয়াদের জন্য স্বর্ণ যুগ ছিল। আবদুল মালিক পরবর্তী শাসকদের জন্য পথের সব কাঁটা দূর করে নিষ্কন্টক করে গিয়েছিল। খারিজীদের বিদ্রোহ নির্মুল হয়েছিল। শী'আ ও আহলে বাইতের মধ্যে উদ্দীপনা পশমিত হয়েছিল। বনী উমাইয়াদের প্রতিদ্বন্ধীদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। এ কারণে ওয়ালীদ প্রশান্তির সাথে সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনের সাথে সাথে বৈদেশিক বিষয়ও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

তিনি সৌভাগ্যক্রমে মুহাম্মদ বিন কাশেম, কুতাইবা বিন মুসলিম, মূসা বিন নাসির ও মাসলামাহ বিন আবদুল মালিকের মত বিশ্ব বিজয়ীদের হাতের নাগালে পেয়েছিলেন। তারা স্বীয় অশ্বের পায়ের খুর দ্বারা ইউরোপ ও এশিয়ার ময়দান সমূহকে প্রজ্জলিত করে দিয়েছিল। উক্ত চার সেনাপতির বিজয়ের বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিজয়

মুহাম্মদ বিন কাশেম

ইরানে সাসানী রাজত্ব ও সিন্ধুর বৌদ্ধ রাজ্যের সীমানা পরস্পর মিলিত ছিল। তাদের উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং হযরত উমর রাযি. এর খিলাফতকালে যখন মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তখন সিন্ধী ও ইরানী বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সাসানী শাসনের পতনের পর অনেক ইরানী সরদার সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা সর্বদা মুলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাছাড়া অনেক আরব নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সিন্ধুতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

e-ilm.weebly.com

এসব কারণে মুসলমানগণ কেরমা ও মাকরান দখল করার পর থেকে সিন্ধু বাসীদের সাথে ছোট খাট অভিযান অব্যাহত থাকে। তথাপি মুসলমানদের কাছে সিন্ধু রাজ্যের আভ্যন্তরে প্রবেশ করে সিন্দু প্রদেশ দখল করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফীকে জনৈকা অত্যাচারিতা মহিলার আবেদন এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। ঘটনা ছিল, সমুদ্র উপকূলীয় সরণ দ্বীপে কতিপয় আরব বনিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। সহসা তাদের একজনের মৃত্যু হয়। সেখানকার রাজা মহৎপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি হাজ্জাজ ও ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ আরব বনিক পরিবারের লোকদের এক জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে ইরাক অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। মূল্যবান উপহার সামগ্রীও প্রেরণ করেন। উক্ত জাহাজ দেবল বন্দরের নিকটবর্তী পৌছলে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সৈন্যরা জাহাজের উপর আক্রমণ করে জাহাজের সব মালামাল লুট করেন। আরবীয় মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যায়। আরবীয় মহিলাগণ এ বিপদে পতিত হওয়ার পর জনৈকা মহিলার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত এই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়– হে হাজ্জাজ! আমাদের মুক্ত করো।"

হাজ্জাজ এ ঘটনা অবগত হন এবং তাকে ঐ মহিলার আর্তনাদের কথা শুনানো হয়, তখন হাজ্জাজ বলল, আমি এক্ষুণি তাকে সাহায্য পাঠাচ্ছি। হাজ্জাজ প্রথমে সমঝোতার মাধ্যমে তাদের মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তাই দাহিরকে পত্রযোগে অবহিত করে যে, আপনার লোকজন আমার নারী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে গেছে। তাদেরকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। দাহির প্রতি উত্তরে বলল, এটা তো জলদস্যুদের কাজ। তাদের ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই নেই। তদুপরি দাহির নিজেও এক দুষ্টু প্রকৃতির লোক ছিল। তখন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা ছাড়া হাজ্জাজের আর কোন পথ ছিল না। হাজ্জাজ আবদুল্লাহ আসলামীকে ৬ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে সিন্ধুর উপকূলীয় এলাকায় আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে। আবদুল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়। পুনরায় বুদাইল বিন তোহকাহ বাজালীকে ৬ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে। বুদাইল যুদ্ধের ময়দানে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে পতিত হয়ে শহীদ হয়ে যায়। তৃতীয় বার হাজ্জাজ তার ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন যুবক মুহাম্মদ বিন কাশিমকে সিন্ধু উপকূলের গভর্নর মনোনীত করে ৬ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ প্রেরণ করে। মুহাম্মদ বিন কাশেম প্রথমে মাকরান পৌছে তথায় কিছু দিন অপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করেন। তারপর মতরপুর ও পঞ্চগড়ের দিকে যাত্রা করে তা দখল করেন। তারপর আরমাবিল (আরমান বিলাহ) জয় করেন। তারপর দেবল উপকূলে এসে অবস্থান

e-ilm.weebly.com

করেন। মুহাম্মদ বিন কাশিম তার অশ্রসস্ত্রের সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস (সূই-সূতা সহ) সব কিছু নিয়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। যেদিন তিনি গন্তব্যে পৌছেন, সে দিনই প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীও পৌছে যায়।

দেবল বিজয়

মুহাম্মদ বিন কাশেম দেবল পৌছেই পুরো শহর অবরোধ করে ফেলেন। স্বীয় বাহিনীর সামনে পরিখা খনন করান। ইসলামের বীর সৈনিকদেরকেও ধারাবাহিকভাবে সারিবদ্ধ করে দেন। বিভিন্ন স্থানে মিনজানিক স্থাপন করা হয়। তম্মধ্যে ঐ মিনজনিকও ছিল, যা পাঁচ শ' ব্যক্তি টেনে নিত এবং "আরূস" নামে খ্যাত ছিল। মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দেবল অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

দেবল ছিল একটি তীর্থস্থান। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট এক মন্দিরে বুদ্ধ মুর্তি ছিল। মন্দিরটির আলীশান ভবনের উপরে একটি অনেক উঁচু মিনার ছিল। মিনারের একদিকে বিরাট একটি লাল পতাকা উড়ানো ছিল। বাতাস প্রবাহিত হলে ঐ পতাকা সারা শহরে হেলত। একদিন মুসলমান লক্ষ্যস্থির করে মিনজানক নিক্ষেপ করে। তাতে মন্দিরের মিনার নড়বড়ে হয়ে যায়। আর ঐ পবিত্র পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। শহর বাসীগণ এটাকে মহাবিপদ সংকেত মনে করে হতবিহবল হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ বীর-বিক্রমে শহরের উপর আক্রমণ করে। কতিপয় সৈনিক রশির সাহায্যে শহরের ভিতরে প্রবেশ করে তরবারীর সাহায্যে শহর দখল করে নেয়। এ অবস্থা দেখে সিন্ধুর রাজা দাহিরের শাসক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। দেবল বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাশিম ওখানে চার হাজার মুসলমানের এক বসতি স্থাপন করেন এবং বিরাট এক মসজিদ নির্মাণ করে। এটি ছিল কুফরের স্থান ভারতে খোদার একত্ববাদের প্রথম উপাসনালয়। মুহাম্মদ বিন কাশিম দেবল থেকে বিরুন অভিমুখে যাত্রা করেন। বিরুনের শাসক পূর্বেই দূত পাঠিয়ে হাজ্জাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করে নেয়। মুহাম্মদ বিন কাশিম সন্ধি স্থাপনের শর্তানুযায়ী প্রবেশ করেন এবং সেখানে তাকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বিন কাশিম একের পর এক শহর দখল করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এমতাবস্থায় সিন্ধু নদের এক শাখা নদী অতিক্রম করে সারবীদাস আক্রমণ করেন। সারবীদাসের রাজা বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি স্থাপন করে নেয়। ওখান থেকে মুহাম্মদ বিন কাশিম সাহবান অভিমুখে যাত্রা করে তা দখল করে নেয়।

এরপর ইবনে কাশিম সিন্দু নদের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথের রাস্তা পর্যবেক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র এক বাহিনী (সাহওয়ান) সাদুস্তানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সাদুস্তানবাসী নিরাপত্তা চেয়ে কর দানের শর্তে সন্ধি স্থাপন করে নেয়। মুহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু নদের তীরে পৌছে সাঁকো তৈরী করেন। এদিকে রাজা

e-ilm.weebly.com

দাহির সিন্ধু উপকূলীয় এলাকার অন্যান্য রাজাদের সাথে মিলিত হয়ে বিরাট এক বাহিনী গঠন করে। সিন্ধু নদী অতিক্রম করা মাত্রই মুহাম্মদ বিন কাশিমের আসল শত্রু রাজা দাহিরের সাথে মুকাবিলা করতে হয়। সিন্ধু বাহিনী প্রথমে সারীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। রাজা দাহির স্বয়ং মাঝের সারিতে অবস্থান করে এবং শ্বেত হস্তির পিঠে আরোহন করে কমাণ্ড করছিল। উভয় বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাশিম বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। আর দাহির স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়।

রাজা দাহিরের ঘাতক তার প্রশংসনীয় কৃতকর্মের জন্য গর্ববোধ করে নিম্নোক্ত ভাষায় কবিতা আবৃতি করে–

الخيل تشهد يوم داهرو القنا ـ ومحمد بن القاسم بن محمد

انى فرجت الجمع غير معره ـ حتى علوت عظيمهم بمهند

فتركته نخت العجاج مجندلا ـ متعفر الخدين غير موسد ـ

"দাহিরের সাথে যুদ্ধের দিনে ঘোড়া-বর্শা আর মুহাম্মদ ইবন কাশিম বিন মুহাম্মদ এ কাজের সাক্ষী ছিল যে, আমি পেছনে সরে পড়িনি; ময়দান পস্কার করে সামনে অগ্রসর হতে থাকি। এমনকি আমি দুশমনের সরদার দাহিরকে হিন্দী তরবারী দিয়ে ধরাশায়িকরে ফেলি। আমি তাকে তখনই ছেড়েছি, যখন সে জমিনের চাদরে আবৃত হয়েছে। তার উভয় গণ্ড ধূলায় মিশ্রিত ছিল; মাথার নিচে বালিশও ছিল না।

দাহির নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু প্রদেশের শহরগুলো একের পর এক দখল করে নেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে প্রথমে রোর পৌছেন। ওখানে রাজা দহিরের এক সাহসী রাণী মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। মুহাম্মদ বিন কাশেম ওখানে পৌছে দূর্গ অবরোধ করে পাথর বর্ষণ করতে শুরু করেন। রাণী পরাজয় নিশ্চিত দেখে সখিদের নিয়ে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। দূর্গের মূল্যবান দ্রব্যাদি ও অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। মুহাম্মদ বিন কাশেম ওখান থেকে ব্রাম্মানাবাদ অভিমুখে যাত্রা করে। ব্রাম্মানাবাদে দাহিরের ছত্রভংগ হয়ে পড়া বাহিনী দাহিরের পুত্র জয় সিংয়ের নির্দেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। মুহাম্মদ বিন কাশিম তা দখল করে ওখানে নিজের পক্ষ দেখে একজন শাসক নিয়োগ করেন। আর জয়সিং নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

ব্রাম্মনাবাদ থেকে মুহাম্মদ বিন কাশিম সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রাস্তায় সাওয়ান্দারী বাসী সাথে সাক্ষাত হয়। তারা সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে। মুহাম্মদ বিন কাশিম দাওয়াত খাওয়ানোর শর্তে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয়। সাওন্দবাসীরা মুসলমানদের আমন্ত্রণের আয়োজন করে এবং সকলে মুসলমান হয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন কাশিম ওখান থেকে বাসমাদ পৌছেন, তখন ওখানের

e-ilm.weebly.com

অধিবাসীগণ সাওয়ান্দবাসীদের মত সন্ধি করতে রাজী হয়। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাশিম রোর পৌঁছে। ঐ শহর এক পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত ছিল। মুসলমানগণ কয়েক মাস পর্যন্ত ঐ শহর অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ অবরোধের কারণে শহরবাসীগণ নিরুপায় হয়ে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে বলে, আমরা এ শর্তে সন্ধি করতে রাজী আছি যে, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করতে হবে। আমাদের প্রতিমা গৃহসমূহ ধ্বংস করা যাবে না। মুহাম্মদ নিরাপত্তা দানের শর্ত কবুল করেন। আর মন্দিরকে গীর্জা ও অগ্নিউপাসলয় বলে ঘোষনা করেন। মুহাম্মদ বিন কাশেম রোরে এক বিরাট মসজিদ তৈরী করেন।

মূলতান বিজয়

মুহাম্মদ বিন কাশিম এখান থেকে বিদায় হয়ে সুকার জয় করেন। তারপর বিয়াস নদী অতিক্রম করে মুলতান পৌঁছেন। মুলতানের রাজা শহর থেকে বের হয়ে মুকাবিলা করে। কিন্তু পরাজিত হয়ে শহরে প্রবেশ করে দূর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখে। অবশেষে জনৈক মুলতানীর পরামর্শে শহর বাসীর পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মুলতানের রাজা নিরুপায় হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পন করে। আর মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করে।

মুলতানও বৌদ্ধদের বিরাট তীর্থস্থান ছিল। এখানের মন্দিরের পুরোহিতের জন্য অনেক দূরদূরান্ত থেকে ভেট আসত এবং বুদ্ধ মূর্তির সামনে পেশ করা হত। এ সব সম্পদ মুলমানদের হস্তগত হয়। এত বিপুল পরিথান স্বর্ণ মুসলমানদের হস্তগত হয় যে, তা সংরক্ষণের জন্য ১০ গজ দৈর্ঘ্য ৮ গজ এক কক্ষের প্রয়োজন হয়। এ কারণে আরবদের নিকট মুলতান "স্বর্ণের খনি" হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এর পর হাজ্জাজ হিসাব করে দেখে যে, সিন্ধু অভিযানে ব্যয় হয়েছে ৬০ লাখ দিরহাম, আর শুধু গনিমতের মাল হিসেবে এক কোটি বিশ লাখ দিরহাম লাভ হয়েছে। অতঃপর সে বলল, এ অভিযানে খরচ হয়েছে ৬০ লাখ দিরহাম। আর লাভ হয়েছে ৬০ লাখ দিরহাম। তাই সে তার অংশ আলাদা করে নেয়। মুহাম্মদ বিন কাশিম মুলতানে অবস্থান করার সময় হাজ্জাজে মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছে। মুহাম্মদ বিন কাশিম বিজিত এলাকার রোর ও বাগরোর অভিমুখে যাত্রা করেন। এখান থেকে তিনি সুলাইমানের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সুলাইমানের অধিবাসীগণ বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এবার শারশত এলাকায় রওনা হোন। সেখানকার লোকেরাও আনুগত্য স্বীকার করে। অতঃপর ইব্নে কাশেম কিরাজ অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানের রাজা দোহার শহর মুকাবিলা করে কিন্তু পরাজিত ও নিহত হয়। এই বিরাট বিজয়ের পর যার ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের আলোয় সিন্ধুর জনমানহীন এলাকা সমূহ আলোকিত হয়েছে, সেই ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু হয়ে যায়। এর অবশিষ্ট অংশ সুলাইমন বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে বর্ণনা করা হবে।

ইব্নে আছীর– ৪/২০৫-২০৬; ফতুহুল বুলদান– ৪৪৪

e-ilm.weebly.com

কুতাইবা ইবনে মুসলিম

৮৬ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুতাইবা ইবনে মুসলিমকে মুফাযযাল ইবনে মুহাল্লাবের জায়গায় খুরাসানের শাসক নিযুক্ত করেন। কুতাইবা খোরাসান পৌছেই জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে একটি জ্বালাময়ি ভাষণ দান করেন। তাঁর ঐ ভাষণে অসংখ্য লোক আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কুতাইবা ঐ সব মুজাহিদের সাথে নিয়ে তুর্কিস্থানের কলহপ্রিয় বিদ্রোহী সরদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওনা হয়। কুতাইবা তালিকান পৌছার পর বলখের সরদার ও তার সাথে এসে মিলিত হয়। কুতাইবা জাইহুন নদী অতিক্রম করলে সাগাইনের বাদশাহ বিপুল পরিমান উপহার সামগ্রীসহ সংবর্ধনার আয়োজন করে। আর নিজ শহরের স্বর্ণের চাবি পেশ করে, তার স্বদেশে আগমনের প্রস্তাব দেয়। কুতাইবা তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সাগাইনের বাদশাহ তার এলাকা কুতাইবার তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া, কেননা তার প্রতিবেশী আখেরুল ও শুমান বাদশাহ তাকে অনেক উত্যক্ত করছিল।

কুতাইবা এখান থেকে আখরুন ও শুমান অভিমুখে যাত্রা করার ইচ্ছা করেন। আখরুন ও শুমানের শাসকরা তাদের প্রতিবেশী সাগাইনে বাদশাহের আনুগত্যের খবর শুনে পর সেও উপহার সামগ্রী পেশ করে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। কুতাইবা তার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

এরপর কুতাইবা মার্ভে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় ভ্রাতা সালেহকে বিজীত এলাকার দায়িত্বে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। সালেহ নসর বিন সাইয়ারের সাহায্যে কাশান ও ফারগানার শহর উরাশাত, বেগমজ, শাকীত দখল করে। ৮৭ হিজরীতে কুতাইবার নিকট নিজাক (জনৈক তুরানী আমীর) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। বস্তুতঃ সে সময় নিজাকের হাতে কতিপয় মুসলমান বন্দী ছিল। কুতাইবা তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করে ধমকি দেন। নিজাক ভয়ে তাদের মুক্ত করে দেয়। কুতাইবা তাকে আরো নির্দেশ দেয়, তুমি যদি নিজের কল্যাণ চাও তাহলে স্বেচ্ছায় আমার নিকট চলে এসো। নতুবা আমি তোমাকে বন্দী কবে নিয়ে আসব। নিজাক এ নির্দেশও পালন করে। সুতরাং কুতাইবা তার সাথে সন্ধি স্থাপন করে এবং ওয়াদা করে, সে বাদগস কখনো আক্রমণ করবে না।

ঐ বছর কুতাইবা জাইহুন নদী অতিক্রম করে বুখারার উপকূলীয় শহর বাইকন্দ আক্রমণ করেন। বেকন্দবাসীগণ সাগাদ ও আশপাশের অন্যান্য জাতির সাহায্য কামনা করে। সুতরাং তার সাহায্যে বিরাট একদল এগিয়ে আসে এবং মুসলমানদের ঘেরাও করে তাদের পথ বন্ধ করে দেয়। দু'মাস পর্যন্ত মুসলমানদের অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়। না কুতাইবার নিকট থেকে কোনো দূত ইসলামী সাম্রাজ্যে যেতে পারত, আর না রাজধানী থেকে কোনো বার্তা কুতাইবার নিকট পৌছতে পারত, হাজ্জাজ নিজেও এ অবস্থায় ভীষণ চিন্তিত হয়ে

e-ilm.weebly.com

পড়ে। সে কুতাইবার সফলতার জন্য মসজিদ সমূহের দু'আ করার আহবান জানায়। অবশেষে মুসলমানগণ একদিন জীবন বাজী রেখে হামলা করে। ফলে কাফিরদের পায়ের তলার মাটি উড়ে যায়। তারা শহরের দিকে পলায়ন করতে শুরু করে। মুসলমানগণও তাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে অকাতরে তাদেরকে হত্যা করে এবং অনেককে গ্রেফতার করে। তারপরও কিছু লোক শহরে প্রবেশ করে শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। কুতাইবা শহরের প্রাচীর ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেয়। তাই কান্দবাসীগণ যখন নিশ্চিত হয় যে, আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তখন তারা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। কুতাইবা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নিজের পক্ষ থেকে ওখানে একজন কর আদায়কারী নিয়োগ করে ফিরে আসেন।

কুতাইবা ওখান থেকে পাঁচ ফরসখ (১৫ মাইলের কিছু বেশি) পথ অতিক্রম করার পর জানতে পারেন, বেকান্দবাসীরা বিদ্রোহ করে তার কর আদায়কারীকে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদ পেয়ে কুতাইবা তাৎক্ষণিকভাবে পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে আবার শহরের প্রাচীর ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেন। বেকন্দবাসী পুনরায় সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। কুতাইবা সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে জোরপূর্বক শহরে প্রবেশ করে দুশমন যুবকদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে শুরু করেন। জনৈক অন্ধ ব্যক্তি শহর বাসীদের বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করে ছিল। তাকে কুতাইবার সম্মুখে ধরে আনা হয়। সে তার প্রাণের বিনিময়ে দশলাখ দিরহাম মূল্যের ৫ হাজার রেশমী থান কাপড় দান করার প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু কুতাইবা তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বললেন, মুসলমান পুনরায় তোমার প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে না। এ কথা বলে তাকে হত্যা করা হয়। বাইকন্দে মুসলমানগণ অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াও স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজসপত্র ও অন্যান্য বিপুল পরিমাণ মাল গণীমত হিসেবে লাভ করে। ইতোপূর্বে খোরাসান থেকেও এত বিপুল পরিমাণ মাল পায়নি। এরপর কুতাইবা মার্ভে ফিরে আসেন।

৮৮ হিজরীতে বসন্তকালে কুতাইবা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মার্ভ ত্যাগ করেন। জাইহুন নদী অতিক্রম করে নওশিকাস্ত পৌছেন। এখানের অধিবাসীগণ সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে। তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কুতাইবা এখান থেকে আমছানা পৌছে। এখানের অধিবাসীরাও সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। কুতাইবা তাদের প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। এ সব আক্রমণ থেকে অবসর হয়ে কুতাইবা পুনরায় মার্ভে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করে।

এদিকে তুর্কী, ছাগাদ ও ফারগানাবাসী যৌথভাবে চীনের বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র কোরালগাবুনের নেতৃত্বে কুতাইবা বাহিনীর পশ্চাত দিকে হামলা করে বসে। কুতাইবা মুসলিম বাহিনীর সাথে সামনে চলে গিয়েছিলেন। পশ্চাত দিকের নেতা আবদুর রহমান বিন মুসলিম আপন ভ্রাতা কুতাইবাকে এ আক্রমণের খবর দেন

e-ilm.weebly.com

এবং নিজেই তার অল্প সংখ্যক বাহিনী নিয়ে বীরত্বের সাথে শত্রুর বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করেন। সুতরাং কুতাইবা খবর পাওয়া মাত্র পেছনে ফিরে আসেন। মুসলমানগণ তুর্কী, ছাগাদ ও ফারগানার যৌথ বাহিনীকে পরাজতি করে। ঐ যুদ্ধে বাদগীছের নেতা নিজাকও মুসলমানদেরকে জীবন বাজী রেখে সাহায্য করে। এরপর কুতাইবা তিরমিযের পথে মার্ভ প্রত্যাবর্তন করেন।

বুখারা বিজয়

৮৯ হিজরীতে কুতাইবা পুনরায় বুখারা বিজয়ের উদ্দেশ্যে জাইহুন নদী অতিক্রমণ করে খিরকানা সিফলী পৌঁছেন। ওখানে তার বিরাট এক বাহিনীর সাথে মুকাবিলা হয়। কুতাবাইবা তাদের পরাজিত করে বুখারার কাছাকাছি পৌঁছে যান। বুখারার বাদশাহ দারবান ফিদা কুতাইবার আক্রমণের খবর পেয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে মুকাবিলা করে। কুতাইবা বুখারা জয়ে ব্যর্থ হয়ে মার্ভ ফিরে যান। হাজ্জাজ কুতাইবার ব্যর্থতার খবর পেয়ে কুতাইবার নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তুমি দারবানে ফিদার মুকাবিলায় যে দুর্বলতা দেখিয়েছ, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর আমার পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী পুনরায় বুখারা আক্রমণ কর। সুতরাং হাজ্জাজের নির্দেশ অনুযায়ী কুতাইবা ৯০ হিজরীতে পুনরায় বুখারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মার্ভ ত্যাগ করেন। বুখারার বাদশাহ তার প্রতিবেশী ছাগাদ ও তুর্কীদের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু তাদের সাহায্য আসার পূর্বেই কুতাইবা বুখারা অবরোধ করে ফেলেন। ছাগাদ ও তুর্কীদের সাহায্য এসে পৌঁছালে বুখারাবাসীদের শক্তি বেড়ে যায়। তারা মুকাবিলায় বেরিয়ে আসে। ঐ যুদ্ধে শত্রু বাহিনী এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, এক পর্যায় তারা মুসলিম বাহিনীর এক অংশ ভেদ করে মূল বাহিনীর মধ্যে ডুকে পড়ে। মুসলমান মহিলাগণ এ শোচনীয় অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করে। আর তারা তাদের পুরুষদের অশ্বসমূহকে মারপিট করে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেয়। নারীদের এ পদক্ষেপ দেখে পুরুষদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয়। তাই তারা দুশমনদের উপর কঠিন প্রতিঘাত করেন। তাদের পেছনে তাড়িয়ে দেয়। শত্রুরা বাধ্য হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। ঐ চূড়া ও মুসলমানদের বাহিনীর মধ্যে এক নদী প্রতিবন্ধক ছিল। কুতাইবা চিৎকার করে বললেন, এমন কেউ আছ কি? যে দুশমনদের ঐ চূড়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। বনী তামীমের দুই নেতা ওয়াকীছ তামীম স্বীয় গোত্রের নব যুবকদের সঙ্গে নিয়ে নদী অতিক্রম করে শত্রুর উপর হামলা করে। শত্রু বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে বুখারা মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

উক্ত যুদ্ধে তুর্কী বাদশাহ খাকান ও তার পুত্রও আহত হয়। ছাগাদের বাদশাহ, বুখারার বাদশাহের ঐ পরাজয়ে ভীষণ ভীত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে কুতাবাই নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। কুতাইবা মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ধিপত্রে

e-ilm.weebly.com

স্বাক্ষর করেন। ঐ সাফল্য লাভের পর কুতাইবা মার্ভ প্রত্যাবর্তন করে হাজ্জাজকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন। –ইব্নে আছীর– ৪/২০৭

নিযাকের বিদ্রোহ ও হত্যা

বাদগাহীছের সরদার নিযাক এত দিন যাবত কুতাইবার সাথেই ছিল। সে মুসলমানদের প্রতিনিয়ত সফলতা দেখে ভীত হয়ে কুতাইবার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তাখারিস্তান প্রত্যাবর্তন করে। সে এখানে এসে বলখ, মারুজ, তালেকান, ফারিয়াব, জুযাজান ও কাবুলের নেতাদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুতাইবা এই সংবাদ পেয়ে স্বীয় ভ্রাতা আবদুর রহমান বিন মুসলিমের নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে বারকান অভিমুখে প্রেরণ করে। তাকে বারকান পৌঁছে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। শীত মৌসুম শেষ হওয়ার পর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্রোহী নেতাদের দমনের উদ্দেশ্যে নিজেই যাত্রা করেন।

প্রথমে তালেকান পৌঁছেন। এখানে এক রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের পর তালোকানের নেতাকে পরাজিত করে দেন। অসংখ্য তালোকানবাসী মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। তারপর কুতাইবা ফারইয়াব অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানের সরকার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তারপর কুতাইবা জোয্জান অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানের সরকার পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। শহরবাসীরা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তারপর কুতাইবা বলখ হয়ে নিযাকের খোঁজে স্বীয় ভ্রাতা আবদুর রহমানের সাথে হিল্মের ঘাঁটিতে মিলিত হন। নিযাক ঐ ঘাঁটিতে আত্মগোপন করে ছিল। ঐ ঘাঁটি খুবই দুর্গম ছিল। নিযাক কুতাইবার আগমনের সংবাদ পেয়ে ঐ ঘাঁটির মুখে কতিপয় প্রহরী নিয়োজিত করে। আর পেছনের সংরক্ষিত এক দূর্গে সৈন্য বাহিনী রেখে নিজে বাগলানের দিকে চলে যায়।

ঐ ঘাঁটিতে প্রবেশ করার কোন রাস্তা কুতাইবা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাছাড়া নিযাকের নিকট পৌঁছার কোনো রাস্তাও তার জানা ছিল না। কুতাইবা এ বিব্রতকর অবস্থায় ছিলেন। ইত্যাবসরে জনৈক পাহাড়ী কুতাইবার নিকট এসে গোপন রাস্তা দেখিয়ে দেয়। যা ঘাঁটির পেছনের দিক দিয়ে দূর্গের সাথে মিলিত হয়েছে। কুতাইবার কতিপয় সৈন্যকে পাহাড়ী লোকটির সাথে পাঠান। ঐ সৈন্যদল অতর্কিতে দূর্গে হামলা করে বসে। দূর্গে অবস্থানরত কতিপয় সৈন্য নিহত হয়। আর কিছু সৈন্য প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়।

এরপর কুতাইবা স্বীয় বাহিনী সাথে নিয়ে হিলেমের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে সামঞ্জান পৌঁছেন। এখানে কিছু দিন অপেক্ষা করে নিযাকের খোঁজে সামনে অগ্রসর হন। নিযাক ফারগানা উপত্যকা অতিক্রম করেন নিজের অস্ত্রশস্ত্রসহ সমুদয় মালামাল কাবুলের বাদশাহের নিকট পৌঁছে দেয়। আর নিজে কুর্য এসে আশ্রয় নেয়। কুর্য দূর্গ ভীষণ সংরক্ষিত ছিল। এর পথ এমনই সরু

e-ilm.weebly.com

ছিল, তাতে চতুস্পদ জন্তুও প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ওখানে পৌছার অন্য কোনো রাস্তা ছিল না। কুতাইবা দু' মাস পর্যন্ত ঐ দূর্গ অবরোধ করে রাখে। ঐ অবরুদ্ধ অবস্থায় নিযাকের বাহিনী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। অপর দিকে তার রসদ শেষ হয়ে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। এ দিকে শীত মৌসুমের আগমনে কুতাইবা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

অবশেষে কুতাইবা নিযাকের বিশ্বস্ত ব্যক্তি সালিমকে নিযাকের নিকট প্রেরণ করে। তাকে বলে দেয়, যে কোনো ভাবেই হোক নিযাককে বুঝিয়ে শুনি আমার নিকট নিয়ে এসো। সালিম নিযাককে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে কুতাইবার নিকট নিয়ে আসে। কুতাইবা নিযাক ও তার বাহিনীকে গ্রেফতার করার আদেশ দেন। আর নিযাকের ব্যাপারে হাজ্জাজের অভিমত জানার আবেদন করে। নিযাক মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে। আর অন্যান্য শাসকদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ কারণে হাজ্জাজ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং হাজ্জাজের নির্দেশ অনুযায়ী নিজাক ও তার সাতশ' সাথীকে হত্যা করে ফেলা হয়। তবে তাখারিস্তানের আসল শাসক ও নিজাকের মনিব জাবগুবাহ তখনও নিজাকের হাতে বন্দী ছিল, তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এ অভিযান শেষে কুতাইবা মার্ভ প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত ঘটনা ৯১ হিজরীতে সংঘটিত হয়। ৯৩ হিজরীতে কুতাইবা খাওয়ারিজমের শাসকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

ঘটনা হল, খাওয়ারিজমের বাদশাহ ছিলেন এক দুর্বল শাসক। ফলে তার ভ্রাতা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তাকে শারীরিক ভাবে পঙ্গু করে দেয়। খাওয়ারিজমের শাসক স্বীয় ভ্রাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কুতাইবাকে এ মর্মে পত্র লেখে যে, যদি আপনি আমাকে ভ্রাতার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন, তাহলে আমি আপনার আনুগত্য করব। কুতাইবা মার্ভ থেকে বেরিয়ে "হাজার সাব" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। খওয়ারিজমের বাদশাহ একটি প্রতিনিধি দলের মধ্যস্থতায় কুতাইবার সাথে সন্ধির শর্ত পূরণ করেন। কুতাইবা ঐ বাদশার ভাই খুরজাদ এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করেন। খাওয়ারিজমের বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দেন। খাওয়ারিজমের বাদশাহ তাদের সকলকে হত্যা করে ফেলে। আর তাদের পরিত্যাক্ত সমুদ্বয় অর্থ-সম্পদ উপঢৌকন স্বরূপ কুতাইবার নিকট পাঠিয়ে দেয়।

সমরকন্দ বিজয়

খাওয়ারিজমের সম্রাটের সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করার পর কুতাইবা তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ মতে সমরকন্দ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে কুতাইবা গোপনে তার ভ্রাতা আবদুর রহমানকে সমরকন্দ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিন চার দিন পর খাওয়ারিজম ও বুখারার অধিবাসীদের সাথে নিয়ে

e-ilm.weebly.com

নিজে স্বীয় ভ্রাতার সাথে মিলিত হন। ছাগাদ (সমরকন্দবাসী) মুকাবিলা করার সামর্থ না থাকায় শহরের ফটক বন্দ করে দেয়। মুসলমান দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখে। পরবর্তীতে ছাগাদবাসী নিরুপায় হয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সম্রাট শাসক চীন সম্রাট ও ফারগানার শাসকদের নিকট এ মর্মে সাহায্যের আবেদন করে যে, আজ আমাদের পালা, আগামীতে তোমাদের পালা আসবে। তাই আমাদের সাহায্য করার এখনই উপযুক্ত সময়। তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসো। নতুবা আরববাসীগণ এক ইঞ্চি জমীনও তোমাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবে না। ছাগাদের এ আহবান শুনে ঐ বাদশাহগণ চিন্তায় পড়ে যায়। তারা পরস্পরে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আরবদের সফলতা লাভের একমাত্র কারণ সাধারণ মানুষ তাদের মুকাবিলা করায় তারা একের পর এক সফলতা লাভ করে চলেছে। যাবত না সম্মানিত যুবরাজ ও বাহাদুর অভিজাত শ্রেণী তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অগ্রযাত্রা দমানো যাবে না। সুতরাং চীন যুবরাজের নেতৃত্বে বিরাট এক বাহিনী গঠন করা হয়।

ঐ বাহিনীতে অনেক শাহযাদা ও আমিরযাদাও ছিল। তাদেরকে মুসলমানদের উপর রাতে অতর্কিত হামলা করার জন্য পাঠানো হয়। কুতাইবা ঐ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ৬শ' সৈন্যের এক বাহিনী সালেহ বিন মুসলিমের নেতৃত্বে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। সালেহ তার বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ ডানে, এক ভাগ বামে পাহাড়ের গোপণে ঘাঁটিতে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়। আর বাকী অংশ নিয়ে নিজে তাদের গতিরোধ করেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শত্রু বাহিনী এসে পৌঁছে। মুসলমানদের দেখে তারা অতর্কিত হামলা করে বসে। মুসলমানগণ প্রাণপণে লড়াই করে তাদের প্রতিরোধ করে। এর অল্প কিছুক্ষণ পর ডানে বামে আত্মগোপন কারী বাহিনী বের হয়ে শত্রু বাহিনীর পেছন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। ফলে তারা উভয় দিক থেকে শত্রু বাহিনী আক্রান্ত হয়। যদিও শত্রু বাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল, কিন্তু অবশেষে বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করে। বিপুল সংখ্যক শাহযাদা ও আমীর যাদা যুদ্ধে নিহত হয়। বাকীরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়। অনেকেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। অগ্রবর্তীদলের পরাজয়ের খবর শুনে ছাগাদ বাহিনী ভেঙে পড়ে। অপর দিকে কুতাইবা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে গোলা বর্ষণ শুরু করে। ফলে দূর্গের এক অংশ ভেংঙে যায়। মুসলমান বাহাদুরগণ ঢালের সাহায্যে মুখ আবৃত করে দূর্গের ভাংগা অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন ছাগাদবাসীদের আনুগত্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই গোযা নিম্নোক্ত শর্তে মুসলমানদের হাতে শহর তুলে দেয়।

e-ilm.weebly.com

১। সমরকন্দবাসী বার্ষিক ২২ লাখ দিরহাম কর পরিশোধ করবে।

২। তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে।

৩। মন্দির ও অগ্নি উপাসনালয় সমূহ মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন থাকবে।

৪। মুসলমানগণ মসজিদ নির্মান করে নামায আদায় করতে পারবে।

সুতরাং সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করে। সন্ধির শর্তানুযায়ী কুতাইবা মূর্তিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারী করেন। গোযাক বলল, আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি যে এগুলো জ্বালিও না। নতুবা তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কুতাইবা বললেন, যদি তোমার এর ধারনা হয়, তাহলে আমি নিজের হাতে এগুলোতে অগ্নি সংযোগ করব। সুতরাং তিনি প্রতিমাগুলো নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেন। ঐগুলো থেকে ৫০ হাজার মিছকাল স্বর্ণ বের হয়। নিজেদের প্রতিমাসমূহের এরূপ অসহায় অবস্থা দেখে অসংখ্য সমরকন্দবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। কুতাইবা সমরকন্দে মসজিদ নির্মান করেন। মুজাহিদদের সাথে নামায আদায় করে এক ভাষণ দান করেন।

– ফতহুল বুলদান– ৪১০; ইব্নে আছীর– ৪/২১৮

এ বিজয়ের পর কুতাইবা আবদুল্লাহ ইব্নে মুসলিমকে সমরকন্দের শাসক নিয়োগ করে তার নিরাপত্তার জন্য কিছু সৈন্য রেখে মার্ভ চলে যান। ৯৪ হিজরীতে কুতাইবা পুনরায় জাইহুন নদী অতিক্রম করে বখারা ও খাওয়ারিজমের বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে শাস অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা তা দখল করেন। তিনি নিজে ফারগনা অভিমুখে এগিয়ে যান। খাজান্দাবাসী সমবেত হয়ে মুকাবিলা করে। কিন্তু পরাজিত হয়। তারপর কুতাইবা কাশান পৌঁছে তা দখল করেন। ঐ সব এলাকা জয় করে কুতাইবা মার্ভ ফিরে আসেন।

চীন আক্রমন ও খাকানের সাথে সন্ধি স্থাপন

৯২ হিজরীতে কুতাইবা চীন আক্রমণ করে চীন সম্রাটের সন্ত্রাসী দমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মার্ভ থেকে ঐ সময় যে বাহিনী এসেছিল, তাদের সাথে তাদের পরিবারবর্গও ছিল। নারী ও শিশুদের সমরকন্দে রেখে আসা হয়। কেননা ওখানে নতুন মুসলমান এলাকা স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। আর কুতাইবা মার্ভ থেকে ফারগানা অভিমুখে যাত্রা করেন। ফরগানা পৌঁছে কুতাইবা ওখান থেকে "কাশগড়" পর্যন্ত পাহাড়ী রাস্তার সংস্কার করেন। অপর এক অভিজ্ঞ নেতা কবীরকে কাশগড় জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কাশগড় চীনের সীমান্তবর্তী শহর ছিল। কবীর কাশগড় পৌঁছে তা দখল করেন। তারপর চীনের অনেক আভ্যন্তরে পৌঁছে যান। চীন সম্রাট মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে পড়ে। সে কুতাইবার নিকট এই মর্মে দূত প্রেরণ করে যে, আমার নিকট কোনো অভিজ্ঞ লোক প্রেরণ করুন। তাহলে আমি তার নিকট থেকে আপনাদের উদ্দেশ্য ও মতবাদ সম্পর্কে অবগতি লাভ করব। কুতাইবা হুবাইরা বিন শামরাজ কিলাবীর

e-ilm.weebly.com

নেতৃত্বে কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে চীন সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। এ প্রতিনিধিদল কয়েক দিন চীনের রাজ দরবারে অবস্থান করে। তারা রাজদরবারের উপদেষ্টাদের সাথে সাক্ষাত করেন। বিদায়ী সাক্ষাতে খাকান বলল, তোমাদের বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়। তবে তোমরা সসম্মানে বিদায় হয়ে যাও। তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বলবে, তোমাদের এখান থেকে চলে গেলে কল্যাণ হবে। আমার মনে হয়, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা অতি নগন্য। আর আমাদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী। তারা ইচ্ছা করলে তোমাদের পায়ের তলায় পিষ্ঠ করে ফেলতে পারবে। হুবাইরা তার অভিমতের জবাবে বজ্র কণ্ঠে বলল, হে বাদশাহ! ঐ বাহিনীকে আপনি অতিনগন্য মনে করছেন, যাদের এক মাথা চীনের কোহিস্তানে আর অপর মাথা সিরিয়ায় অবস্থিত। আপনার হত্যার ধমকি রাখুন। আমাদের বিশ্বাস হল, মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে আসে। সুতরাং যদি তা যুদ্ধের সয়দানে আসে, তাহলে তা থেকে উত্তম আর কি হতে পারে।"

মুসলমান প্রতিনিধিদলের এ সাহসিকতা ও গম্ভিব্যপূর্ণ জবাব শুনে চীন সম্রাট ভীত হয়ে যায়। তারপর চীনের বাদশাহ বলল, তোমাদের সেনাপতি কোন শর্তে সন্ধি করতে রাজী। হুবাইরা বলল, তিনি শপথ করেছেন, যাবত না আপনার স্বদেশের মাটি পদদলিত করে রাজবংশের সদস্যদের বন্দী করবেন এবং কর আদায় করবেন, ততদিন তিনি এখান থেকে ফিরে যাবেন না।"

তখন চীনের বাদশাহ বলল, আমি তোমাদের সেনাপতির শপথ পূর্ণ করে দেব। তারপর সে স্বর্ণের পাত্রে মাটি ও কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সহ চারজন শাহযোদাকে কুতাইবার নিকট প্রেরণ করে। কুতাইবা খাকানের সন্ধি প্রস্তাব কবুল করেন। খাকানের প্রেরিত মাটি পদদলিত করে শাহযাদাদের মালা পরিধান করে ফেরত পাঠিয়ে দেন। নগদ উপহার সামগ্রী কর হিসেবে গ্রহণ করেন। ঐ বিজয়ের পর কুতাইবা মার্ভে ফিরে যান। এ যুদ্ধের শুরুতে কুতাইবা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের মৃত্যুর খবর পায়। –ইব্নে আছীর– ৫/ ৩১৯।

মূসা বিন নাসাইর

অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপকে মহান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের আলোকে আলোকিত করার মুকুট মূসা বিন নাসাইর ও তার আযাদকৃত কৃতদাস তারিক বিন যিয়াদের মাথার শোভিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনামলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে মূসা বিন নাসাইর আফ্রিকার গভর্ণর হিসেবে কায়রোয়ানে বসবাস করতেন।

আফ্রিকা মহাদেশের সামনে ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে এক দ্বীপপুঞ্জ ছিল, যা স্পেন বা উন্দোলুস নামে খ্যাত। সমুদ্রের দশ মাইল দীর্ঘ একটি অংশ আফ্রিকাকে পৃথক করে রেখেছে। এ দেশের ভূমি সবুজ-শ্যামল ও উর্বর। এর

e-ilm.weebly.com

আবহাওয়া মাঝাবি ধরনের। খনিগুলো মূল্যবান ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ। এসব কারণে এটা সর্বদা নতুন নতুন বিজয়ীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। প্রথমে খুনিশিয়া বংশধরদের উন্নতির যুগে তারাই এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর কারতাজান্নাবাসী তা স্তিমীত করে দেয়। তারপর রুমাতুল কোবরার অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। অবশেষে যখন গাথ সম্প্রদায় রোমান শাসকদের পরাজিত করে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে তখন তারা ৫০০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে তাদের শাসনের পতাকা উড্ডীন করে। এসব সাম্রাজ্যে জয়-পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বিজয়ীদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল। তারা বিজীতদের কৃতদাসে পরিণত করে তাদের অর্থ-সম্পদ দখল করে ভোগ বিলাসে মত্ত হত।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে গাথ সম্প্রদায়ের শাসনের পূর্ণ যৌবন কাল ছিল। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন অবস্থা ভীষণ শোচনীয় ছিল। সাম্রাজ্যে দাসত্বের সাধারণ প্রচলন ছিল। ঐ সব কৃতদাসদের অবস্থা চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও ভীষণ শোচনীয় ছিল। তারা তাদের মনিবের অনুমতি ব্যতিত বিবাহ বন্ধনে পর্যন্ত আবদ্ধ হতে পারত না। কৃতদাসের রক্ত ও ঘাম একত্রিত করে যে সম্পদ অর্জন করত। তা তাদের মনিবের রং তামাশায় ব্যয় করত। সাম্রাজ্যের মধ্যবৃত্ত শ্রেণী অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। অভিজাত ধর্মযাজকগণ বিরাট বড় জমিদারীর মালিক ছিল। অভিজাত মহল ও ধর্মযাজকদের খানকাসমূহ সুন্দরী যুবতী নারীদের আড্ডা খানায় পরিণত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের শাসকদের উপর পাদ্রীদের বিরাট প্রভাব ছিল। পাদ্রীরা ইচ্ছা করলে বাদশাহকে পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত্য করতে পারত। ইয়াহুদীদের মধ্যেও বিরাজমান অবস্থাগুলো ভাষায় বর্ণনাতীত। সপ্তদশ কাউন্সিলের নির্দেশ মুতাবেক তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। তারপর জোরপূর্বক তাদের কঠোর গোলামীর শাস্তি দেওয়া হয়। শাসন ব্যবস্থা সংশোধনের পদ্ধতি ছিল, সমাজের উঁচু শ্রেণীর ক্ষমতা বিলোপ করা। আর নিম্ন শ্রেণীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। কিন্তু পাদ্রীদের যে প্রভাব পবিত্র ইলের নির্দেশ মুতাবেক প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে হাত দেওয়া সহজ ছিল না। মুসলমানগণ যে সময় মিশর ও সিরিয়ার মরুভূমি আর কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলীয় এলাকায় রোমান শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, তখন স্পেন রাজা উইটযার শাসনাধীন ছিল। নির্যাতিত ও নীপিড়িত জনগণ "দেয়ালে পিঠ ঠেকিলে যুদ্ধই শেষ পথ" –এ নীতি মুতাবেক প্রত্যেক রাজ্যেই আস্বস্থ হতে পারে না। স্পেনেও তখন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের করুন আর্তনাদের ধোঁয়া কখনো কখনো বিদ্রাহের আকারে বিস্ফারিত হত। যা একজন বিচক্ষণ শাসকের জন্য কম চিন্তার কারণ ছিল না। তখন নিপড়ীত লোকজন মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনির প্রতিক্ষায় ছিল, যাদের শাহাদাতের তামান্না, সাগরের এ তরঙ্গমালা হীম শীতল করতে সক্ষম হয়নি।

e-ilm.weebly.com

উইটযা সাম্রজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ শুরু করেছিল। কিন্তু পাদ্রীদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা সহজ সাধ্য ছিল না। বরং তার শাস্তি এত কঠোর ছিল যে, এর কারণে ক্ষমতা থেকে অপসারণের শাস্তি ভোগ করতে হত, সুতরাং উইটযাকে ইয়াহুদীদের পক্ষপাত্বিত্ব করার অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে এক অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনাপতি রডারিককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। রডারিক পাদ্রীদের ক্ষমতা পুনঃবহাল রাখে। ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যে ও অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য-সহায়তার ভরসায় বড় শান শওকতের সাথে তার শাসনামলের সূচনা করে।

মারক্কোর উত্তর উপকূলীয় সাবতা দূর্গ এক সন্ধি চুক্তির আলোকে এক গ্রীক নেতা ইউলিয়ানের (কাউন্ট জুলিয়ান) নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে সাবতা রোম সম্রাটের এলাকা ছিল। কিন্তু যখন আফ্রিকা থেকে রোমান শাসনের অবসান হয়, সে তখন স্পেনের খ্রিস্টান সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন যুক্তি সংগত মনে করে। সুতরাং ইউলিয়ানকে স্পেন সরকারের অংশ মনে করা হয়। আর সাবেক বাদশাহ সম্রাট উইটযা নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেয়।

অবশ্য গাথ সম্প্রদায়ের সাধারণ রীতি মতে অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর সন্তানদের শাহী মহলে লালন পালন করা হত। বলা হত, তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে যিম্মি-কমচারী হিসেবে রাখা। সুতরাং ইউলিয়ানের অপরূপা সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিণ্ডাও শাহী মহলের সৌন্দর্য ছিল। রডারিকের মাথায় শয়তান সাওয়ার হয়। সে সত্বী স্বাধ্বী ফ্লোরিণ্ডার স্বতীত্বে কলংকের দাগ লাগিয়ে দেয়। কন্যা পিতাকে নিজ বিপদের খবর অবহিত করে পত্র প্রেরণ করে– যে ভাবেই হোক, আমাকে এ অত্যাচারীর কবল থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন। কন্যার ইজ্জত-আবরুর সাথে প্রাচীন রাজ বংশের রক্তের মর্যাদাও জড়িত ছিল। ইউলিয়ান এ খবর পেয়ে সে ক্ষোভে দুঃখে অস্থির হয়ে যায়। তাই সে তাৎক্ষণিকভাবে স্পেন গিয়ে রডারিকের দরবারে উপস্থিত হয়। সে ভীষণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে স্বীয় ক্ষোভ ও দুঃখ গোপন করে স্বীয় স্ত্রীর কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার অযুহাত পেশ করে ফ্লোবিন্ডাকে ফেরত আনার আবেদন করে। আপত্তি এত কঠিন ছিল যে, রডারিক কোন ভাবে তা অস্বীকার করতে পারল না। সে ফ্লেরিণ্ডাকে পিতার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়। আর বিদায়ের সময় পিতা ও কন্যাকে অজস্র উপহার সামগ্রী প্রদান করে। রডারিক ইউলিয়ানকে বিদায়ের সময় বলল, আমার শিকারের জন্য উত্তম বাজ পাখির প্রয়োজন তুমি তা যথা শ্রীঘ্র পাঠিয়ে দিবে। ইউনিয়ান বলল আমি আপনার জন্য এমন বাজ পাখি নিয়ে আসব, যা আপনি জীবনেও কোনো দিন দেখ নি।–মুসলমাননে উন্দুলুস–৯পৃ:

e-ilm.weebly.com

কায়রোয়ানের দরবারে জুলিয়ান

সাবতা পৌছেই জুলিয়ান রডারিকের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। সে আশবেলিয়ার পাদ্রীকে সাথে নিয়ে আফ্রিকার মুসলিম রাজধানী কায়রোয়ানে উপনীত হল এবং সেখানে আফ্রিকার গভর্নর মুসা ইবনে নুসায়েরের সাথে সাক্ষাৎ করল। মুসা অত্যন্ত সমাদরের সাথে মেহমানদেরকে স্বাগতম জানালেন এবং কষ্ট করে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

জুলিয়ান নিজের দুর্দশার উপাখ্যান মুসাকে শুনিয়ে, তাকে অনুরোধ করল স্পেন আক্রমন করে এরকম অত্যাচারী ও পশুত্যের স্বভাবধারী বাদশাহ কে সিংহাসনচ্যুত করতে। সে হিসপানিয়ার আঁকাবাঁকা নদী, নকলকে সবুজ শ্যামল প্রান্তর, আংগুর, যায়তুনের সারি সারি বাগান, সুসজ্জিত নগরী, আলীশান অট্রালিকা আর প্রাচীন গাথ সম্প্রদায়ের স্বর্ণ, মনিমুক্তায় ভরপুর ধনভান্ডারের আলোচনা বড় মনোরম আর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরল। সে আরো বলল, সেখানে দুধ ও মধুর স্রোতধারা একত্রে প্রবাহিত হচ্ছে। আপনাকে শুধু এতটুকু করতে হবে যে, সেখানে গিয়ে দেশটা দখল করে নেবেন। পথপ্রদর্শন ও সৈন্যদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিশ্চিন্তায় আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করছি।

এদিকে মূসা পূর্ব থেকে স্পেন আক্রমণ করার স্বপ্ন দেখছিলেন। এ অদৃশ্য সাহায্য তার উৎসাহ আরো শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শি সেনাপতি ছিলেন। তাৎক্ষনিকভাবে চিন্তা করলেন, এ আহবান গোপন কোনো ষড়যন্ত্রও হতে পারে। মূসা ইউলিয়ানকে বললেন, এত বড় অভিযানের জন্য খিলাফতের দরবারের অনুমতি লাভ করতে হবে। তবে এ মুহূর্তে ক্ষুদ্র একদল আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। আপনি তাদের জাহাজের সাহায্যে স্পেনে পৌছে দেবেন। যাতে তারা সেখানে কিছু একটা করতে পারে। তাতে মূসার উদ্দেশ্য ছিল, এ সুযোগে মুসলমানগণ স্বচোখে দুশমনদের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবে। সুতরাং মূসা তার এক নেতা তারিফের নেতৃত্বে পাঁচশ সৈন্যের এক বাহিনীকে ইউলিয়ানের সাথে প্রেরণ করেন। তারিফ তার বাহিনী নিয়ে ইউলিয়ানের জাহাজে আরোহন করে ৯১ হিজরীতে স্পেনের দক্ষিণ উপকূলীয় বন্দর আল-খাজরায় পৌছে বিপুল পরিমান গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন। তারা এসে ইউলিয়ানের বর্ণনার সত্যায়ণ করে বললেন, স্পেন দখল করা কঠিন কোনো কাজ নয়।

এদিকে খিলাফতের দরবার থেকেও স্পেন আক্রমণ করার অনুমতি এসে যায়। কিন্তু ওয়ালীদ তাকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন যে, মুসলিম বাহিনীকে রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি ভাবে পালন করতে হবে। এক্ষুনি বড় কোনো অভিযাণ প্রেরণ করা ঠিক হবে না।

e-ilm.weebly.com

তারিকের স্পেন অভিমুখে যাত্রা

মূসা তার খ্যাত নামা চৌকস বিচক্ষণ ও সাহসী সেনাপতি মরক্কোর বাসিন্দা তারিক বিন যিয়াদ যিনি তানজার গভর্নর ছিলন, তাকে স্পেন অভিযানে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দেন। তারিক বিন যিয়াদ তার প্রতিনিধি মুগীস আরোমী ও সাহায্যকারী কাউন্ট ইউলীয়ানের সাথে ৭ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। যাদের অধিকাংশ বারবারী ও অনারবী ছিল। আফ্রিকা উপকূল অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর জাহাজ সমূহ সমূদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের বক্ষ ভেদ করে অতি দ্রুততার সাথে স্পেনের মনোরম উপকূলে পৌছে যায়। স্পেনের ঐ পূর্বাঞ্চলে সমুদ্র সৈকত যা সর্বপ্রথম মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পদচুম্বন করার গৌরব অর্জন করেছে, তা "জাবালে তারিক" নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। সামান্য বিকৃত করে আজও একে জিব্রাল্টার বলা হয়। এ ঘটনা ৯৩ হিজরীর রজব মাসে সংঘঠিত হয়েছে। তারিক স্পেন উপকূলে পৌছে সর্বপ্রথম এই কাজ করেন যে, মুজাহিদ বাহিনী যে সব জাহাজে আরোহন করে স্পেন পৌছেছে, সেসব জাহাজে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেন এবং বললেন,

- العدو امامكم والجو ورائكم فاختاروا ايهما شئتم

"তোমাদের সামনে শত্রু, পেছনে সমূদ্র, এখন যা ইচ্ছে তা বেছে নাও।

এ অবস্থায় মুজাহিদ বাহিনীর সামনে বিজয় বা শাহাদাত লাভ করা ছাড়া তৃতীয় কোন রাস্তা খোলা ছিল না। ঘটনাচক্রে রডারিকের খ্যাতনামা সেনাপতি তাদমীর (থিয়োডোমার) অধীনস্থ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে ঐ বন্দরে অবতরণ করে। সে নবাগত মুজাহিদ বাহিনীর খবর পেয়ে তাদের প্রতি অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। কিন্তু পরাজিত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়ে রডারিক এ বিপদের খবর অবহিত করে। "হে বাদশাহ! আমাদের উপর এমন সব লোক আক্রমণ করেছে, আমি না তাদের নাম জানি, আর না জানি তাদের স্বদেশ ও তার বংশ পরিচয় কিংবা তারা কোথায় থেকে এসেছে। আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে না জামীন থেকে বের হয়েছে ।

আখবারুল উন্দুলুস– ১/২১৭

সম্রাট রডারিক যে সময় এ মহাবিপদের খবর পায়, ঐ সময় সে বিদ্রোহীদের দমনে বাম্বলুনায় অবস্থান করছিল। এই খবর পাওয়া মাত্রই রাজধানী তুলায়তানা (টলেডোতে) ফিরে আসে। পরে ওখান থেকে পৌছে আশপাশের এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করে।

এদিকে তারিক একের পর এক এলাকা দখল করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। আল-জাযায়ের ও শাদোনা অঞ্চল দখল করে লক উপত্যাকায় পৌছে যান। রডারিক অতিদ্রুত ১লক্ষ সৈন্য নিয়ে কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে তারিকের পথ

e-ilm.weebly.com

রোধ করে। রডারিকের ব্যাপক প্রস্তুতির খবর শুনে তারিক তার নেতা মূসার নিকট অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর আবেদন করেন। সুতরাং মূসা অতিরিক্ত ৫ হাজার সৈন্য স্পেন অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। এভাবে তারিকের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছে।

অবশেষে ২৮ রমাযান ৯২ হিজরী ৭১১ খ্রিঃ জুলাই শাদুন্যু শহরের নিকটবর্তী লক উপত্যাকার পাদদেশে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। সেনাপতি তারিক স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ বাহিনীর সামনে উত্তেজনাপূর্ণ এক ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণের সারমর্ম হল– "হে লোক সকল! যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। তোমাদের পেছনে সমুদ্র; সামনে দুশমন। সততার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে অটল থাকলে সফলতা লাভ হয়। শত্রুর সংখ্যাধিক্যতা ও তাদের প্রস্তুতির তুলনায় এ দ্বীপে তোমাদের কোনো স্থানই নেই। যদি তোমরা এখানে বিন্দু মাত্রও অলসতা প্রদর্শন কর, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে তোমাদের নাম চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আর যদি তোমরা বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর, তাহলে এ দেশের সম্পদ ও প্রাচুর্য্য তোমাদের পদচুম্বন করবে। আমীরুল মুমিনীন তোমাদের বীরত্ব ও জীবন বাজী রাখার উপর আশ্বস্ত হয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এ দ্বীপে পাঠিয়েছেন। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদের এ মহৎ অভিযানে যার ইতিহাস দুনিয়ায় চিরদিন অম্লান থাকবে তোমাদের কথা পরকালেও ভুলা যাবে না এখানে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

যুদ্ধের ময়দানে আমার কদম তোমাদের সকলের আগে আগে থাকবে। যেন আমি যেন এদেশের সম্রাট রডারিকের উপর নিজ হাতে হামলা করতে পারি। তখন আমার সাথে তোমরা ও দুশমনদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। যদি দুশমনকে নিহত করার পূর্বে আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তোমরা অন্য কাউকে তোমাদের নেতা বানিয়ে বিজয় সফলতাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, স্পেনের রাজা রডারিক বিরাট আড়াম্বড়তার সাথে রণাঙ্গনে বেরিয়ে আসে। সে অত্যন্ত ভাবগাম্ভির্য্য পূর্ণ হাতির দাঁতের তৈরী গাড়ীতে আরোহন করে। তাতে রৌপ্যের কারুকার্য করা ছিল। শ্বেত বর্ণের খচ্চর তা টেনে এনে ছিল। রাজার মাথায় সোনার মুকুট ছিল। যার আলোতে দৃষ্টিশক্তি ঝলসে যেত। তার পরিহিত শাহী পোশাকের আলোর ঝলকানী নক্ষত্ররাজীকে ম্লান করে দিত। তাছাড়া গাত সম্প্রদায়ের শাহযাদা এবং স্পেনের আমীর-উমারাহদের স্ব-স্ব বাহিনী মিলে ১লাখ সৈন্য উক্ত যুদ্ধে যোগদান করে। পেছনে কয়েক হাজার বোঝাবাহী সওয়ারী বোঝাই করে রশি নিয়ে আসা হয়, যাতে শত্রু বাহিনীকে গ্রেফতার করে নেওয়া যায়। অপর দিকে মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধা, ঝলমলকারী বল্ম পরিহিত, তরবারী ঝুলানো ও বর্শা হাতে নিয়ে

e-ilm.weebly.com

বার হাজার সারিবদ্ধ মুসলমান দাঁড়ানো। একদিকে দম্ভ অহংকারে পরিপূর্ণ ঘাড় হেলাচ্ছে। অপরদিকে বিনয় নমনীয়তার সাথে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে মস্তক অবনত হয়ে আছে। এক দিকে বিশাল বাহিনীর রণপ্রস্তুতির দম্ভ-অহমিকা চলছে। অপর দিকে শুধু ঈমানের শক্তির উপর বিশ্বাস করে বসে আছে। এরা নিজের স্বদেশে যুদ্ধ করছে, যেখানে তাদের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য সহায়তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আর ওরা স্বদেশ থেকে যোজন যোজন দূরে সমুদ্র অতিক্রম করে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড হামলা হয়েছে।

অবশেষে ৯২ হিজরীর ৫ শাওয়াল সকালে ভাগ্য নির্ধারনী যুদ্ধ শুরু হয়। স্পেনের খ্রিস্টান বাহিনী ভীষণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে। কিন্তু আরব ও বারবারী বাহিনীর তরবারী মুখে দীর্ঘ সময় টিকতে পারেনি। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর তাকবীর ধ্বনী ত্রিত্ববাদীদের অন্তর কাঁপিয়ে দেয়। প্রথমে তারা রণে ভংগ দিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। যাদেরকে লোভ লালসা দেখিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আনা হয়েছে, তারা ব্যাপক হারে পলায়ন করতে শুরু করে। খ্রিস্টান বাহিনী এত ভীত হয়ে পালাতে শুরু করে যে, তাদের এটাও স্মরণ ছিল না যে, তাদের পেছনে বিরাট সমুদ্র রয়েছে। অবশেষে অসংখ্য পলায়নপর সৈন্য মুসলমানদের তরবারীর নিচে ধরাশায়ী হল। আবার অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে তলিয়ে গেল। রাজা রডারিকও যুদ্ধের ময়দানে থেকে পলায়ন করতে গিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। তার দেহ সমুদ্রের স্রোতে ভেসে নিরুর্দেশ হয়ে যায়। পর দিন সমূদ্রের তীরে তার জুতা ও ঘোড়া পাওয়া যায়। কিন্তু গীর্জার যাজক ও সাধারণ খ্রিস্টানগণ মনে করেছিল, সে হয়ত কোনো দ্বীপে অবস্থান করছে, তার আঘাতের ক্ষত শুকানোর পর ফিরে আসবে এবং কাফিরদের মুকাবিলায় খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে দিবে। তারা রডারিকের ফিরে আসার প্রতিক্ষায় কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। –মুসলমানে স্পেন– ১৮

উক্ত যুদ্ধে এত বিপুল পরিমাণ গণিতের মাল মুসলমানদের হাতে আসে, যা অনুমান করা অসম্ভব। পলায়নকারী সৈন্যদের এত বিপুল পরিমাণ ঘোড়া পাওয়া যায়, যা বিজয়ী বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হয়েছে। মূলতঃ ঐ যুদ্ধ স্পেনের ইতিহাসের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে। ৮ দিনের অব্যাহত যুদ্ধ আটশ বছরের জন্য স্পেন মুসলমানদের উপর ন্যাস্ত করে দিয়েছে। তারিক বিন যিয়াদ বিজয়ের সুসংবাদ পৌছানোর জন্য তার আমীর মূসা নুসাইরের নিকট কায়রোয়ানে এক দূত প্রেরণ করেন। মূসা সতর্কতার খাতিরে, যে ব্যাপারে খিলাফতের দরবার থেকেও দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ণ তাকিদ ছিল, তিনি তারিককে পত্র প্রেরণ করলেন, এখন সামনে পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। তিনি স্বয়ং তার সাথে সাক্ষাতে আসছে।

e-ilm.weebly.com

সামনে অগ্রযাত্রা

লক উপত্যকা জয় করার পর ঐ বিচক্ষণ সেনাপতি স্বীয় প্রতিপক্ষকে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেননি। তিনি জানতে পারলেন, পলায়নপর সৈন্যরা ইস্তিবিজা গিয়ে সংগঠিত হচ্ছে। তিনি দ্রুত সেখানে পৌঁছান এবং স্পেনীয় বাহিনীর সাথে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে মুসলমানগণ শহর জয় করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া তারিক স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্য এক প্রাদেশিক শহর দখল করে নেন। তারিক মূসার নির্দেশ পত্র পেয়ে সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করেন। সকলেই ঐক্য মতে পোষন করেন যে, এ সময় সামনে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা জরুরী। যদি স্পেনীয়দের অবকাশ নেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের হারানো শক্তি সংগঠিত করে নেবে। আর তখন তাদের মুকাবিলা করা মুসলমানদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কাউন্ট ইউলিয়ানও এ অভিমত জোর সমর্থন করে। সুতরাং তারিক তার বিজয়ী বাহিনীর স্রোতকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক অধিনায়কের নেতৃত্বে বিভিন্ন দ্বীপে পাঠিয়ে দেন। তারিক অধিনায়কদের এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তোমরা শুধু বাঁধা দানকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। যারা কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, তাদের উপর হামলা করবে না। আর সাধারণ স্পেনবাসীর ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করবে।

কর্ডোভা বিজয়

তারিক তার বাহাদুর প্রতিনিধি মুগীছ রুমীকে সাত শ' সৈন্যের এক দলসহ কর্ডোভা জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কর্ডোভার শাসক শাহী বংশের এক বিচক্ষণ সেনাপতি ছিল। সে শহরের দরজা বন্ধ করে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে মগীছকে এক রাখাল দূর্গের ভাঙা প্রাচীর দেখিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে ঐ রাতে ভীষণ ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়। ভারি শিলাবৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ এ অপূর্ব সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভীষণ উপকৃত হয়। প্রবল বাতাসের শব্দে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়নি। তারা অতি সতর্কতার সাথে দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের নিকট পৌঁছে যায়। এক চৌকস নবযুবক ডুমুর গাছে আরোহন করে। সেটি দেওয়ালের ফাটলের সাথে মিলিত ছিল। ওখান দিয়ে সে দেওয়ালের উপর উঠে যায়। তারপর সে নিচে রশি ঝুলিয়ে তার সাথীদের দেওয়ালের উপর উঠিয়ে নেয়। ঝড়ো বাতাস থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দেওয়াল রক্ষী প্রহরীগণ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। এ সুযোগে মুসলমান নবযুবকগণ শহরে প্রবেশ করে অবশিষ্ট প্রহরীদের হত্যা করে শহরের দরজা খুলে দেয়। সকাল হওয়ার পূর্বে বিনা বাঁধায় মুসলমানগণ শহর দখল করে নেয়।

কর্ডোভা শহরের শাসক শহর ছেড়ে সেন্ট জর্জেরগীর্জায় আশ্রয় নেয়। ঐ গীর্জা ছিল অত্যন্ত মজবুত। তার চার পাশ পরিখা বেষ্টিত। পাশ দিয়ে এক

e-ilm.weebly.com

পাহাড়ী ঝর্ণা নিচে প্রবাহিত হচ্ছিল। মুগীছ ঝর্ণাধারাহ বন্ধ করে দেন। দূর্গে আবরুদ্ধ বাহিনী নিরুপায় হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে। আর শহরের শাসক মুসলমানদের বন্দী হয়। বিজয়ের পর মুসলমান কর্ডোভায় ইয়াহুদীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল।

মারসিয়া বিজয়

রডারিকের এক বিচক্ষণ সেনাপতি তাদমীরের মুকাবিলার জন্য একটি বাহিনী মারসিয়ায় পাঠানো হয়। এর রাজধানী ছিল দুর্গম আরবেলিয়া। তা অতি শক্তিশালী ও মজবুত শহর ছিল। তাদমীর দীর্ঘ সময় মারসিয়ার পাহাড়ী ঘাঁটিতে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু যখন তার সব সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হয়ে যায়, তখন সে আরবেলিয়ার দূর্গের প্রবেশ পথ বন্ধ করে ভেতরে পড়ে থাকে এবং অতি ধূর্ততার সাথে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়। সে আরবোলয়ার যুবতী মহিলাদেরকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে অস্ত্র সজ্জিত করে। তাদের মাথার চুল দু'ভাগে থুতনীর নিচে লাগিয়ে দেয়, যা দেখতে দাঁড়ির মত মনে হত। এরপর তাদেরকে দূর্গের প্রাচীর প্রহরায় নিযুক্ত করে।

মুসলমানগণ তাদের ধাওয়া করে শহরের প্রাচীরের নিকট পৌছে, শহরকে সংরক্ষিত দেখতে পায়। তখন তাদমীর সন্ধির পতাকা হাতে নিয়ে দূতের পোশাক পরিধান করে মুসলমান বাহিনীর নিকট চলে আসে এবং মুসলমান সেনাপতিকে বলল, দীর্ঘ অবরোধ মোকাবেলা করার ক্ষমতা এ শহরের আছে। কিন্তু আমাদের সর্বাধিনায়কের ইচ্ছা হল, সৈন্যদের প্রাণ যেন অনর্থক নষ্ট না হয়। তাই আপনার নিকট আবেদন করছি, আপনি নগর বাসীদেরকে স্ব-স্ব সহায়-সম্পদসহ শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। সকাল হওয়া মাত্রই আপনি বিনাযুদ্ধে শহর দখল করে নিন। মুসলিম সেনাপতি এ শর্ত মঞ্জুর করে সন্ধি পত্রে সীল স্বাক্ষর দিয়ে সাজানো দূতের হাতে দিয়ে দেন। তখন তাদমীর বলল, আমি এ শহরের শাসক তাদমীর তারপর কলম হাতে নিয়ে সে নিজেও স্বাক্ষর করে। ভোরের আলো ফুটে উঠার সাথে সাথে শহরের ফটক খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু শহর থেকে তাদমীর ও তার এক চাকর ব্যতীত কোন সিপাহী বের হল না। দলে দলে বৃদ্ধ নারী ও শিশুরা সহায় সম্বল নিয়ে বের হয়ে চলে যেতে শুরু করল।

মুসলিম সেনাপতি তাদমীরকে জিজ্ঞেস করল– আপনার সুসজ্জিত সৈনিকরা কোথায়? কাল যারা দূর্গের প্রাচীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল? তাদমীর বলল, ঐ সৈনিক হল এ সব নারী যারা দলে দলে বের হয়ে যাচ্ছে। মারাকেশী সেনাপতি তাদমীরের এ বিচক্ষনতা দেখে প্রভাবান্বিত হয়ে তাদমীরকেই মারসিয়ার শাসনকর্তা মনোনীত করেন এবং এ প্রদেশকে ঐ বিচক্ষণ কর্মকর্তার নামে তাদমীর প্রদেশ নামকরণ করেন। – মুসলমানে উন্দুলুস– ২১।

e-ilm.weebly.com

এ ঘটনা উল্লেখ করার পরে ঐতিহাসিক স্টানলী লেনপুল বলেন, এই মধ্যযুগেও মারাকাশী (মুসলমান) সঠিক বাহাদুরীর রীতিনীতি জানতেন এবং তা পালন করতেন, তারা সকালেই বাহাদুরী অর্জনের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। যাতে পরবর্তী কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত বিজয়ী স্পেন বাসীদেরকে বাধ্য করেছে, ঐ বীরদেরকে বীর ও সম্ভ্রান্ত বলে সম্বোধন করতে।"

টলোডো বিজয়

তারিক স্বয়ং স্পেনের রাজধানী টলোডো অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ শহর ছিল অনেক উঁচুতে অবস্থিত এবং টাইগ্রীস নদী বেষ্টিত। তার প্রচীর এত বিশাল বিশাল পাথর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, যেন পাহাড় এনে স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রকৃতিক ও কৃত্রিমা প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের উপর মুসলমানদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তারা তারিকের আগমনের খবর শোনা মাত্রই শহরবাসীরা শারাত পর্বতের ওপারে জালিকা, ইস্তুরিয়া (অস্ট্রিয়াস) অভিমুখে পলায়ন করতে শুরু করে। নগর রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সিপাহীগণও পলায়নরত লোকদের অর্থ-সম্পদ ব্যাপক হারে লুণ্ঠন করে নেয়। গীর্জা বাসীরা গীর্জায় রক্ষিত মূল্যবান সম্পদসমূহকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়। প্রধান পাদ্রী তার সঙ্গী-সাথী সহ গীর্জার অতিমূল্যবান বস্তুসমূহ সাথে নিয়ে রোমে পালিয়ে গেল। স্কটের অভিমত অনুযায়ী 'তার অধীনস্থদের পেছনে ফেলে যায়, যাতে কাফিরের হাতে শাহাদাতের পুরস্কার লাভ করতে পারে।" মুসলমান বিনা বাঁধায় শহরের নিকটে পৌঁছে যায় এবং শহরের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়। আর নিজেদের রীতি অনুযায়ী সাধারনণ ক্ষমা ঘোষণা করে। যারা স্বেচ্ছায় শহর ছেড়ে চলে যেতে চায়, তাদেরকে চলে যাওয়ার আর যারা থাকতে চায় তাদেরকে শহরে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হল। তাদের উপর নাম মাত্র কর পরিশোধের শর্তে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

যদিও শহর ত্যাগকারী লোকজন অনেক অর্থ-সম্পদ নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন, তথাপি মুসলমানগণ বিপুল পরিমান গণিমতের মাল লাভ করে। যা আন্দাজ করা অসম্ভ। শাহী মহলের এক কক্ষ ঐ সব মূল্যবান সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যা "গাথ" শাসকের উত্থানের যুগে রাজধানীতে জমা করা হয়েছিল। সোনার চেইন, আস্ত হীরা, স্বর্ণ-মুক্তা সজ্জিত অস্ত্র, মূল্যবান বর্ম্ম, মুক্তা খচিত পোশাক তো ছিলই। এ ছাড়া গাথ শাসকের ২৪টি শাহী মুকুট। যা প্রত্যেক মুকুট ধারীর মৃত্যুর পর শাহী রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংক্ষিত থাকত। তারিক শহরের শাসনভার মুসলমান বাহিনী ও ইয়াহুদী মিত্রদের হাতে ন্যাস্ত করে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর কতিপয় পলায়নরত খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করেন। তারা হযরত সুলাইমান আ. এর ঐতিহাসিক টেবিল নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ টেবিল ছিল স্বর্ণের নির্মিত চার পাশ নীল পদ্মরাগ, মুক্তা ও পান্না

e-ilm.weebly.com

দ্বারা ঝালরকৃত, এর চার পায়া পুরোপুরি অতি মূল্যবান ধাতব দ্বারা নির্মিত ছিল। কথিত আছে যে, এটি পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস লণ্ঠনের সময় টিটাসের হস্তগত হয়। আর এখন তা টলোডোর প্রধান গীর্জায় রক্ষিত আছে। ঐ টেবিলের উপর পবিত্র কিতাবাদি রাখা হত। –আখবারের উন্দুলুস– ১/২৩৩-২৩৪।

তারিক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় প্রদেশ জুলাইকার শহরসমূহ দখল করতে করতে ইস্তারকা পর্যন্ত পৌঁছেন। ওখান থেকে ৯৩ হিজরীতে গনীমতসহ নিরাপদে টলোডো ফিরে আসেন।

মূসার স্পেন আগমন

তারিকের যাত্রার ২৪ মাস পর আফ্রিকার শাসক মূসা বিন নুসাইর স্পেন অভিযানে স্বশরীরে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা থেকে যাত্রা করে এবং ৯৩ হিজরীর রমাযান মাসে স্পেনের উপকূলে পৌঁছেন। কাউন্ট ইউলিয়ান মূসাকে স্বাগতম জানান এবং টলোডো যাওয়ার জন্য পশ্চিমাঞ্চলী রাস্তা বেছে নিতে বলেন। যাতে পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহর গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় করতে পারেন। মূসা এ বিষয় অবগত হওয়ার পর ভীষণ খুশি হন যে, এখনো তার বীরত্ব দেখানোর ময়দান বাকী রয়েছে। তাই ইউলিয়ানের অভিমত তার বেশী মনঃপুত হয়।

কারমুনা বিজয়

মূসা প্রথম ইবনুস সালীম জয় করে ওখান থেকে ইউলিয়ানের নেতৃত্বে কারমুনা অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কারমোনাবাসী নগরীর ফটক বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থা দেখে ইউলিয়ান নিজেকে মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত বলে পরিচয় দিয়ে কারমোনা বাসীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারমোনা বাসী তার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে আশ্রয় দেয়। রাত হলে ইউলিয়ান শহরের ফটক খুলে দেয়। ফলে মুসলিম বাহিনী বিনা বাঁধায় শহরে প্রবেশ করে শহর দখল করে নেয়।

আশবেলীয়া বিজয়

কারমোনা জয় করার পর মূসা আশবেলীয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এটি স্পেনের সবচেয়ে বড় সুন্দর ও প্রাচুর্যময় প্রচীন শহর। দীর্ঘ এক মাস মুকাবিলার পর মুসলমানগণ ঐ শহর দখল করে নেয়। শহরবাসীরা শহর ছেড়ে চলে যায়। মূসা ওখানে ইয়াহুদীদের বসতি স্থাপনের আদেশ দেন।

মেরিডা বিজয়

আশবেলিয়া থেকে মূসা মেরিডা অভিমুখে যাত্রা করেন। এটা প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। ওখানের বিরাট বিরাট ইমারত, ধনাঢ্য লোকদের বসতি ছিল। চিত্তাকর্ষক বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে পুরো স্পেনে প্রসিদ্ধ ছিল। এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। সুতরাং খ্রিস্টানগণ তা সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা

e-ilm.weebly.com

গ্রহণ করেছিল। মেরিডাবাসী শহর বন্ধ করে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত করেছিল। প্রতিদিন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের বাহিনী শহর থেকে বের হয়ে আসত। আর সন্ধ্যায় ফিরে যেত। যখন এ ধারা দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে যায়, তখন মূসা রণকৌশলের আশ্রয় নেন। রাতের অন্ধকারে মুসলমান সিপাহীদের পাহাড়ের টিলায় আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন। তিনি সৈন্যদের বলেন, ভোরে তারা যখন শহর থেকে বের হয়ে আসবে তখন তাদেরকে পেছনের দিক থেকে হামলা করে হত্যা করে ফেলতে হবে। এ কৌশল অবলম্বনে অনেক খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। তারা পুনরায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সাহস করেনি।

শহরের প্রাচীর এবং গম্বুজ মজবুত ও শক্তিশালী ছিল। এ জন্য মুসলমানদের দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দূর্গ অবরোধ করে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে মূসা দূর্গ ধ্বংস করার জন্য "দাব্বা" নামক যন্ত্র তৈরী করেন। বর্তমান যুগে যাকে ট্যাংক বলা হয়। কতিপয় বীর সৈনিক "দাব্বার" ভেতরে আরোহন করে প্রাচীরের একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় এবং "দাব্বার" সাহায্যে প্রাচীর ভেংগে ফেলে। শহরবাসীরা নিরুপায় হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। ফলে শহরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে চলে যায়।

মেরিডা থেকে মুসলমান বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল লাভ করে। রডারিকের বেগম ইসাভেলাও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মুসলমান সেনাপতি তাকে শাহী রীতিনীতি অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা করেন এবং স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযের সাথে বিবাহ দেন।

আশবেলিয়ার বিদ্রাহ

ঐ সময় আশবেলীয়ায় প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। যে সব আশবেলিয়াবাসী শহর থেকে পলায়ন করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তারা পুনরায় সংঘঠিত হয়ে আশবেলীয়া পৌঁছে। তারা ইয়াহুদীদের সহায়তায় মুসলিম নগররক্ষী বাহিনীকে হত্যা করে ফেলে। মূসা স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযকে আশবেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়। আবদুল আযীয ঝড়ের বেগে আশবেলিয়া পৌঁছে বিদ্রোহের মদদ দাতা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের নির্মুল করে পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার দখল করেন। এর পর তিনি লাসবেলা ও বাজাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ শহরসমূহ দখল করে আশবেলিয়া ফিরে আসেন।

মূসা ও তারিকের সাক্ষাত

মূসা মেরিডা থেকে টলেডো অভিমুখে যাত্রা করার খবর শুনে তারিক তার উর্ধ্বতন সেনাপতির উষ্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তারিক মূসাকে দেখা মাত্রই স্বীয় অশ্ব থেকে নিচে নেমে আসেন এবং সম্মান ও উপহার সামগ্রী পেশ করেন। তথাপি মূসা সামরিক রীতিনীতি বহাল রাখার লক্ষ্যে বিনা অনুমতিতে

e-ilm.weebly.com

স্পেনে আসার কারণে তারিককে তিরস্কার করেন। তারিক তার এখানে আসার কারণ উল্লেখ করে বলেন, এখানে আমার এ জরুরী প্রয়োজন ছিল। মূসা তার জবাবদেহীতা কবুল করে নেন। –ইবনে আছীর– ৪/২১৯, ইব্নে জারীর তাবারী।

স্পেনের অবশিষ্টাংশ বিজয়

মূসা ও তারিক উভয় টেলেডোয় বসে স্পেনের অবশিষ্টাংশ জয় করার জন্য এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যখন সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হয়, তখন তারিককে তিনি প্রধান সেনাপতি মনোনীত করে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহ জয় করার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। বিদায়ের সময় মূসা তারিককে বেশ উপকারী উপদেশ দেন।

মিষ্টার স্কটের মতে " অযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। লুণ্ঠন করা যাবে না। আর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হল, যে কেউ এ অপরাধে অভিযুক্ত হবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। স্পেনের অধিবাসীদের মতে মুসলমানদের বীরত্বে কিছু ভয়ও ছিল। আর তাদের অভিজাত্যপূর্ণ আচরণের প্রভাবও ছিল। ফলশ্রুতিতে স্পেনের "আল বরতাত" (পিরানিজ পবতমালা) পর্যন্ত পুরো এলাকা অতি দ্রুত মুসলমানদের দখলে এসে যায়। তারিক আগে আগে সন্ধিচুক্তির উপর ভিত্তি করে একের পর এক শহর দখল করে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। আর মূসা তার পিছে পিছে তার চুক্তিপত্র সমূহ সত্যায়ণ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন।

ইউরোপ বিজয়ের এক রঙ্গিন চিত্র

"আল বারাতাত" পর্বতের শীর্ষ চূড়ায় আরোহন করে মূসা ইউরোপের প্রতি তাকিয়ে নিজের উচ্চাকাংখার এক মনোরম চিত্র অংকন করেন। ঐতিহাসিক স্কটের ভাষায় তা নিম্নরূপ

"সত্য খিলাফতের যোগ্য উত্তর সূরীদের পদতলে ইউরোপের মনোলোভা শহরগুলোকে এনে দেবেন। মহান পোপের নিবাস গীর্জার মিনার সমূহ থেকে একত্ববাদের বাণী ধ্বনীত হবে। আর ওখান থেকে পূর্বদিকে বাইজেন্টাইনের রাজধানী কনস্টান্টিপলে সিরিয়া বাহিনীর সাথে আলিঙ্গন করবেন। আর এত বড় বিজয়ের জন্য একে অপরকে বসফরাস প্রণালীর নিকট স্বাগতম জানাবেন।"

মূসা তার তরবারীকে রক্ত বৃষ্টি ধারা রঞ্জিত নকশায় রঙ লাগাতে শুরু করেন। সুতরাং "আল বারতাত"এর ওপারে অবতরণ করে ফ্রান্সের সীমান্ত উপকূলবর্তী কতিপয় শহর দখল করে নেন। কিন্তু খিলাফতের দরবারের নিষেধাজ্ঞার কারণে ঐ পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

স্পেন থেকে মূসার প্রত্যাবর্তন

আমীরুল মুমিনীন ওয়ালীদ কেন্দ্রীয় খিলাফত থেকে এত দূরের দেশ সমূহে মূসার অগ্রাভিযানকে বিপদজনক মনে করলেন। তাকে অভিযান মুলতবী ঘোষণা

e-ilm.weebly.com

করার আদেশ জারী করে দূত প্রেরণ করেন। বলেন, তুমি অভিযান বন্দ করে আমার সাথে সাক্ষাত করো। মূসা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুশবেলিয়া পৌঁছে। তথায় কিছু দিন অবস্থান করে দামেশকে যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করেন। তারপর ৯৬ হিজরীতে স্পেনের শাসন ভার স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযের উপর ন্যাস্ত করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। মূসা খিলাফতের দরবারে পেশ করার জন্য বিপুল পরিমান ধনরত্ন সাথে নিয়ে যান। সারিসারি উট বোঝাই করে মূল্যবান অস্ত্র, স্বর্ণ মুনিমুক্ত খচিত পোশাক, বিলাস ব্যাসনসহ বিভিন্ন ধরনের অলংকারাধীতে পরিপূর্ণ ছিল। স্বর্ণরোপ্য মানিমুক্তা তিন গাড়ী ভর্তি ছিল। ৩০ হাজার দাসী এবং ১লাখ কৃতদাস ঐ বহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্পেন বিজয়ী সেনাপতির এ ঝাঁকঝমকপূর্ণ শোভা যাত্রা দেখে আফ্রিকার যাযাবর শ্রেণীর দৃষ্টি শক্তি বিস্ময়ে হতবাক হয় যায়। সিরিয়া উপকূলে পৌঁছার পর শুনতে পায় যে, ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক অসুস্থ। সুলাইমান বিন আবদুল মালিক ভাবী খিলাফতের উত্তরসূরী। গোপনে মূসার নিকট খবর প্রেরণ করেন যে, সে যেন রাজ দরবারে পৌঁছতে বিলম্ব করে। আমীরুল মুমিনের সুস্থ হওয়ার আশা নেই। সে কিছু সময় বিলম্ব করলে সুলাইমানের সিংহাসনে আরোহন অভিষেক অনুষ্ঠান স্পেন বিজয়ী সেনাপতির উপহার সামগ্রীতে আলোকিত হয়ে যাবে। মূসা উত্তরাধিকারী মনোনীত খলিফার আদেশ পালন জরুরী মনে করলেন না বরং আমীরুল মুমিনীনের জীবনের শেষ মুহূর্তকে মনোরম করা অধিক শ্রেয় মনে করেন। জুমার নামাযের সময় মূসা দামেশক নগরীতে প্রবেশ করেন। মুসলমানদের নেতা তার নবনির্মিত উমাইয়া মসজিদের মিম্বারে আরোহন করে জুমার খুতবা পাঠ করছিলেন। মূসা ত্রিশ স্পেনীয় ও আফ্রিকার শাহযাদা, যাদের মাথা শাহী মুকুট ঝলমল করছিল, তাদের সাথে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে খলিফার দরবারে যথারীতি অভিবাদন পেশ করেন। খলীফা মূসার সাথে মু'আনাকা করেন। নিজের পাশে বসার আদেশ করেন। মূসার নির্দেশে বন্দী শাহযাদাগণ জামে মসজিদের মিম্বরের ডান পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। খলীফা খুতবায় এ বিরাট বিজয় ও পূর্ব পশ্চিমে যতদূর পর্যন্ত তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করেন। আরো বিজয় ও সাফল্যের জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু'আ করেন। নামাযের পর মূসা স্পেন ও আফ্রিকার গনীমতের মাল খলীফার দরবারের পেশ করেন। খলীফা ওয়ালীদ মূসাকে অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। আর তার পুত্রদের জন্য মূল্যবান পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দান করেন।

আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া– ৯/১৭৩

e-ilm.weebly.com

মাসলামা বিন আবদুল মালেক

ওয়ালীদের ভ্রাতা মাসলামা বিন আবদুল মালিকের ময়দান তুরকাদ সিরিয়া ও এশিয়ার ক্ষুদ্র উপকূলীয় এলাকা ছিল। হযরত মু'আবিয়া রাযি. প্রচলীত রীতি অনুযায়ী তিনি প্রতি বছর গরমের মৌসুমে রোমান সম্রাজ্য আক্রমণ করতেন আর পৃথিবীর সর্ববৃহত খিস্টান শক্তির অন্তরে ইসলামের অগ্রযাত্রার ভীতি সঞ্চার করতেন। এসব আক্রমণে তার শক্তির উৎস হত আব্বাস বিন ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক। মাসলামা ও আব্বাস বিভিন্ন সময়ে তাওয়ানা, বোলাক, খুব্‌রাম আখরাট কুমকুম, উমুরিয়া, ওয়ালীদ, হেবাক্লা, ও কাউনিয়া প্রভৃতি দুর্গ দখল করে – ইব্‌নে আছীর– ৪/২০১-৪।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

আবদুল মালিক তার পর স্বীয় দুই পুত্র ওয়ালীদ ও সুলাইমানকে ধারাবাহিক ভাবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। আর স্বীয় পিতার অন্তিম উপদেশকে যা আবদুল মালিকের পর তার ভ্রাতা আবদুল আযীযের পাওনা ছিল, তা রহিত করে দেন। ওয়ালীদও তার জীবদ্দশায় অন্তিম মুহূর্তে স্বীয় পিতার অনুকরণ করার চেষ্টা করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা সুলাইমানকে বঞ্চিত করে স্বীয় জৈষ্ঠপুত্র আবদুল আযীয বিন ওয়ালীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু সরকারের উচ্চপদস্থত কর্তাদের মধ্যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও কুতাইবা বিন মুসলিম ব্যতীত অন্য কেউ এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি। তথাপি তিনি স্বীয় ইচ্ছায় অনঢ় থাকেন। আর যে কোনো অযুহাতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সুলাইমানকে আহবান করেন। সুলাইমান প্রকৃত বিষয় অবগত ছিল।

সে অসুস্থতার ভান করে অস্বীকার করে। তখন ওয়ালীদ নিজে সুলাইমানের নিকট গমন করে তাকে উত্তরাধিকারীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করার ইচ্ছা করেন। সে এ আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, ইত্যাবসরে মৃত্যুর শাক্তিশালী হাত তার ও তার ইচ্ছার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ালীদের এ ব্যর্থ পদক্ষেপের কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুতাইবা বিন মুসলীম প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কে সুলাইমানের অন্তরে সন্দেহের সূচনা হয়। পরিণামে ঐসব কর্মকর্তা ও তাদের সন্তানদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে।

হাজ্জাজের মৃত্যু

৯৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইরাকের শাসক হাজ্জাজ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর হাত বনী উমাইয়াদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমীকা পালন করেছিল। সে দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত বসরা, কুফা ও আশপাশের এলাকার একচ্ছত্র শাসক ছিল। সে তার শাসনামলে যা বনু উমাইয়াদের বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাটি, বসরা ও কুফা থেকে ইরাকী কলহপ্রিয়, বিশৃংঙ্খলা

e-ilm.weebly.com

সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সাধনে যে নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করেছে, ফেলে পৃথিবীর ইতিহাসে "তাকে রক্ত পিপাসু" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হাজ্জাজের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারকে খোদায়ী আযাব বলা হত, যা ইরাকের ইতিহাসের কালো অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়েছে। তবে তা ছিল ইরাকীদের বিশ্বাস ঘাতকতা ও বদ-আমলীর পরিণতি।

হযরত হাসান বসরী রাযি. বলেছেন, আমি হযরত আলী রাযি. কে কুফার জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহন করে এ দু'আ করতে দেখেছি–

"হে আল্লাহ! আমি এ সব লোকদেরকে আমানতদার ভেবেছিলাম। অথচ তারা আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। আমি তাদের কল্যাণ কামনা করেছি। অথচ তারা আমার সাথে প্রতারনা করেছে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর বনী সাকীফ গোত্রের কোনো গোলামীকে চাপিয়ে দিন। যে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে জাহিলীয়াতের যুগের বরবরতার মত ফরমায়েশ করতে পারে। তার পর হযরত হাসান বসরী রাযি. ঐ অত্যাচারীর যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সে সব বৈশিষ্টই। হাজ্জাজের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

ইব্নে আছির– ৪/২২৩

এই সব দোষক্রটির সাথে সাথে তার মধ্যে কতিপয় প্রশংসনীয় গুনাবলীও বিদ্যামান ছিল। যা অস্বীকার করা তার প্রতি ভীষণ অন্যায় হবে। সে এক অপ্রতিদ্বন্দী সেনাপতি ছিল। সমগ্র পূর্বাঞ্চল যদিও তার অধীনস্থ সেনাপতিদের হাতে বিজিত হয়েছে, কিন্তু এর পেছনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চিন্তা-চেতনা কাজ করেছে। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ কোন দিনও তার উপকারের কথা ভুলতে পারবে না। ভারতবর্ষের সিন্ধু উপকূলে জলদস্যুদের হাতে লুণ্ঠি মুসলমান নারী ও শিশুদের কাফেলার এক মহিলা মনের অজান্তেই واحجاج اغث। - হে হাজ্জাজ আমাদের উদ্ধার করো! এ করুন আর্তনাদে হাজ্জাজ হঠাৎ لبيك -আমি উপস্থিত বলে চিৎকার করে উঠে। তারপর কাল বিলম্ব না করে ভারত বর্ষ জয়ের জন্য একের পর এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে থাকে। অবশেষে স্বীয় জামাতা ও ভ্রাতুস্পত্র মুহাম্মদ বিন কাশেমকে প্রেরণ করে। আর তাঁকে এতো ভাবগম্ভির্য্য ও শানশওকতের সাথে প্রেরণ করে যে, তার বাহিনীকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুর সাথে সূই-সূতা পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

তারপর অতিমনোযোগ ও সতর্কতার সাথে এ অভিযানের খবর সংগ্রহ করতে থাকে। প্রতি তিন দিন পরপর নতুন খবর সংগ্রহ করা হত এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া হত। সুতরাং অবরোধ যখন দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে যায় তখন হাজ্জাজ এ মর্মে সংবাদ পাঠায় যে, ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব দিকে দেওয়ালর উপর পাথর বর্ষণ শুরু করো। হাজ্জাজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করায় দেবলের

e-ilm.weebly.com

কেন্দ্রী মন্দিরের মিনার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর কুফুরের স্থানে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। –ফতুহুল বুলদান বানাজুরী– ৪২৫

হাজ্জাজ কুরআনের খ্যাতনামা হাফেয ও কারী ছিল। নও মুসলমানদের প্রয়োজনের কথা ভেবে সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের স্বর চিহ্নের প্রচলন করে এবং আয়াত ও রুকুর চিহ্ন নির্ধারণ করে। সে সুললীত কণ্ঠে আরবী ভাষায় সুবক্তা ছিল। এ বিশেষ গুণাবলীর কারণে তাকে এক দিক দিয়ে হযরত হাসান বসরী রহ. এর সাথে তুলনা করা হত।

ওয়ালীদের মৃত্যু

৯৬ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক দায়রে মারওয়ানে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উমর বিন আবদুল আয়ীয রহ. জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। তারপর বাবে ছগীরের বাইরে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর ৬ মাস। তিনি নয় বছর ৮ মাস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে ১৯ পুত্র রেখে যান।

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের চরিত্র

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক লেখা পড়া করা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন বটে; কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনায় বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক সময় পেয়েছিলেন, যখন সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীন অশান্তি ও বিশৃংঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। আর মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে নির্মুল হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি সুবর্ণ সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে পুরোপুরি উপকৃত হয়েছেন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন উন্নতি সাধন ও বহিঃবিশ্ব জয়ে পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন।

ওয়ালীদ জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পুরো ইসলামী সাম্রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে বিরাট বিরাট সড়ক তৈরী করেছেন। তৎসঙ্গে তাতে মাইলের চিহ্ন নির্ধারণ করেছেন। জনসাধারণের পানির কষ্ট দূরীভূত করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যে অসংখ্য খাল ও কূপ খনন করেছেন। পথিকদের বিশ্রামের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচুর সরাইখানা নির্মান করেছিলেন। জনসাধারণের চিকিৎসার্থে সরকারী হাসপাতাল ও অসহায় গরীবদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রতিবন্ধির জন্য এক জন সেবক ও প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তির জন্য একজন পথপ্রদর্শক সরকারী খরচে নির্ধারণ করেছিলেন। তাছাড়া তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হত। তার অভ্যাস ছিল, তিনি নিজেই বাজারে গিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য জিজ্ঞেস করতেন, এ পণ্যের মূল্য কত? বিক্রেতা বলত– এর মূল্য এক পয়সা। তখন ওয়ালীদ বলতেন এক পয়সা তো খুবই কম। এর মূল্য আরো বাড়িয়ে দাও।

e-ilm.weebly.com

দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর প্রতিও তার আকর্ষণ ছিল। এত কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন দিন এক খতম কুরআন পড়তেন। প্রতি রমাযান মাসে ১৭ খতম কুরআন পড়তেন। কুরআন মজীদ শিক্ষা দানের বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তার যুগে কুরআন মজিদের স্বরচিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন করা হয়। কুরআনে হাফেয ও কারীদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হত। কুরআন হিফয করার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন। নির্মান শিল্পের প্রতিও তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এ কারণে তার যুগে অতি সুন্দর সুরৌম্য মসজিদ নির্মান করা হয়। এ ছাড়া তার শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মান করা হয়। কিন্তু মদীনার মসজিদে নববী ﷺ এবং রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদ নির্মানে তিনি যে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করেছেন, সত্যই তা তার স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর। তা ইসলামের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

৮৮ হিজরীতে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর শাসনামলে মসজিদে নববী ﷺ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নির্মান করা হয়। উম্মাহাতু মুমিনীনগণের হুজরা সমূহ তখন পর্যন্ত পূর্বের অবস্থায় বহাল ছিল। তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনাসমূহ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। আর হুযুর ﷺ এর পবিত্র রওযাও মসজিদের আওতায় এসে যায়।

মসজিদ নির্মানে সিরিয়া ও রোম থেকে অভিজ্ঞ কারিগর আনা হয়। রোম সম্রাট কায়সার ইসলামের পয়গাম্বর ﷺ এর মসজিদ নির্মানের খবর জানার পর ১লাখ মিসকাল স্বর্ণ, মিস্ত্রিদের জন্য চল্লিশ বস্তা সরঞ্জাম এবং প্রচুর কারিগর পাঠিয়ে ওয়ালীদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। মসজিদের বারান্দায় এক ফোয়ারা নির্মান করা হয়। তাতে শহরের বাহির থেকে ভূগর্ভস্থ পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হত।

রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদ এক অপূর্ব স্থাপত্য কলার নির্দশন। তার সব ফ্লোব অলংকৃত ছিল। প্রাচীর সমূহ শ্বেত মর্মর দ্বারা নির্মিত ছিল। এর উপর স্বর্ণের টাইলস্ লাগানো ছিল। তাতে মনিমুক্তার গোলাকার বেলুন বানানো ছিল। তার উপর বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ শহর সমূহের নকশা অংকন করা হয়েছিল। মেহরাবে পবিত্র কাবা গৃহের নকশা অংকন করা হয়েছিল। মসজিদের ছাদ স্বর্ণের ইট দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। স্বর্ণের ঝাড় বাতিও ঝুলানো ছিল। "মেহরাবে সাহাবাতে" বিরাট এক বড় শ্বেত মুক্তা লাগানো ছিল, যা মসজিদের বাতি সমূহ নিভানোর পরও স্বীয় আলোকে মসজিদকে আলোকোজ্জল করে রাখত।

এ মসজিদ নির্মান ভারতবর্ষ, ইরান, আফ্রিকা, রোম প্রভৃতি দেশের স্থাপত্য শিল্পী কারিগর অংশ গ্রহণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মূল্যবান নির্মান সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। প্রতিদিন বার হাজার শ্রমিক কাজ করত। এভাবে পূর্ণ ৮ বছরে এ মসজিদের নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়।

e-ilm.weebly.com

ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্‌নে আছীরের মতে উক্ত মসজিদ নির্মানে ১ কোটি ১২ লাখ দিনার ব্যয় হয়েছে। – আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া– ৯/১৬৫

হযরত ইমাম শাফঈ রহ. এ মসজিদকে পৃথিবীর পঞ্চম আশ্চর্য নিদর্শন বলেছেন। হযরত উমর রাযি. এর শাসনকালের পর ওয়ালীদের শাসনামলের বিজয়গুলোর কোন নযীর নেই। কুতাইবা বিন মুসলিম, মুহাম্মদ বিন কাশেম এবং মূসা বিন নুসাইবের কৃতিত্ব পৃথক পৃথক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মহা বিজয়ীদের অধিনস্থ সৈন্যদলের অশ্বের পায়ের দাপটে চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়েছে। অবস্থা ছিল এমন।

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری
تھمتانہ تھاکسی سے سیل رواں ہمارا

"পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমিতে আমাদের আযান ধ্বনিত হয়েছে। কোনও বাঁধাই আমাদের স্রোত ধারা থামাতে পারেনি।

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক
(৯৬ হিঃ –৯৯ হিঃ)

সুলাইমান ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পুত্র ওয়ালীদের সহোদর ভাই। পবিত্র মদীনার বনী জাজিলা মহল্লায় ৫৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর সিরিয়াতে স্বীয় পিতার নিকট বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনি হাদীস বর্ণনা কারীও ছিলেন। স্বীয় পিতার উপদেশ মোতাবেক ওয়ালীদের পর ১৫ জ়মাদিউল আখির ৯৬ হিজরীতে রমলাতে খেলাফতের মুকুট পরিধান করে সিংহাসন আরোহন করেন।

সুলাইমানের সিংহাসন আরোহনের সূচনা কোনো কোনো খ্যাতনামা সেনাপতিদের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওয়ালীদ স্বীয় পিতার উপদেশের বিরোধীতা করে সুলাইমানকে বরখাস্ত করে স্বীয় জৈষ্ঠ্য পুত্র আবদুল আযীযকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চেয়েছেন। উচ্চপদস্থত সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও কুতাইবা বিন মুসলিম তার অভিমত সমর্থন করেছিল। কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতবিরোধ ও মৃত্যুর আসার কারণে এ কাজ সমাপ্ত হয়নি।

সুলাইমান স্বাভাবিকভাবে এ সব শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারাও তারা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল না। ফলশ্রুতিতে জাতিকে নিজের কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির রক্তের দাগ বহন করতে হয়েছে।

হাজ্জাজ এ ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল যে, তার জীবদ্দশায় যেন ওয়ালীদের মৃত্যু না হয়। তাকে এই আশংকায় পতিত হতে হয়নি। সে ওয়ালীদের এক বছর পূর্বে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। কিন্তু সুলাইমান হাজ্জাজের স্থলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র খ্যাতিনামা সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

e-ilm.weebly.com

মুহাম্মদ বিন কাশেমকে হত্যা

ঐ সময় মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। সুলাইমান তাকে পদচ্যুত ঘোষণা করে তার স্থলে ইয়াযীদ বিন আবু কাবশা সাকসাকীকে সিন্ধুর গভর্নর মনোনীত করে প্রেরণ করে। ইয়াযীদ মুহাম্মদ বিন কাশেমকে বন্দী করে হাত পায়ে শিকল পরিয়ে তাকে ওয়াসিতে (ইরাকে) সালেহ বিন আবদুর রহমানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সালেহের ভ্রাতা আদমকে হাজ্জাজ বিদ্রোহ ও খারেজি হওয়ার অভিযোগে হত্যা করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাশেম স্বীয় উদারতাপূর্ণ আচার-আচরণের দ্বারা সিন্ধুবাসীদের মন জয় করেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক ইব্নে আছীরের মতে তার এ অন্যায় নিষ্ঠুর মৃত্যুর পর তারা অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। আর ঐতিহাসিক বালাজুরির অভিমত হল, মুহাম্মদ বিন কাশেমের নির্মম মৃত্যুর পর সিন্ধুবাসীরা তাঁর প্রতিকৃত বানিয়ে মন্দিরে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। – ইব্নে আছীর– ৪/২২৩।

হামযা বিন বাইয হানাফী মুহাম্মদ বিন কাশেমের মৃতুর পর নিম্নোক্ত ভাষায় শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন।

ان المرؤة السماحة والندى + لمحدبن القالسم بن محمد

ساس الجيوش لسبع عشره مجة + ياقرب ذالك سوددا من مولد ـ

"বাহাদুরী কোমল অন্তর ও বদান্যতা মুহাম্মদ বিন কাশেমের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। সে সতের বছর বয়সে সেনাপতির পদে নিয়োজিত হয়েছে। তার নেতৃত্ব কত কম বয়সে ছিল।

কুতাইবা বিন মুসলিমকে হত্যা

কুতাইবা বিন মুসলিম ছিলেন খোরাসানে প্রাদেশিক গভর্নর হাজ্জাজ কর্তৃক মনোনীত ও তার একান্ত অনুগত। সুলাইমান উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়ায় তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে সুলাইমানের সিংহাসন আরোহনের পর তাকে সর্বদাই এ দুশ্চিনাতা ও আশংকায় ভুগতে হয়েছে যে, না জানী কখন তার উপর থেকে সুলাইমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সুতরাং তিনি প্রথমে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে সুলাইমানের নিকট তিনটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম চিঠিতে তিনি সুলাইমানকে সিংহাসনে আরোহনের বিষয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর আবদুল মালিক ও ওয়ালীদের আনুগত্য করার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, যদি তাকে পদচূত্য করা না হয়, তাহলে তিনি অনুরূপ তারও আনুগত্য প্রকাশ করবেন।

দ্বিতীয় পত্রে তিনি খোরাসান ও তুর্কিস্থানে তার অপ্রতিরুদ্ধ বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং ইরান ও তুর্কিস্থানের শাসকদের ভয় ভীতির উল্লেখ করেন। আরো উল্লেখ করে ছিলেন যে, যদি তাকে খোরাসানের শাসন কর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার চির প্রতিদন্ধী ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাবকে তার

e-ilm.weebly.com

স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তাহলে তিনি খালীকার বাই'আত ভংগ করে ফেলবেন। তৃতীয় পত্রে তিনি সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের বাই'আত ভংগের ঘোষণা করেছিলেন।

উক্ত পত্রগুলো দূতের হাতে দিয়ে বললেন, প্রথমে প্রথম পত্র খলীফা সুলাইমানের হাতে দেবে। যদি তিনি তা পাঠ করে ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাবের হাতে দেন। তাহলে দ্বিতীয় পত্র দেবে। যদি তিনি দ্বিতীয় পত্র পাঠ করে ইয়াযীদ বিন মহাল্লাবের দিকে বাড়িয়ে দেন, তাহলে তৃতীয় পত্র তার হাতে দেবে। কুতাইবার দূত দরবারে খিলাফতে যখন উপস্থিত হয়, তখন অনাকাঙ্খিতভাবে ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব তথায় হাজির ছিল। দূত প্রথম পত্র সুলাইমানের হাতে অর্পণ করে। সুলাইমান তা পাঠ করে ইয়াযীদ বিন মহাল্লাবের দিকে বাড়িয়ে দেয়। এর পর দূত দ্বিতীয় পত্র সুলাইমানের হাতে অর্পণ করেন। সুলাইমান তা পাঠ করে ইয়াযিদের হাতে অর্পণ করেন। সুলাইমান তা পাঠ করে ইয়াযিদের হাতে দেন। এরপর দূত কুতাইবারর তীর দানীর তৃতীয় পত্র সুলাইমানের হাতে অর্পণ করে। সুলাইমান তা পাঠ করে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। তথাপি তিনি দূর্রদর্শিতার সাথে নিজেকে সামলে নেয়। দূতকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে স্বসম্মানে বিদায় করে দেন। আর কুতাইবাকে খোরাসানের শাসক পদে বহাল রাখার ঘোষণা পত্র দিয়ে দেন। কিন্তু আক্ষেপ। কুতাইবার তড়িৎ পদক্ষেপে তার শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে।

দূত ফিরে আসার পর কুতাইবা এ খারাপ আশঙ্কা করে যে, সুলাইমান অবশ্যই তাকে পদচ্যুত করে ফেলবে। তাই তিনি সুলাইমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। তার অধিনস্ত নেতাদের প্রতি তার দৃঢ় আস্থা ছিল। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার বিষয়ে তারা তাকে সমর্থন করেনি বরং বনী তামীম গোত্রের নেতা ওয়াকিয়ীকে তাদের সেনানায়ক মনোনীত করে তারা কুতাইবার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। আর এক হামলায় তাকে হত্যা করে ফেলে।

মোটকথা, কুতাইবা বিন মুসলিমের মত মুসলিম বিজয়ী যার ভয়ে অনারব তুর্কিস্থানের শাসকগণ প্রকম্পিত হয়েছিল, তার কুধারনায় তাকে বিরোধীতার বালি হতে হয়েছে। জনৈক খোরাসানী তার নিহত হওয়ার খবর শুনে বলেছিল, আল্লাহর কসম! যদি কুতাইবার মত বীর আমাদের মধ্যে জন্ম নিত, তার মৃত্যুর পর আমরা তাকে সিন্দুকে ভরে রেখে দিতাম। আর শত্রুর মুকাবিলার সময় ঐ সিন্দুকের বরকতে বিজয়ের আশা করতাম।

মূসা বিন নুসাইরের মৃত্যু

সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের তরবারীর নৃসংসতার তৃতীয় শিকার হয়েছিল আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ী খ্যাতনামা সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুলাইমানের কামনা ছিল, তার সিংহাসনের আরোহন করা

e-ilm.weebly.com

পর্যন্ত মূসা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করতে অপেক্ষা করে। কিন্তু মূসা তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করা জরুরী মনে না করে রাজধানীতে প্রবেশ করে। সুলাইমান শাসন ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সাথে সাথে মূসার নিকট আফ্রিকার বকেয়া টেক্সের হিসাব দানের জন্য ভীষণ কঠোরতা আরোপ করেন। মূসা তার দাবী অমান্য করায় তাকে বন্দী করা হয়। তার উপর অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা হয়। ৯৭ হিজরীতে সুলাইমান হজ্জ আদায় করার সময় মূসা বিন নুসাইরকে নজর বন্দী অবস্থায় তার সাথে সাথে রাখা হয়। অবশেষে ঐ সময় ৮০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। –আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া– ৯/১৭৪

বিজয়

কোহিস্তান ও জুরজান বিজয়

হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে হযরত সাঈদ বিন আস রাযি. এর হাতে জুরজান ও তাবারিস্তান প্রভৃতি এলাকা বিজিত হয়। কিন্তু এ অঞ্চল পাহাড় বেষ্টিত হওয়ার কারণে এখানে অধিবাসীগণ দুষ্টু প্রকৃতির ও কলহপ্রিয় ছিল। তাই তারা অতি দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণার করে ইসলামকে বিদায়ী সালাম জানায়। সুলাইমানের শাসনামলে ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব যখন খোরাসানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি এ দিয়ে মনোযোগী হয়ে ১লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জুরজান অভিমুখে প্রেরণ করেন। প্রথমে কোস্তিন এলাকা অবরোধ করে। তুর্কীরা কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তারা পরাজিত হয়। ফলে বিপুল পরিমান অর্থ-সম্পদ মুসমানদের হস্তগত হয়। তারপর ইয়াযিদ জুরজান পৌছেন। জুরজানের বাদশাহ দাইলামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। দাইলামী পুরোপুরি শক্তি নিয়ে জুরজান বাসীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। উভয় বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্স হয়।

মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক ইবনে সাব্‌রা বড়ই বীরত্ব প্রদর্শন করে। একদিন জনৈক তুর্কি সৈনিকের সাথে তার মল্লযুদ্ধ হয়। তুর্কী সৈনিক তরবারী দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। তার তরবারী তার মাথায় আটকে যায়। মুসলিম সৈনিক এমতাবস্থায় তার উপর পাল্টা হামলা করে তাকে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌছে দেন। মুল্লযুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে তিনি মুসলিম বাহিনীর শিবিরে এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, তার তরবারী থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছিল। আর দুশমনের তরবারী তার বিজয়ের গৌরবের কারণ হয়েছিল। এ দৃশ্য দেখে ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাবের মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়, আমি এরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য আর কখনও দেখি নি। এরপর মুহাল্লাব জিজ্ঞেস করল– কে এই ব্যক্তি? লোকজন বলল– সে ইবনে আবি সাবরাহ। তখন ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব বলল, সে তো অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল। যদি সে মদ্যপানে আসক্ত না হত।

e-ilm.weebly.com

অবশেষে ঐ বীরের হাতে দাইলামের বাদশাহর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। দাইলামের বাদশাহ নিহত হওয়ার পর শত্রুদলের পায়ের তলার মাটি ছিন্ন হয়ে যায়। তখন জুরজানের বাদশাহ বাধ্য হয়ে নিজের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দিয়ে হযরত সাঈদ বিন আস রাযি. এর যুগে কৃত সন্ধি চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী পুনঃসন্ধি করে নেয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপুল পরিমাণ মুল্যবান মানিমুক্তা ও স্বর্ণ লাভ করে, তার মধ্যে একটি শাহী মুকুটও ছিল। ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের সামনে ঐ মুকুট পেশ করা হয়। তিনি বলল, এরূপ সৌখিন ব্যক্তি কে আছে যাকে এ মুকুট দান করা যাবে আর সে এর প্রতি ফিরে তাকাবে না? লোকজন বলল, কে হতে পারে এমন মানুষ? ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব স্বেচ্ছা সেবক মুহাম্মদ বিন ওয়াসিকে ডেকে ঐ মুকুট উপহার স্বরূপ দিয়ে দেন। মুহাম্মদ বলল, আমার এ মুকুটের প্রয়োজন নেই। ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব আল্লাহর শপথ করে বললেন, তোমাকে অবশ্যই এ মুকুট নিতে হবে। মুহাম্মদ অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুকুট নিয়ে স্বীয় তাবুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইত্যাবসরে এক ভিক্ষুক এসে তার নিকট কিছু চাইল। মুহাম্মদ নিঃসংকোচে ভিক্ষুককে ঐ মুকুট দিয়ে দেয়। অবশেষে ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব এ সংবাদ জানার পর ঐ ভিক্ষুককে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুকুটটি ফেরৎ নিয়ে নেয়।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

৯৮ হিজরীতে সুলাইমান ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে স্বীয় ভ্রাতা মাসলামা বিন আবদুল মালিককে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে প্রেরণ করেন। এক হাজার সৈন্য স্থল পথে আর অপর এক হাজার নৌপথে কন্সটান্টিনোপল প্রেরণ করেন। তারা চতুর্দিক থেকে শহর অবরোধ করে ফেলে। মুসলমানগণ এ দৃঢ় আশা নিয়ে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেছিল যে, এ শহর জয় না করে ফিরে যাবে না। সুতরাং তারা কন্সটান্টিনোপলের নিকটবর্তী এক শহর তৈরী করে সেখানে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করে। এমন কি খাদ্য-শস্য ও চাষাবাদ শুরু করে। রোমানগণ মুসলমানদের এ পরিকল্পনা দেখে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু মাসলামা তাদের সন্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। আর তরবারীর সাহায্যে জোর পূর্বক নগরীর ফটক খোলার কঠোর ঘোষণা জারী করেন। তখন রোমান অন্য এক ফন্দি আঁটে। রোমান সাম্রাজ্যের আভ্যান্তরীণ অবস্থা তখন ভীষণ শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলা ও অরাজকতা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ বছরের মধ্যে ৬ জন শাসককে সিংহাসনে আরোহন করে পদচ্যুত হতে হয়েছে। তাদের অতি বিচক্ষণ ও দূরদর্শি শাসকের ভীষণ প্রয়োজন ছিল, যে এ দুঃসময় স্বদেশকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এদিকে মাসলামার বাহিনীর মধ্যে লিউন মাব'আশী নামে একজন বীর ও বিচক্ষণ নেতা ছিল, সে এ অভিযানের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে তার

e-ilm.weebly.com

মাধ্যমে সব খোঁজ-খবর আদান প্রদান করা হত। রোমানরা তার সাথে গোপনে এ চুক্তি স্বাক্ষর করল যে, যদি সে মুসলমানদের ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দিতে পারে, তাহলে তাকে রোমান শাসক হিসেবে মনোনীত করা হবে।

–আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া–১৭৫-৭৬ পৃঃ ৯ম খণ্ড।

একবার লিওন মাসলামার দূত হিসেবে কনস্টান্টিনোপল থেকে ফিরে এসে মাসলামাকে বলল, রোমানরা কনস্টান্টিনোপাল ছেড়ে যেতে রাজী আছে। তবে তাদের ইচ্ছা হল, মুসলিম বাহিনী অবরোধ তুলে দূরে সরে গেলে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মাল সামান নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবে। মাসলামা এ প্রস্তাব শুনে কালবিলম্ব না করে লিওনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। মুসলিম বাহিনী অবরোধ তুলে নিয়ে দূরে সরতে না সরতে তারা এক রাতের মধ্যে মুসলমানদের সব রশদ পত্র ও মাল সামানা সব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। এমন কি নগরীর প্রাচীরের দুর্বল অংশও তারা রাতের মধ্যে মেরামত করে নেয়। আর লিওনকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে তার নেতৃত্বে নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ে। তাছাড়া মুসলমানদের উপর নতুন করে আরো এক বিপদ অবতীর্ণ হয়। ঐ বছর অতিরিক্ত তুষারপাত হয়। যা অনারবাসীদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠে। তথাপি মুসলমানদের দৃঢ় মনোবলে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ দেখা যায়নি। তারা এতো কঠিন বিপদে পতিত হওয়া স্বত্ত্বে দুশমনদের মুকাবিলা করতে থাকে।

–আলবীদায়া ওয়া নিহায়া– ৯/১

সুলাইমান মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য স্বয়ং মারজে ওয়ারিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় সে ইহজগত ত্যাগ করে পরোযাত্রী হয়ে যান। আর হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. তার প্রতিনিধি মনোনীত হন। তিনি মাসলামাকে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং মুসলিম বাহিনী ব্যাপক অর্থ ও প্রাণ হানীর পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

খেলাফত লাভ

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক নিজের পর তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র আইয়ূবকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু তার জীবদ্দশায়ই আইয়ূব মারা যায়। সুলাইমান মৃত্যু শয্যায় পতিত হলে রজা বিন হাতের পরামর্শে স্বীয় চাচাতো ভাই হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি জানতেন, মারওয়ানের বংশধর হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযে মনোনয়নকে স্বেচ্ছায় মেনে নেবে না। এ কারণে সে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সম্পর্কে তার অন্তিম উপদেশ নামাকে সীল গালা করে রজা বিন হায়াতকে সোপর্দ করেন। তাকে এ উপদেশও দেন যে, আমার বংশধর সবাইকে সমবেত করে এ পত্রে যার নাম লেখা আছে, তার নামে বাই'আত গ্রহণ করে নেবে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মারওয়ানের বংশধরগণ নাম না জেনে খলীফার মনোনীত ব্যক্তির বাই'আত গ্রহণ করে নেয়।

e-ilm.weebly.com

সুলাইমানের মৃত্যু

১০ সফর ৯৯ হিজরীতে জুমার দিনে সুলাইমান বিন আবদুল মালিক মারজে ওয়ারিক নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। ২ বছর ৮ মাস তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

সুলাইমানের চরিত্র

সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের চরিত্র উত্তমগুণাবলীর দিক থেকে অধিকাংশ উমাইয়া খলীফাদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ও বক্তা ছিল। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদীতা, দ্বীনদারী, খোদাভীতি ও পরহেযগারীর প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ও শরী'আতের বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তার মূল লক্ষ্য ছিল।

তিনি সিংহাসনে আরোহন করে কারাবন্দীদের মুক্ত করার ঘোষণা জারী করেন। ফলে কারাগার সমূহ কয়েদী শূন্য হয়ে যায়। সর্বদা জনসাধারণের সাথে সদাচারণ করায় অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসকদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে দেন। তার এ সব উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে "মিফতাহুল খাইর" বা কল্যাণের কুঞ্জি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনি আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করার ঘোষণা করেন। তার অভিমতের উপর ভিত্তি করে ওয়ালীদ দামেশকের জামে উমাইয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর তার শাসনামলে মসজিদের নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। ৯৭ হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করে হেরেমের অধিবাসীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন। শুধু কুরাইশ বংশধরদের জন্য ৪ হাজার ভাতা নির্ধারণ করেন।

একবার তিনি তার সেনা ছাউনিতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, যখন পুরুষ গান গায়, তখন মহিলা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর তাতে ব্যভিচারের পথ উম্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর গায়কদের তবল করা হয়। তাদের উপস্থিত করা হলে তাদেরকে খাসি করে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষা করা হয় গানের উৎস কোথায়? পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, গানের কেন্দ্র হল পবিত্র নগরী মদীনা। তখন তিনি মদীনার শাসককে নির্দেশ দেন, সকল গায়কগায়িকাদের খাসী করিয়ে দেওয়া হোক। (১) আল বিদায়া ওয়ান নীহায়া–৯/১৮০।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার এত বেশী সতর্ক দৃষ্টি ছিল যে, তার ভাতা মাসলামাকে কনস্টান্টিনোপালের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে তার সাহায্যার্থে মারজে ওয়ারিক নামক স্থানে এসে ঘোষণা দেন– কনস্টান্টিনোপাল বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। সুতরাং তিনি নিজেই রাজধানী ছেড়ে মারজে ওয়ারিক নামক স্থানে জীবনকে তার মালিকের হাতে সোপর্দ করেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল, তিনি হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর মত পূতপবিত্র ব্যক্তিত্বকে স্বীয় জীবদ্দশায়

e-ilm.weebly.com

নিজের উপদেষ্টা ও মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্নে শিরিন রহ. বলেন- আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের উপর করুনা করুন। তার খিলাফতের সূচনা লগ্নে তিনি সময় মত নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ কঠোরতা আরোপ করেছেন। আর তার খিলাফতের সমাপ্তি হয়েছে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ঘোষণা দিয়ে।

তিন নেতার বিষয়

এ সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, তার শাসনামল মূসা বিন নসাইর, মুহাম্মদ বিন কাশেম ও কুতাইবা বিন মুসলিমের মত বিশ্ব বিজয়ী সেনাপতিত্রয়ের সাথে কঠোর অন্যায়-আচরণের কলংকে কলঙ্কিত। এতে সন্দেহ নেই যে, এ কলঙ্ক তিলক যতটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, বাস্তবতার দিক থেকে তা এত উল্লেখযোগ্য নয়।

কুতাইবা বিন মুসলিমের হত্যার সাথে যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, তাতে সুলাইমানে প্রতি কোনো অপবাদ আরোপ করা যায় না। ধমক দেওয়া সত্ত্বেও তা শাহী আদেশের শিষ্টারের সরাসরি পরিপন্থী ছিল। তিনি কুতাইবার সাথে নমনীয় আচরণ করেছেন। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হল, কুতাইবার তড়িঘড়ি ও আস্থাহীনতাই এ করুন পরিণতি টেনে এনেছে। বাকী থাকে মূসা বিন নুসাইর ও মুহাম্মদ বিন কাশেমের ব্যাপার।

স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, বড় বড় খ্যাতনামা বিজয়ীগণ অর্থ ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রতি সংযত থাকেন না। মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এর সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কিন্তু একজন ন্যায় পরায়ণ খলীফা কারো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য খেদমতের বিনিময়ে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা ছেড়ে দিতে পারেন না। সুলাইমান মূসার নিকট আফ্রিকার করের অবশিষ্ট অংশ দাবী করেন। আর যখন তিনি এ দাবী পূর্ণ করেনি, তখন তাকে নজর বন্দী করা হয়। এটা সম্পূর্ণ যুক্তি সংগত ব্যাপার যে, সুলাইমানের এ ব্যবস্থা গ্রহণে তার পূর্বোল্লেখিত উৎসাহের প্রতিশোধও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু আইনগত দিক থেকে যা করা হয়েছে, তা স্বস্থানে সঠিক হয়েছে।

এটাও স্পষ্ট যে, সাধারণ ঐতিহাসিকগণ সুলাইমানের এ হিসাব তলবের বিষয়ে যত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন, তা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের একান্তই মনগড়া মতবাদ। আল্লামা ইব্নে আছীর যিনি বাস্তব সত্যনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, তিনি শুধু বলেছন, সুলাইমান মূসার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে তিনি তাকে নজর বন্দী করেছেন এবং আর তার নিকট বিপুল পরিমান অর্থ দাবী করেছেন। মূসা ঐ নজর

e-ilm.weebly.com

বন্দী অবস্থায় সুলাইমানের সাথে হজ্জ আদায় করে ছিলেন। এ অবস্থায়ই ৮০ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া– ৯/১৭৪) তাছাড়াও মুসা যদিও নজর বন্দি ছিলেন কিন্তু তিনি সুলাইমানের আস্থাভাজন ও ছিলেন। সুলাইমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সুলাইমানের শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি কনষ্টান্টিনোপল অভিযান মুসার পরামর্শ মতই পরিচালিত হয়েছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, কনষ্টান্টিনোপল অভিযানের সমস্ত ব্যবস্থাপনা মুসা ইবনে নুসাইরের পরামর্শেই হয়েছিল, যখন তিনি পশ্চিমের দেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন । বিস্ময়ের ব্যাপারে হল, একদিকে ইব্নে কাসির রহ. এর মতে, সুলাইমান মূসার পরামর্শ অনুযায়ী ২ লাখ ৪০ হাজার মুসলমানের জীবনের বাজী লাগিয়ে দিয়েছেন। আর নিজের রাজধানী থেকে অনেক দূরে মারজে ওয়ারিক নামক স্থানে জীবনের বাকী অংশ পুরো করেছে। অপর দিকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মাষ্টার এইচ, পি, স্কাটের মতে সুলাইমানের দরবারে মূসার অবস্থান হল, মূসার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত ২লাখ দিনার জরিমানা করা হয়েছে। তারপরও তাকে এক পায়ের উপর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কখনো যেন দরবারে উপস্থিত না হয়। এরপর সে তার কৃতদাসের সাথে নিজ বাসস্থানের দিকে যা চলে যায়। সেখানে থেকে বেদুইনদের নিকট থেকে ভিক্ষা করে জীবন যাপন করে ছিলেন। এ ভাবে নিরুদ্দেশ অবস্থায় তার জীবনের সমাপ্তি হয়। আখবারুল উন্দুলুস– ১/১৪৯।

এখন বাকী রইল মুহাম্মদ বিন কাশেমের বিষয়। তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুলাইমান বনী আকীল তথা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বংশধরদের সাথে কঠোর নির্মম আচরণ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ এর কারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যেহেতু সুলাইমানের মনোয়নের বিরোধীতা করেছিল। তাই তিনি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থাকে যে, হাজ্জাজের বিরোধীতার কারণ কি ছিল? এই কথা অতি স্পষ্ট যে, সুলাইমান হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর দলের লোক ছিলেন। আর হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসন ব্যবস্থায় আকাশপাতাল ব্যবধান ছিল। হাজ্জাজের অভিমত ছিল, ইরাকীদের অব্যাহত কলহবিবাদ, রক্তপাত ও বিদ্রোহ তরবারীই দমাতে পারে। আর হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. মুসলমানদের রক্ত ঝরানো কখনো পছন্দ করতেন না। এ মতবিরোধ শুধু বাহ্যিকভাবে ছিল না বরং তা বাস্তবে পরিলক্ষিত হত। সুতরাং এ বিষয় অনেক বার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. এর বাদানুবাদ হয়েছে। সুলাইমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পরলোকগত হয়ে গেছেন। ফলে তার বংশধরদেরকেই তার

e-ilm.weebly.com

নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ব করতে হয়েছে। সুলাইমান বনী আকীলদেরকে যাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাশেমকে সালেহ বিন আব্দুর রহমানের হাতে সোপর্দ করা হয়। সালেহ হাজ্জাজের নিকট থেকে তার বংশধরদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন কাশেমকে হত্যা করে ফেলে। বস্তুতঃ হাজ্জাজ যত নিষ্ঠুর নির্মম অপরাধীই হোক না কেন, তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন কাশেমের মত বিখ্যাত নবযুবক সেনাপতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ.

হযরত উমর রহ. আবদুল আযীয বিন মারওয়ানের পুত্র ছিলেন। মাতা উম্মে আসেম। তিনি আসেম ইবনে উমর বিন খাত্তাব রাযি. এর কন্যা ছিলেন। ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন-যাপন করা সত্ত্বেও বিদ্যানুরাগী ও খোদাভীরু ছিল। বাল্যকালে কুরআন মজিদ হেফজ করেন। পিতা ছেলের স্বভাবজাত আগ্রহ-উদ্দীপনা চরিত্র দেখে বাল্যকালে মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস বিন সালেহ বিন কায়সানের নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন।

ছাত্র অবস্থায় একদিন তার জামাতের সাথে নামায পড়া বাদ পড়ে যায়। উস্তাদ তাকে জবাবদেহী করলে তিনি বলল, দুধমা আমার কেশ বিন্যাস করছিলেন। উস্তাদ সালেহ তৎকালীন মিশরের শাসক আবদুল আযীযকে এ ঘটনা অবহিত করেন এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আবদুল আযীয তাৎক্ষণিকভাবে মিশর থেকে এক দূত পাঠান। তিনি উমর বিন আবদুল আযীযের সাথে কোনো কথা না বলে তার মাথার চুল কেটে ফেলেন।

আবদুল আযীয একবার হজ্জে এসে পবিত্র মদীনা নগরীতেও হাজিরা দেয়। সালেহ বিন কায়সানকে জিজ্ঞেস করেন, শিশুর কি অবস্থা? সালেহ বলল, আমি উমর থেকে বেশী কোনো শিশুর অন্তরকে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে দেখিনি। সালেহ বিন কায়সান ছাড়াও হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. মদীনার অন্যন্য নেককার খোদাভীরু আলেমদের নিকট থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। যেমন হযরত আনাস বিন মালিক, সায়েব বিন ইয়াযীদ, ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ সালাম, উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. প্রমুখ খ্যাত নামা সাহাবায়ে কিরামও তাবেঈনগণের পাঠে হাজির হয়েছেন। জন্মগত যোগ্যতা ও আকাবিরে উম্মাতের সান্নিধ্য লাভে সুফলে তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, তাবেঈনদের মধ্যে উমর বিন আবদুল আযীয রহ. ব্যতীত কারো অভিমত হুজ্জাত বা দলীল হতে পারে না। শিক্ষাবস্থায় তিনি উচ্চ সাহসী ও সততায় উচ্চাকাংখী ছিলেন। তখনই তিনি উমাইয়া শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফতের রাশেদার আলোকে রূপান্তর করার আশাবাদী ছিলেন। দাউদ বিন আবু হিন্দ বলেছেন, একদিন উমর বিন আবদুল আযীয রহ. মসজিদের নববীতে

e-ilm.weebly.com

প্রবেশ করার সময় জনৈক ব্যক্তি বলল– "তাকে দেখুন! তিনি কুরআনও সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছে। আর সুন্নাতে ফারুকীর আনুগত্য করার দৃঢ় আশা পোষণ করেছে। অতি খুশির কথা!" দাউদ বলেন, আল্লাহর কসম ঐ নবযুবক যে সলংকল্প করেছে, তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছে।

যৌবনে পদার্পন করার পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কন্যা ফাতেমাকে বিবাহ করেন। আর অনেক উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি খিলাফতের মসনদে আরোহন করার পর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হন নি। ওয়ালীদ যখন তাকে মদীনার গভর্নর মনোনীত করেন, তখন তিনি শর্তারোপ করেন যে, তিনি অন্যান্য শাসকদের মত অত্যাচার করতে পারবেন না।

খিলাফতের বাই'আত অনুষ্ঠান

৯৯ হিজরীর ১০ সফর সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু হয়। সুলাইমান যদিও রজা বিন হায়াতের মাধ্যমে হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের বাই'আত গ্রহণ করান, তথাপি তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বনী উমাইয়ার বংশধরগণ অতি সহজে উমর বিন আবদুল আযীয রহ. খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হতে দেবে না। এ কারণে রজা সুলাইমানের মৃত্যুর খবর গোপন রাখেন। তারপর তিনি মারজে ওয়ারিকের জামে মসজিদে উমাইয়ারা বংশের লোকদের সমবেত করে সুলাইমানের মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্কে বাই'আত গ্রহণ করেন। যখন সকলে দ্বিতীয় বার বাই'আত গ্রহণ করে নেয়, তখন রাজা সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের বাহু ধরে তাকে মিম্বারে উপরে বসিয়ে দেন।

যখন হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের খিলাফতের মসনদে আরোহনের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন দু'বার "اِنَّا لِلّٰه" এর অদৃশ্য আওয়াজ মসজিদে প্রতিধ্বনিত হয়। এ কারণে উমর বিন আবদুল আযীয রহ. "اِنَّا لِلّٰه" পাঠ করে খিলাফতের বিরাট বোঝা নিজের ঘাঁড়ে চাপিয়ে নেন। আর হিশাম বিন আবদুল মালিক এজন্য ইন্না লিল্লাহ পড়ল যে, পূর্ব মনোনীত সিংহাসনে আরোহন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

অবশেষে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. মিম্বারে আরোহন করে নিম্নোক্ত ভাষণ দান করেন।

"বেরাদারানে মিল্লাত! মানবীয় প্রবৃত্তির দুর্বলতা থেকে আমিও মুক্ত নই। আমার ভেতরেও এক লোভী অন্তর রয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হল, সে যদি একবার কোনো কিছু লাভ করে তাহলে পরে আরো ভালোভাবে লাভ করার প্রত্যাশী হয়। খিলাফতের মসনদে আরোহন করার পর সে তার চেয়ে আরো ভালো কিছু লাভ করার চেষ্টা করে। আর তা হল, জান্নাত। আপনাদের নিকট আমার আবেদন হল, আপনারা আমার ইচ্ছা পূরণে আমাকে সাহায্য করবেন।"

e-ilm.weebly.com

মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তার জন্য রাজকীয় বাহন তৈরী করে রাখা হয়। আর খিলাফতের সিংহাসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আড়ম্বর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। অশ্ব ও খচ্চরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এসবের প্রতি তার দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কেন আনা হয়েছে? সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ বলল, রাজকীয় সওয়ারী। তিন বলল, না! আমার এ সবের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার নিজের ঘোড়াই আমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আড়ম্বর শোভা যাত্রা ভেংগে দেওয়া হয়।

তিনি তার অশ্বের উপর আরোহন করে তার বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ আবেদন করলেন, হযরত মনজিলে খিলাফতে তাশরীফ নিন। তিনি বলল, না। ওখানে সুলাইমানের পরিবারের লোকজন রয়েছে। তাদের কষ্ট হবে। আমার বাসভবনে থাকাই আমার জন্য শ্রেয়। –ইব্নে আছীর– ৫/১৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া– ৯/১৮৪

বাই'আত গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তার গোলাম জিজ্ঞেস করল– হযরত! আপনি এত বেশী চিন্তা মগ্ন হয়েছেন কেন? তিনি বলল, আমার চিন্তা অবান্তর নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার এমন কোনো ব্যক্তি এরূপ নাই, যার হক আদায় করা আমার দায়িত্বে ন্যাস্ত নয়। চাই সে তা তলব করুক বা না করুক।

অতঃপর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিককে বললেন, আমার জীবন যাপনের সাথে তুমি একমত হতে পার কিনা ভেবে দেখ! নতুবা তোমাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হল। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে স্বেচ্ছায় পিত্রালয়ে চলে যেত পারো। পূণ্যবতী সতী সাধবী স্ত্রী এ অভিমত শুনে কান্নার বিজড়িত কণ্ঠে বলল, আমি সর্বাবস্থায় আপনার সাথে জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক।

শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন

ইতোপূর্বে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. সৎ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তাঁর সৎ উদ্দেশ্য সমূহ পূর্ণ করার সময় এসে গেছে। সুতরাং তিনি সকল প্রাদেশিক শাসকের নামে নিম্নোক্ত ঘোষণা জারি করে তাদেরকে স্বীয় প্রত্যয়ের কথা জানিয়ে দেন।

"হামদ-সালাতের পর। কথা হল, সুলাইমান আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে একজন সৎ নেককার ব্যক্তি ছিলেন, যাকে খিলাফতের অপূর্ব নিয়ামতে ভূষিত করা হয়েছিল। এখন তার ইনতিকাল হয়ে গেছে। আর আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। এটা অতি কঠিন দায়িত্ব। যদি আমি স্ত্রী ও অর্থ-সম্পদ জড়ো করার সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে আমার চেয়ে অন্য কারো জন্য ততটা সহজ হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমি খিলাফতের দায়িত্বের হিসাব নিয়ে ভীষণ ভীত হয়ে আছি।

e-ilm.weebly.com

যদি আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহলে হয়ত মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।"

এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের আঞ্চলিক বিশেষ অবস্থার প্রতি আলোকপাত করে বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেছেন। সুলাইমান বিন আবু সারারী নামে এ আদেশনাম জারী করেছেন–

"তুমি মূসাফিরখানা নির্মান করো। এ পথ দিয়ে যতগুলো মুসলমান যাতায়াত করবে, তাদের একদিন এক এক রাতের পানাহারের ব্যবস্থা করবে। আর বিনামূল্যে তাদের বাহনের পানাহারের ব্যবস্থা করবে।"

আবদুল হামীদের নামে এ ঘোষণা পত্র প্রেরণ করেন–

"পূর্ববর্তী যুগে কুফাবাসীদেরকে অসৎ নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসকদের হাতে অনেক নির্যাতন ও যান্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। তাদের সাথে অনেক কঠোর আচরণ করা হয়েছে। স্মরণ রেখ, দ্বীনের মূল ভিত্তি ইনসাফ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। তোমাদেরকে সর্বদা নিজের কৃতকর্মের হিসাব দানের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তোমরা এতে সামান্যতম গোনাহের বোঝা বহনকারী হয়ো না। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনাবাদি জমি থেকে আবাদি জমির মত খাজনা আদায় করবে না। তাদের থেকে সাধ্যমত খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করবে। তবে অনাবাদি জমি আবাদ করার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আর আবাদি জমি থেকে শুধু খাজনা আদায় করবে, তাতেও নমনীয়তা ও অনুগ্রহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। প্রজাসাধারণের নিকট থেকে ট্যাকশালের ব্যয়, নববর্ষ, উৎসব দিনের উপহার, কুরআন মাজীদের বিনিময়, পানির কর, বাড়ীঘরের ভাড়া ও বিবাহের কর আদায় করবে না। সে যে কোনো প্রদেশের লোক হোক, যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তার নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করবে না।"

শাসন কর্তাদের জবাবহীতা

তিনি শুধু শাসন কর্তাদের নামে ঘোষণা পত্র জারী করে থেমে থাকেননি বরং শাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে কঠোর জবাবদেহীতার ব্যবস্থা রাখেন।

ইয়াযীদ বিন মহাল্লাবের জিম্মায় বাইতুল মালের বিপুল অর্থ ফেরত দানের আদেশ করেছেন। তিনি ইয়াযীদকে রাজধানীতে আসার আদেশ দান করেন। ইয়াযীদ বিন মহাল্লিব তা পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে তিনি ইয়াযীদকে সুলাইমানের যুগের অঙ্গীকারনামা দেখান। যাতে সে স্বয়ং ঐসব অর্থ পরিশোধের অংগীকার করেছিল। তখন সে বলল, আমার ও সুলাইমানে ব্যাপার এক ও অভিন্ন ছিল। আমি আমার বিরোধীতাকারীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা লিখে দিয়েছি। নতুবা মূলতঃ আমার জিম্মায় বাইতুল মালের অর্থ ছিল না। হযরত উমর

e-ilm.weebly.com

বিন আবদুল আযীয রহ. তার জবাব অগ্রাহ্য করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। ইয়াযিদের পুত্র মুযাল্লিদ পিতার কারারুদ্ধ হওয়ার খবর শুনে দরবারে খিলাফতে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনাকে উম্মাতের খলিফা মনোনীত করে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তথাপি আমরা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা থেকে বঞ্চিত হব কেন? উত্তম হল, কিছু ছাট করে এ বিষয় মীমাংসা করে ফেলা। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি কড়িও অনাদায়ী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার পিতাকে ছাড়ব না। এটা মুসলিম উম্মাহর হকের ব্যাপার। ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন সে জানতে পারল যে, তার সময় শেষ হয়ে গেছে। আর খিলাফতের দায়িত্বে ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিকের উপর ন্যাস্ত হচ্ছে। তার সাথে হাজ্জাজের বংশধরদের সঙ্গে কঠোর আচরণের কারণে বিরোধীতা ছিল। তাই সে কারাগার থেকে পালিয়ে বসরায় চলে যায়। সে হযরত উমন বিন আবদুল আযীয রহ. এর নিকট নিম্নোক্ত ভাষায় পত্র প্রেরণ করেছিল– আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনার জীবিত থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতাম, তাহলে আমি কখনো আপনার আদেশ অমান্য করতাম না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার পর ইয়াযীদ খলীফা হবে। আর তখন সে আমার গর্দান উড়িয়ে দেবে।"

খোরাসানের শাসনকর্তা জাররাহ বিন আবদুল্লাহর সম্পর্কে তাঁর নিকট অভিযোগ করা হল– সে নও মুলসলিমদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করে আর বলে, এরাও জিজিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মুসলমান হচ্ছে; পরকালীন নাজাতের আশায় মুসলমান হচ্ছে না। তিনি তাকে এ মর্মে সতর্ক করে পত্র প্রেরণ করেন–

হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুস্পষ্ট দ্বীনের আহবানকারী বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জিজিয়া কর আদায়কারী করে পাঠানো হয়নি। যে ব্যক্তি নামায আদায় করে তোমার তার নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করার কোনো অধিকার নেই।"

জার্‌রাহ এই আদেশ পালন করার সাথে সাথে মানুষ দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করে। এই অবস্থা দেখে দুষ্টু দরবারী লোকজন জার্‌রাহকে কুপরামর্শ দেয় যে, এসব লোকদের খাত্‌না করিয়ে দিয়ে তাদের একাগ্রতা পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। জারাহ এ সম্পর্কে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. অভিমত জানার আবেদন পেশ করে। তিনি প্রতি উত্তরে বলল, "আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইসলামের প্রতি আহবানকারী বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। খাত্‌না কারী বানিয়ে প্রেরণ করেননি। অবশেষে তিনি জার্‌রাহকে পদচ্যুত্য করেন। –আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া– ৯/১৮৮; ইব্‌নে আছীর– ৫/১৯।

e-ilm.weebly.com

শুধু এ পর্যন্তই শেষ নয় বরং তিনি তার পূর্ববর্তী শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতেন। যাদের জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে পদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা কিংবা সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা তাদেরকে ফেরৎ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে মুসলমান ও জিম্মির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।

সমরকন্দ বাসীগণ তার নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে কুতাইবা বিন মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে যে, কুতাইবা ন্যায় পরায়নতার সাথে সমরকন্দ দখল করেনি। সুতরাং আমাদের সাথে ইনসাফ করা হোক। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. সুলাইমান বিন আবু সারাহীকে পত্র লিখেন, সমরকন্দবাসী কুতাইবা বিন মুসলিমের সমরকন্দ দখলকে অবৈধ বলছে। তুমি এ বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করার জন্য কাজী নিযুক্ত করো। সে বিশ্বস্ততার সাথে সাক্ষীদের সাক্ষী গ্রহণ করে এ বিষয়ে মীমাংসা করবে। যদি সমরকন্দবাসীদের পক্ষে মীমাংসা হয় তাহলে মুসলমানগণ শহর ছেড়ে দিয়ে তাদের পুরাতন সেনা ছাউনিতে ফিরে যাবে। নতুন করে এ সমস্যা নিরসন করা পর্যন্ত তারা ঐ সেনাচাউনিতেই থাকবে।

সুলাইমান খলীফার আদেশ পালন করে যমির নিব হাজিরকে কাযী মনোনীত করেন। তিনি বিশ্বস্ততাও ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে তদন্ত করে সমরকন্দবাসীদের অভিযোগ্য সত্য বলে প্রতিবেদন পেশ করেন। সুতরাং তিনি নির্দেশ দেন, মুসলমান শহরের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে অদূরে নিজেদের সেনা ছাউনীতে চলে যাবে। পরে তরবারীর সাহায্যে হোক বা সন্ধির মাধ্যমে হোক শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করবে। সমরকন্দবাসী মুলমানদের এ ন্যায়পরায়নতা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। তারা বললে। আমরা গৃহীত ব্যবস্থায় ভীষণ সন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা এরূপ অপূর্ব ইনসাফ প্রিয় জাতির সাথে বিরোধে জড়াতে রাজী নই।

ফাদাক দখল মুক্ত করে দেওয়া

ফাদাক খাইবরের একটি গ্রাম। খাইবার বিজয়ের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওটাকে خالصه বা তাঁর নিজের জন্য ঘোষণা করেন। এর আয় দ্বারা তাঁর নিজের ও আহলে বাইতের হাশেমী বংশধরদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত লাভের পর হযরত ফাতেমা রাযি. পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে হযবত আবু বকর রাযি. এর নিকট নিজের অংশ দাবী করেন। হযরত আবু বকর রাযি. তা দিতে অস্বীকার করে বলল– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী নীতি প্রবর্তিত হয় না। তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আয় যে কাজে ব্যয় করেছেন, তা বহাল থাকবে।

সুতরাং ফদকের আয় ঐ সব খাতে ব্যয় হতে থাকে। পরে মারওয়ান বিন হাকাম জোরপূর্বক তা নিজ পরিবারের জন্য দখল করে নেন। হযরত উমর বিন

e-ilm.weebly.com

আবদুল আযীযের সময় পর্যন্ত তা মারওয়ানের বংশধরদের জায়গীর হিসেবে বহাল থাকে। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. খিলাফতের মসনদের আরেহন করার পর মারওয়ানের বংশধরদের সমবেত করে ফাদকের সঠিক বিবরণ তাদেরকে অভিহিত করান। তারপর বলল, আমি এটাকে হাশেমী বংশধরদের দখলে দেব না। কেননা হযরত সিদ্দীক রাযি. তার খিলাফতকালে এরূপ করেননি। কিন্তু আমি এটাকে ঐ খাতের জন্য নির্ধারন করব, যাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. এর যুগে ব্যয় হত।

জায়গীর সমূহ ফেরৎ দান

তিনি তাঁর কৃতদাস মুজাহেমকে বললেন, আমাকে পূর্ববর্তী খলিফাগণ কতিপয় জায়গীর দান করেছেন। কিন্তু না প্রদান কারীদের এগুলো দেওয়ার অধিকার ছিল, আর না গৃহীতাদের এগুলো নেওয়ার অধিকার ছিল। আমি তাদের অধিকার তাদের ফেরত দিতে ইচ্ছুক। মুজাহেম বলল, আপনার সন্তানদের জন্য কোনো বন্দবস্ত করেছেন কি? এর পর তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে শুরু হয়। অতঃপর বলল, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করে রেখে যাচ্ছি। মুজাহেম নিজের কল্যাণ কামিতা প্রকাশের লক্ষ্যে খলীফার পুত্রের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলল, আমি তাকে এ কাজ করতে বারণ করে দিয়েছে। শাহযাদা আব্দুল মালিকও পিতার রংয়ে রঞ্জিত ছিলেন। তিনি মুজাহেমকে বললেন, তুমি খলীফার সাথে উত্তম উপদেষ্টা নও। তারপর শাহযাদা পিতার নিকট গিয়ে বললেন, মুজাহেম আমাকে আপনার মনোভাবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। আপনি তা পূর্ণ করতে কালবিলম্ব করছেন কেন? হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. বলল, সন্ধ্যার মধ্যে তা হয়ে যাবে। শাহযাদা বলল, তাড়াতাড়ি করুন। আপনি কি জানেন যে, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবেন কি থাকবেন না? যদি জীবিত থাকেনও তাহলে যে আপনি আপনার সৎ ইচ্ছায় বহাল থাকবেন, তারই নিশ্চয়তা কি?

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. পুত্রের কথা শুনে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা কার্যকর করেন। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আদায় করছি যে, তুমি আমাকে এমন সুপুত্র দান করেছ, যে দ্বীনের কাজে আমার সাহায্যকারী হয়েছে। –ইব্নে আছীর– ৫/২৪।

হযরত আলী রাযি.কে গালাগালি করা বন্ধ ঘোষণা

কিন্তু তাঁর সংস্কার সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার যা তাঁর কৃতিত্বের পাতায় সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে, সেটি হযরত আলী রাযি. এর শানে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা বন্ধ ঘোষণা। দীর্ঘদিন থেকে এ ধারা প্রচলিত হয়ে আসছিল। উমাইয়া খলীফাগণ ও তাদের মনোনীত শাসকগণ জুমার খুত্বায় হযরত আলী রাযি.এর উপর অভিশম্পত বর্ষণ করত। তাঁর সম্মানিত পিতা

e-ilm.weebly.com

আবদুল আযীয ও মিশরের প্রাদেশিক গভর্ণন থাকা অবস্থায় এ কষ্টদায়ক জোরপূর্বক চাপানো দায়িত্ব পালনে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তার মুখ ও অন্তর এক ছিল না, বিধায় এ সময় তার কণ্ঠরূদ্ধ হয়ে যেত। পুত্র পিতার এ অবস্থা অনুভব করে এক দিন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলল, বৎস! আমাদের আনুগত্যকারী লোকজন হযরত আলী রাযি. এর মর্যাদা জেনে গেলে, তারা আর কেউই আমাদের আনুগত্য করবে না। তারা সকলে হযরত আলী রাযি. এর বংশধরদের হিতাকাংখী হয়ে যাবে।

তারপর তিনি মদীনা নগরীতে অবস্থান কালে উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা, ইবনে মাসউদ রাযি. যাদেরকে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. বেশী সম্মান প্রদর্শন করতেন, তাঁরা বলল– মহান আল্লাহ তা'আলা বদর ও বাই'আতে রিযওয়ানে যোদগাদানকারী সাহাবায়ে কিরামের উপর সন্তুষ্টির ঘোষণা করেছেন। হযরত আলী রাযি. তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন কি? যদি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মুকাবিলায় তোমাদের অসন্তুষ্টির কি অর্থ হতে পারে?

তাঁদের এ অভিমত হযরত উমর আবদুল আযীয রহ. এর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি বলল, আমি এ গর্হিত কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করছি। পরবর্তী কালে তিনি খিলাফতের মসনদে আরোহন করে শাসন কর্তাদের নিকট কঠোর ভাষায় ঘোষণা জারী করেন, খুত্বা পাঠে হযরত আলী রাযি. কে গালিগালাজ করা চিরদিনের জন্য বন্ধ ঘোষিত হল। এর স্থানে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে হবে।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ كُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দেন, ন্যায়বিচার, পূণ্য ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কথা ও অবাধ্যতা থেকে, তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা ধ্যান করো। (সূরা নাহল-৯০)

আভ্যন্তরীণ ও খারিজিদের বিদ্রোহ

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তাঁর মনোযোগ ছিল আভ্যন্তরীণ নিরপত্তা ও শান্তি শৃংঙ্খলা স্থাপন করে দুর্বলতা দূর করে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে তাঁর খিলাফত কালে উল্লেখযোগ্য কোন বিজয় অর্জিত হয়নি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক কনস্টান্টিপোল জয়ের উদ্দেশ্যে বিরাট এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুশমনদের প্রতারণার কারণে তারা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। হযরত

e-ilm.weebly.com

উমর বিন আবদুল আযীয রহ. বিপুল পরিমান রসদপত্র ও বাহন প্রেরণ করে তাদের ফেরৎ নিয়ে আসেন।

৯৯ হিজরীতে তুর্কীগণ আজার বাইজানে হামলা করে অসংখ্য নিরাপরাধ মুসলমানকে হত্যা করে। তিনি হাতেম বিন নুমান বাবলীকে তাকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। হাতেম তাদের অধিকাংশ লোককে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেয়। আর যারা জীবিত ছিল, তাদেরকে গ্রেফতার করে রাজধানী অভিমুখে পাঠিয়ে দেন।

১০০ হিজরীতে তিনি তারিন্দার মুসলমানদের নতুন বসতিকে মালতিয়ায় স্থানান্তরের আদেশ করেন। তারিন্দাহ মালতিয়া থেকে তিন মাইল দূরে রোম অবস্থিত ছিল। ৮৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মালেক তা জয় করেছিলেন। তখন মুসলমানগণ ওখানে বসতি স্থাপন করে। জাজীরা থেকে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য এখানে এক দল সৈন্য বাহিনী আগমন করে। কিন্তু শীত মৌসুমে তুষারপাতের সময় তারা ফিরে চলে যেত। হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের রহ. এ আয়োজন অপ্রতুল মনে করে মুসলমানদেরকে তারিন্দার পরিবর্তে মালাতিয়ায় বসতি স্থাপন করার নির্দেশ দেন। আর তারিন্দাহ জনশূন্য হয়ে যায়।

ঐ বছর খারিজীদের বিদ্রোহ মাথা ছাড়া উঠে। তারা সারা ইরাকে বিশংঙ্খলা সৃষ্টি করে। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. কুফার শাসক আবদুল হামিদকে খারিজীদেরকে নমনীয়তা ও কোমলতার সত্যকে গ্রহণ করে বিশৃংঙ্খলা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য উদ্ধুদ্ধ করার আদেশ করেন। কিন্তু খারিজীরা তার কথায় মনোযোগ না দিয়ে অব্যাহত বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। তাই আবদুল হামিদ বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে খারিজীদের নিকট পরাজিত হন। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. তখন জাজিরার শাসক মাসলামা বিন আবদুল মালেককে খারিজীদের দমন করার নির্দেশ দেন। মাসলামা তার নির্দেশ মত সৈন্য প্রেরণ করে খারিজীদের পরাজিত করে ফেলেন। এর পর হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. খারিজীদের নেতা বুস্তামের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন–

"আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছ কেন? যদি তোমরা দ্বীনের সাহায্যার্থে এ কাজ করতে বাধ্য হও তাহলে ঐ কাজের উৎসাহে আমার কোনো দুর্বলতা ও অলসতা নেই। এসো, আমরা উভয়ে একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয় মীমাংসা করে সত্যকে সততার সাথে গ্রহণ করি।

বুসতাম তার দু'জন প্রতিনিধিকে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর নিকট প্রেরণ করে। তিনি তাদের প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিয়ে তাদের

e-ilm.weebly.com

ভ্রান্ত আকাঈদ স্পষ্ট করতঃ তাদেরকে আশ্বস্ত করে দেন। কিন্তু যখন বুস্তামের প্রতিনিধিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করল– আপনি আপনার পর ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের মনোনয়ন সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি জবাবে বলেলেন, আমি তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করি নি। তখন বুস্তামের প্রতিনিধিদ্বয় বলল, যদি আপনি তাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর আমানতদার মনে না করেন তাহেল তা স্পষ্ট ঘোষণা করছেন না কেন? এ অভিমত শুনে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন এবং তিন দিনের অবকাশ চান। কথিত আছে, বনী উমাইয়াদের ভয় ছিল হয়ত বা তিনি তাদের বংশধরদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করবেন। এ কারণে তার খাবারে গোপনে বিষ মিশিয়ে দেয়। তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার উনতিকাল হয়ে যায়। –আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া– ৯/১৮৭

ওফাত

২৫ রজব ১০১ হিজরীতে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. এক বর্ণনা মতে বিষ প্রয়োগ করায় দীরে সাময়ান নামক স্থানে তার ইনতিকাল হয়। মৃত্যু যন্ত্রণা বেশী হলে জনৈক ব্যক্তি বলল– হযরত! ঔষধ সেবন করুন। তিনি বলল, ভাই! যদি আমার বিশ্বাস হয় যে, শুধু নিজের কান স্পর্শ করে; আমি মুহূতেই সুস্থ হয়ে যাব, তাহলেও আমি তাও করতে রাজী নই। আপন প্রভূর দয়া-অনুগ্রহ থেকে আমার নিকট প্রিয় কোন বস্তু নেই। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৩৯ কিংবা ৪০ বছর হয়েছিল। তিনি দু'বছর ৫ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের চরিত্র

রাজ্য শাসন, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, খোদাভীতি, অল্পেতুষ্টি, ইবাদত ও সাধনায় আপনি যদি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে চান, তাহলে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর চরিত্র অধ্যায়ন করুন।

তিনি প্রাচুর্য্য ও অর্থ-সম্পদের মাঝে লালিত পালিত হয়েছেন। তথাপি তিনি স্বীয় বক্ষকে নবুওয়াতের জ্ঞানের ভাণ্ডার বানিয়েছিলেন। আর নিজের অন্তরকে আখিরাতের সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করা পছন্দ করেছেন।

হতে পারে তিনি হযরত আবু যর গিফারী রাযি. এর মত দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ে দিতেন অথবা ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. এর মত সিংহাসনকে পরিত্যাগ করে দিতেন। কিন্তু যদি এরূপ হত তাহলে ইসলামের ইতিহাসে এ সোনালী অধ্যায় শূন্য হয়ে পড়ত। যা ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার মত বৃহৎ তিন মহাদেশে বিস্তৃত এক সংস্কৃতিশীল, রুচিশীল সরকার প্রধানদেরকে খিলাফতে রাশেদার আকৃতিতে পেশ করছে এবং বলতে পারছে, সরকার পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কি ছিল।

তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অযাচিতভাবে লাভ করেন নি। তিনি পূর্বে থেকে এ বিষয়ে নিজেকে তৈরী করেছেন। আর সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও খোলাফায়ে

e-ilm.weebly.com

রাশেদীনের অনুসৃত রীতি নীতির আলোকে আলোকিত করে কায়সারীয়াত ও কিসরাইয়াতের ধারা থেকে মুক্ত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

তিনি যৌবনে পর্দাপন করার পর তার পিতা তাকে দামেশক থেকে তার কর্মস্থল মিশরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু তিনি বলল, হে পিতা! এরূপ হতে পারে না। আমাকে মিশরে যাওয়ার স্থলে মদীনায় যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। আমার ইচ্ছা হল, আমি ওখানে অবস্থান করে উলামা ও ফিকাহ্ বিদদের সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে উপকৃত করব। পিতা তাকে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দেন। উৎসাহ-উদ্দিপনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সশ্রম সাধনাকে একত্রিত করে তিনি নিজেকে ঐ স্তরে উপনীত করেছেন, তাঁর উপর যদি শাসনকার্য পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব অর্পন করা না হত, তাহলে জ্ঞানে শীর্ষ স্তরে উপনীত হতে পারতেন। আবু নছর মাছানী বলেন, আমি একদিন সুলাইমান বিন ইয়াসারকে উমর বিন আবদুল আযীযের বাসস্থান থেকে বের হয়ে আসতে দেখি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তাকে বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন? সুলাইমান বললেন, হাঁ। কিন্তু আল্লাহর কমস! তিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী।

মুজাহিদ বলেছেন, আমি উমর বিন আবদুল আযীযকে পড়ানোর জন্য এসেছি। কিন্তু তার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করে আমি নিজেকে ধন্য করে নিয়েছি।

মাইমুন বিন মেহরান বলেন, উমর বিন আবদুল আযীযের সামনে সমসাময়িক উলামায়ে কিরামের অবস্থান হল শিষ্যদের মত।

লাইছ বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি হযরত ইবনে আব্বাস ও ইব্নে উমর রাযি. এর দরসে অংশ গ্রহণ করেছেন– "আমি যে বিষয়ে আলোচনা ও গবেষনা করেছি, উমর বিন আবদুল আযীযকে ঐ বিষয়ে উসূল ও যৌগিক বিষয়ে সব চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ পেয়েছি।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এ অপূর্ব সম্পদকে তিনি কেন কি উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করেছেন? দাউদ বিন আবু হিন্দের উল্লেখিত পূর্ববর্তী বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে, এ সব কিছু এ জন্যই করেছেন, যাতে সুন্নাতে ফারুকীকে পুনর্জীবিত করা যায়। আর খিলাফতে রাশেদার ভেংগে পড়া ভিত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

খিলাফতে রাশেদার মূল ভিত্তি "মজালিশে শুরু" অর্থাৎ ইসলামী আহকামের রীতি নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব যে ব্যাক্তির হাতে ন্যাস্ত হবে, তাকে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী মনোনীত করা হবে। অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এর বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক খলীফাই তার শাসনামলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতেন। স্বয়ং হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের ভাষণও ঐ পদ্ধতিতে হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম ঐ বুনিয়াদকে সহীহ শুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি এ উদেশ্যে মুসলমানদের সমবেত করে ঘোষণা করেছেন,

e-ilm.weebly.com

"হে লোক সকল! আমার আকাংখা ও সাধারণ মুসলমানদের অভিমত ছাড়াই আমার উপর খিলাফতের দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছে। আমার আনুগত্যের যে শৃংঙ্খল জোরপূর্বক তোমাদের গাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি নিজে তা ছিন্ন করে ফেলছি। আপনাদের যাকে ইচ্ছা তাকে খলিফা মনোনীত করতে পারেন। তার ভাষণে চতুর্দিকে গুঞ্জন শুরু হয় যে আমরা আপনাকে খলিফা মনোনীত করলাম। আমরা আপনার খিলাফতকে সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করছি। এর পর তিনি তার ভাষণে তার খিলাফত পরিচালনার বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দেন। আমল ব্যতীত কথা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না। ফলে তিনি উম্মাতের সংশোধনের জন্য স্বীয় সত্ত্বাকে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিককে জনৈক কবির কবিতার ছন্দ অনুযায়ী এক শাহেন শাহের কন্যা, কয়েক শাহেন শাহের সহোদরা আর এক শাহেন শাহের স্ত্রী, তার প্রতিটি অলংকার এক এক করে বায়তুল মালে জমা করেছেন। স্ত্রী ফাতেমাকে তার পিতা আবদুল মালিক একটি মূল্যবান হীরা উপহার দিয়েছিলেন, যা তার অতিপ্রিয় ছিল। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. তাও রাখতে দেননি। আর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এ হীরা বায়তুল মালে জমা করে দাও অথবা আমাকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। খিলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার পূর্বে তার অর্থ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের ঘাটতি ছিল না। যখন মদীনার গভর্নর পদে মনোনীত হন তখন তার নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ৩০ উটের বোঝা হয়। উত্তম থেকে উত্তম জামা পেশ করা হলে বলতেন, উত্তম তবে তত ভালো নয়। কিন্তু যখন খলীফা হিসেবে জাতির সামনে উপস্থিত হন, তখন জীবন যাপন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। মোটা বাপড় বা কম্বলের জামা পর। ছিড়ে যেতেন আর তালি লাগানো হত।

অন্তিম সময় পরিহিত জামা যখন বেশী ময়লা হয়ে যায়, তখন মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক বোনকে বলল, দেখার জন্য লোকজন আসছে। এ জামা পরিবর্তন করে অন্য জামা পরিয়ে দাও। বোন এ কথা শুনে নীরব হয়ে যায়। ভাই যখন দ্বিতীয় বার ঐ কথা বললেন, তখন বোন বলল, অন্য জামা যে নাই, পাল্টাব কিভাবে?

আহারের জন্য মসূরের ডাল নির্ধারণ করা ছিল। তাতে অন্তরের কোমলতা আসে। আর চোখের অশ্রুর পরিমান বেশী হয়। বাঁশের তিন কাঞ্চির উপর মাটির একটি পাত্র। এটা ছিল তার চেরাগ।

তাঁর এ সহজসরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের উপর আবু সুলাইমান দাবারাই বলেছিল, উমর বিন আবদুল আযীয উত্তম তাবেঈন। ওয়ায়েস কুরলী থেকে খোদা ভীতিতে অগ্রসর হয়ে গেছেন। তিনি এর কারণ উল্লেখ করেছেন, উমর বিন আবদুল আযীযের নিকট দুনিয়া ভোগের সুযোগ এসেছিল। তিনি তাকে লাথি

e-ilm.weebly.com

মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর ওয়ায়েস কুরনীকে দুনিয়ার মুকাবিলা করতে হয়নি।

অনুরূপভাবে আবদুল মালিক বিন দীনার থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন– মানুষ বলে, মালিক খোদাভীরু। মালিকের খোদা ভীতি কি? খোদা ভিরু তো উমর বিন আবদুল আযীয। তার সামনে দুনিয়া উন্মুক্ত হয়ে এসেছে, আর তিনি দুনিয়াকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিনয়-নমনীয়তা ও অন্তরের কোমলতার অবস্থা ছিল এমন যে, যখনই মৃত্যুর আলোচনা আসত তখনই তার সমস্ত দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেত। একবার তার সামেন জনৈক ব্যক্তি এ আয়াত তিলাওয়াত করল–

وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِيْنَ

তখন তিনি এত বেশী কান্না করেন যে, তাতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে তিনি উঠে গৃহে চলে যান।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বলেন, তিনি ইশার নামায আদায় করে মুসল্লায় বসে কান্না শুরু করতেন, এমন কি তাতে চোখ ফুলে যেত। যখন চোখ খুলতেন তখন আবার কান্না শুরু করতেন। এ অবস্থা ফজর পর্যন্ত চলত। অতিরিক্ত কান্নাকাটি করার কারণে কোনো সময় তার চোখ লাল হয়ে ফুলে যেত, ইবাদতের জন্য এক নির্দিষ্ট কামরা ছিল। ওখানে একটি মোটা কম্বল ও লৌহার একটি রশি ছিল। যখন কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিতেন। আর গলায় লোহার বেড়ি লাগিয়ে নিতেন। ইবাদত সমাপ্ত করে সকালে যখন বের হতেন, তখন কক্ষে তালা লাগিয়ে দিতেন। ওফাতের পর ইয়াযিদ এই ধারনায় উক্ত কক্ষ খুলেছিল যে, সম্ভবতঃ তাতে কোনো সম্পদ রক্ষিত আছে। কিন্তু সে দেখতে পেল যে, মোটা একটা কম্বল ও একটি বেড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

আত্মশুদ্ধির পর স্বীয় বংশধরদের প্রতি মনোযোগী হন। বনী উমাইয়াগণ জোরপূর্বক অনেকের সম্পদ দখল করে রেখেছিল। তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিয়ে দেন। তারপর সাধারণ ঘোষণা জারী করেন, যদি কেউ কারও হক জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে আটকিয়ে রেখে থাকে, তাহলে দাবী পেশ করা হোক। জনৈক জিম্মি আব্বাস বিন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে ছিল, সে জোরপূর্বক আমার জমি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ঐ সময় শাহযাদা আব্বাস ওখানে বসা ছিল। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. তাকে জবাবদেহীতার আদেশ দেন। প্রতি উত্তরে শাহযাদা বলল, আমীরুল মুমিনীন! ওয়ালীদ এ সম্পর্কে আমাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলল, ওয়ালীদের ফরমানের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলার ফরমান বেশী গ্রহণযোগ্য। সাথে সাথে জিম্মির জমীন ফেরৎ দেওয়ার আদেশ দান করেন। শাহী খান্দানের সদস্যবৃন্দ এ আচরণ কিভাবে হযম করতেন? অথচ মারওয়ানের কন্যা

e-ilm.weebly.com

ফাতেমা জীবিত। তাকে খান্দানের সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধাভাজন বলা হত। সকল খলীফা তাকে শ্রদ্ধা করত। মারওয়ানের বংশধরগণ সমবেত হয়ে তাঁর নিকট গিয়ে তাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার জন্য হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাকে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। নিজের পাশে বসার স্থান দেন। ফাতেমা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলল– হে উমর! শাহী খান্দানের সদস্যরা! তোমার শাসনামলে অপদস্ত হচ্ছে। তুমি তাদের সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে দিয়ে দিচ্ছ। তাদেকে গালমন্দ করা হচ্ছে। আর তুমি কোন কিছুই বলছ না। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. বলল, হে ফূফু! আল্লাহ তা'আলা হুযুর ﷺ কে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি এমন এক ঝর্ণাধারা রেখে গেছেন, যা থেকে তৃপ্তি লাভ করার অধিকার সকলের রয়েছে। তারপর আবু বকর রাযি. ঐ ঝর্ণাকে সে ভাবে রেখে গেছেন, তারপর উমর রাযি. ও এভাবে রেখে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময় ইয়াযিদ, মারওয়ান, আবদুল মালিক ও তার পুত্রগণ সকলে ঐ ঝর্ণা থেকে তৃপ্তি লাভ করেছে। আর তারা অন্যদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমি তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই।

ফাতেমা বিনতে মারওয়ান বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। যদি তোমার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসরণ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে নিষেধ করব না। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে তার বংশধরদের বলল, এ সব তো তোমাদের কৃত কর্ম-পরিশোধ করা হচ্ছে। উমর ফারুকের কন্যা বিবাহ করে ঘরে না আনলে তার সন্তানদের মধ্যে ফারুকী বংশের ঘ্রাণও আসত না।

আমীর উমারাহ ও শাসন কর্তাগণ বাদশাহের বাহু হয়ে থাকে। আমীর উমারাহদের সঠিক মনোনয়ন ও তাদের কাজকর্ম পুরোপুরিভাবে পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত কোন বাদশাহ রাজ্যে শান্তি-শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. শাসনকর্তাদের নামে অসংখ্য ঘোষণা পত্র জারী করেছেন। ঐ ঘোষণা পত্র সমূহের আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, চরিত্র সংশোধন করা, শিক্ষা বিস্তার করা, জিম্মি ও নও মুসলিমদের অধিকার যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং জনকল্যানমূলক কাজে মনোযোগী হওয়ার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আর যেখানে কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন সেখানে কঠোরতা অবলম্বনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন।

ফলশ্রুতিতে ইসলাম বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার আধাঁরে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বাগানে বসন্তের আগমন হয়েছে। আর মানুষ পুনরায় নবুওয়াতের যুগের দৃশ্য অবলোকন করার সুযোগ লাভ করেছে। ঘরে ঘরে দ্বীনের চর্চা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার জিম্মি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সিন্ধুর

e-ilm.weebly.com

যে ধর্মত্যাগী রাজা ও পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু

حیف درچشم زدن صحبت یاراخر شد –

سیر گل خوش ندیدم وبهار اخر شد ۔

আমার উপর এল দুঃখের আঘাত বন্ধুর সংসর্গ হলো শেষ বাগিচায় যেয়ে দেখি ফুটন্ত বসন্তের হল নিঃশেষ।

তার ওফাতের খবর শুনে রোম সম্রাট কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিল–

"যদি ঈসা মসীহের পর কেউ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হতেন, তাহলে তিনি হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. হতেন। আমি ঐ দরবেশকে পছন্দ করি না, যে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত খানায় বসে থাকে। আমি ঐ পাদ্রী সম্পর্কে আশ্চর্য হয়ে যাই, যে দুনিয়াকে স্বীয় পদতলে রেখে তারপর দুনিয়া বিমুখী জীবন যাপন করে।

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ও উম্মাতের অন্যান্য সম্মানীত উলামায়ে কিরামের মতে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. হিজরী প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন। আর ইমাম শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী রহ. মতে তিনি পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ ছিলেন। (১) ইব্নে আছীর– ১৫ মরুজুজ জাহার মাসুদী।

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক
(১০১ হিঃ–১০৫ হিঃ)

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের জন্ম হয় ৬৫ হিজরীতে। স্বীয় ভ্রাতা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের প্রস্তাব মতে। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর ওফাতের খিলাফতের মসনদে আরোহন করে। বয়সে ছিলেন নবীন যুবক। তাই মনেও ছিল তারুন্যের চঞ্চলতা। সর্বদা মদ্যপান ও গানবাদ্য নিয়ে বিভোর ছিলেন। হাব্বাযা ও সালামাহ নাম্মীয়া দু জন কৃতদাসী ছিল সাবক্ষনিক সঙ্গী। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর সংস্কার কে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়ে উমাইয়াদের রীতি নীতি পুনঃপ্রবর্তন করে।

মুহাল্লাব পরিবারের বিদ্রাহ ও তাদের ধ্বংস

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর খিলাফতের শেষ সময় ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব আবদুল মালিকের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে বসরায় চলে যায়। ইয়াযিদ ক্ষমতার মসনদে আরোহন করার সাথে সাথে বসরার শাসনকর্তা আদি আরতাহকে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের পলায়নের খবর দিয়ে তার পরিবারকে নজর বন্দি করার নির্দেশ দেন। আদী ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের তিন ভাই মুফাজ্জাল, হাবীব ও মারওয়ানকে বন্দী করে ফেলে। ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের পরিবার ইরাকে বিরাট প্রভাব শালী ছিল। সে অতিদ্রুত বিরাট এক বাহিনী গঠন করে

e-ilm.weebly.com

বসরা আক্রমণ করে। আদী বিন আরতাহ পরাজিত হয়। আর বসরা ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। রাজধানী বসরা দখল করার পর ইয়াযিদ সারা ইরাক ও কিরমানে তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয় এবং নিজের পক্ষ থেকে শাসক মনোনীত করে। ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের বাই'আত ভংগ করে ফেলে। অধিকন্তু মুসলমানদেরকে কিতাব ও সুন্নাহের নামে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাতে শুরু করে। বলতে থাকে, "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তুর্কী ও দাইলামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বেশী সাওয়াবের কাজ।"

হযরত হাসান বসরী রহ, ইবনে আশআশের ফিতনার পরিণতি দেখার পর মুসলমানদেরকে এই অনার্থক রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে বলেছেন–

"এ ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব ইরাকীদের মস্তক ছিন্ন করে করে মারওয়ানের বংশধরদের নিকট প্রেরণ করেছিল। আর নিজের বংশধরদের হত্যা করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে ছিল। আর আজ যখন তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে তখন ময়দানে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ইরাক বাসীদের আহবান করছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। আমি তোমাদেরকে দু' উমরের নীতির প্রতি আহবান করছি। অথচ দু' উমরের নীতি তো হল তাদের পায়ে বেড়ী পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা।"

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক তার বাহাদুর ভ্রাতা মাসলামা বিনি আবদুল মালিকের নেতৃত্বে ৮০ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী দিয়ে ইয়াযিদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবও ১লাখ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে বসরার থেকে বের হয়ে আওসাত নামক স্থানে এসে মাসলামার মুকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়। ইয়াযিদের ইরাক বাসীদের উপর ভরসা ছিল না। সে ঐ নগন্য সংখ্যক বাহিনীর প্রতি নজর করে বলল, আফসোস! এই বিরাট বাহিনীর স্থলে আমার সাথে হাতে গোনা খোরাসানী আমার সঙ্গে থাকত। অবশেষে তাই হয়েছে। ইয়াযিদ যা আশংকা করেছে। তখানো যুদ্ধ শুরু হয়নি। ইয়াযিদের বাহিনীর মধ্যে গুজ্জব ছড়িয়ে পড়ে যে, নদীর পুল অতিক্রম করে যে সামনে অগ্রসর হচ্ছে তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এ গুজব ছড়িয়ে পড়া মাত্রই ইরাকীরা রণে ভংগ দিয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। ইয়াযিদ তাদেরকে বাঁধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। ইয়াযিদ তার কতিপয় নিবেদিত প্রাণ সমর্থকদের নিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণী বিসর্জন দেয়। তার দু' ভাই হাবীব বিন মহাল্লাব ও মুহাম্মদ বিন মুহাল্লাবও যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ হারায়।

এ পরাজয়ের পর ইয়াযিদের ভ্রাতা মুফাজ্জল পরিবারবর্গ সাথে নিয়ে আওসাতে পৌছে। আওসাতে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের পুত্র মু'আবিয়া বাস করত। মুফাজ্জল ও মু'আবিয়া উভয় স্বীয় পরিবারবর্গ সাথে নিয়ে বসরা পৌছার

e-ilm.weebly.com

ইচ্ছা করে। ওখানে পৌঁছে তারা সফরের আয়োজন করে। আর ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের উপদেশ মোতাবেক কান্দাবীল যাওয়ার ইচ্ছা করে। সে কাফিলা রমাল পর্যন্ত নৌপথে পৌঁছার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওখান থেকে স্থল পথে কান্দাবীল (সিন্ধু) পৌঁছে।

কান্দাবিলের শাসক ওয়াদা বিন হামিদ ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের প্রতিপালিত ছিল। মুহাল্লাব তার সাহায্য লাভের আশাবাদী ছিল। কিন্তু ওয়াদা যখন জানতে পারল যে, মাসলামার পক্ষ থেকে হিলাল বিন আহওয়াজ তামিশী মুফাজ্জলের পেছনে ধাওয়া করে আসছে, তখন সে মুহাল্লাবের পরিবারকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। কান্দাবীলের বাইরে মুহাল্লাবের পরিবার ও হিলাল বিন আহওয়াজের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মুহাল্লাবের পরিবারের লোকজন বীরের মত লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দেয়। নারী ও শিশুদের বন্দী করে দামেশকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আবু উয়াইনা ইবনে মুহাল্লাব এবং উসমান বিন মুফাজ্জল সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে যামবীল অভিমুখে পালিয়ে যায়।

এভাবে এ খ্যাতনাম বংশ যারা স্বীয় সৌশৌর্য বীর্যে বনী উমাইয়ার শ্রেষ্ঠত্বে চার চাঁদ লাগিয়ে দিয়েছিল, আজ তাদের সেই সৌভাগ্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। যখন মাসলামা বিন আবদুল মালিক ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহের দূর্গ চূর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়, তখন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক তাকে কুফা ও বসরার শাসন কর্তা মনোনীত করে। এরপর মাসলামা তার জামতা সাইদ খুযাইনাকে খোরাসানের শাসন কর্তা নিয়োগ করে।

সাগাদের পতন

সাঈদ বিলাসী ও অত্যাচারী ছিল। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফায়দা উঠিয়ে সাগাদবাসী খাকানে আজমের সাহায্যকারী বাহিনীর এক বাহাদুর সৈনিক কুরসুলের নেতৃত্বে কস্‌রে বাহেলী আক্রমণ করে বসে। এ মহলে অনেক মুসলমানদের বসতী ছিল। তারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সমরকন্দের শাসক উসমান বিন আবদুল্লাহ মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে সাময়িকভাবে কুরসুলের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। আর আশ পাশের ইসলামী শাসকদের সাহায্য কামনা করেন।

জনৈক মুসলমান সরদার মুসাইয়াব বিন বাশার রিয়াহী নির্বাচিত সাত শত সৈন্য নিয়ে বাহিলী ভবনে অবরুদ্ধ মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য প্রেরণ করে। তখন অবরুদ্ধ মুসলমান এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, প্রত্যেকে স্ব-স্ব পরিবারের সদস্যদেরকে একে একে হত্যা করে ফেলবে। মুসাইয়াব বিন বাশার মহলবাসীদের গোপনে তাদের সাহায্য করার খবর পৌঁছে দেয়। বলে দেয়, তোমরা সকাল পর্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করো।

e-ilm.weebly.com

অতি প্রত্যুষে মুসাইয়াব তার হাতে গোনা কয়েক জন প্রাণ উৎসগকারী সৈন্য নিয়ে অবরোধকারী তুর্কীদের উপর হামলা করে বসে। ভিতর থেকে অবরুদ্ধ মুসলমানও তরবারী হাতে নিযে এগিয়ে আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বিজয় হয় মুসলমানদের; তুর্কিরা পালিয়ে যায়। মুসায়াব মুসলমানদের বলল, এখানে দেরী করা ঠিক হবে না। যেহেতু আমাদের শক্তি কম, তাই আমাদের যথাসম্ভব দুশমনের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখন সামনে চলে যাওয়া উচিত। মুসলমান নিজ দ্রব্যাদি সাথে নিয়ে মহল থেকে বের হয়ে আসে। মুসায়াবের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। দ্বিতীয় দিন তুর্কীরা শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসে। কিন্তু তারা এসে ময়দান শূন্য দেখতে পায়। এ ঘটনা ১০২ হিজরীতে সংঘঠিত হয়। – আল বিদায়াত ওয়ান নিহায়া– ৯/২২।

ঐ বছর মাসলামা বিন আবদুল মালিককে কুফা ও বসরার শাসন কর্তার পদ থেকে পদচ্যুত করে দেওয়া হয়। আর তার স্থলে উমর বিন হুরাইরা ফাজারীকে মনোনীত করা হয়। উমর হুবাইরা, সাঈদ খাযীনাকে খোরাসানের শাসন কর্তার পদ থেকে পদচ্যুত করে তার স্থলে সাঈদ হারশীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। সাঈদ হারশী বাহাদুর সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাগাদ ও তুর্কী তার আগমনের সংবাদ শুনে সাগাদ এলাকা ছেড়ে চীনের এলাকায় চলে যায়। সাঈদ হারশী তার পেছনে খাজান্দাহ পর্যন্ত ধাওয়া করেন। তাদের অধিকাংশ লোককে হত্যা করে ফেলেন। আর অনেক লোককে গ্রেফতার করেন এবং বিপুল পরিমান গনীমতের মাল নিয়ে সফলকাম হয়ে ফিরে আসে।

১০৪ হিজরীতে উমর বিন হুবাইরা কুফা ও বসরার শাসকের সাথে মতবিরোধ হওয়ার কারণে সাঈদ হুরাশীকে খোরাসানের শাসন কর্তার পদ থেকে পদচূত্য করেন এবং আর তার স্থানে মুসলিম বিন সাঈদ কালাবীকে নিয়োগ করেন।

খাযারের পতন

ঐ বছর সাবিত নাহারানীকে দমন করার জন্য মুসলমানদের এক বাহিনীকে খাযারকে দমন করার জন্য আরমোনিয়ার প্রেরণ করা হয়। খাযার কুবচাক ও আরমান ও তুর্কীদের অন্যান্য গোত্রের সরদারদের নিকট সাহায্যের আবেদন করে। মারজে হিজারাহ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হয়। আর দুশমনা তাদের সব মাল সামান লুট করে নিয়ে যায়। দামেশকে এ খবর পৌছার পর ইয়াযিদ জার্‌রাহ বিন আবদুল্লাহ হাকামীকে আজারবাইজান ও আরমোনীয়ার শাসন কর্তা নিয়োগ করে প্রেরণ করেন এবং তাদের খাযারকে দমন করার নির্দেশ দান করেন। জাররাহ বিন আবদুল্লাহ হাকামী উৎসাহী সিরিয় বাহিনী সাথে নিয়ে তুর্কীদের পথে অগ্রসর হন। প্রথমে বারজা নামক স্থানে পৌছে যাত্রা বিরতি করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তার পর নদী পার হয়ে বাবুল আবওয়াব পৌছেন। খাযার ঐ স্থান ত্যাগ করে পূর্বেই

e-ilm.weebly.com

শহর ছেড়ে চলে যায়। জাররাহ বিন বাধায় ঐ স্থান দখল করে নেন। জারাহ এখানেই অবস্থানরত ছিলেন। ইত্যাবসরে খাযার স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে এক বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। নাহারাওয়ানের পাশে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। আর তুর্কীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

জারাহ এখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে হাছিন দূর্গে পৌঁছেন। দুর্গবাসীরা বিনাযুদ্ধে দূর্গ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেয়। আর নিজেদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে দূর্গ থেকে বের হয়ে চলে যায়। এর পর জারাহ বুলাঞ্জুর অভিমুখে যাত্রা করে। এটা তুর্কীদের এক বিরাট মজবুত দূর্গ ছিল। সেখানে তাদের বিরাট শক্তি ছিল। এখানে মুসলমান এবং তুর্কীদের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। কিন্তু মুসলমান বিজয়ী হয়। মুসলমান অনেক দূর পর্যন্ত তুর্কীদের পেছনে ধাওয়া করে। তাদের প্রচুর সংখ্যক লোককে হত্যা করে ফেলে। এর আশপাশের দূর্গ সমূহও দখল করে নেয়।

১০৫ হিজরীতে জাররাহ বুলাঞ্জুর এলাকা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করেন এবং অনেক দূর্গ দখল করে নেন। অসংখ্য তুর্কীকে হত্যা করেন এবং বিপুল পরিমান গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। জাররাহের ধারাবাহিক বিজয়ে তুর্কীরা ভাষণ ভীত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। ফলে তুর্কীস্থানে পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। – ইব্নে আছীর– ৯/২৪

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

ইয়াযিদের ইচ্ছা ছিল, তারপর তার পুত্র ওয়ালীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। কিন্তু তার উপদেষ্টাগণ পরামর্শ দেন, ওয়ালীদ এখনো অল্প বয়সের ছেলে। তাই খিলাফতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারে না। সুতরাং ইয়াযিদ তারপর ধারাবাহিক ভাবে তার দু ভাই হিশাম বিন আবদুর মালিক ও স্বীয় পুত্র ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে।

ইয়াযিদের মৃত্যু

১০৫ হিজরীর ২৫ শাবান ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেশকের বালকা নামক স্থানে ইন্তিকাল করে। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিলো ৩৮ বছর। ৪ বছর এক মাস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

e-ilm.weebly.com

হিশাম বিন আবদুল মালিক

(১০৫ হিঃ –১২৫ হিঃ)

হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ৭২ হিজরীতে আয়েশা বিনতে হিশামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পুত্রের নাম রাখেন মনসুর। কেননা তিনি ঐ বছর মুসয়াব বিন যুবাইরকে হত্যা করে ছিলেন। কিন্তু মাতা স্বীয় পিতার নামে নাম রাখেন হিশাস। পরবর্তীতে এ নামেই খ্যাতি লাভ করে।

ইয়াযিদের ইনতিকালের সময় তিনি রাসাফা নামক স্থানে ছিলেন। ওখানে তার মুকুট পরিধানের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। আর লাঠি ও আংটি ওখানেই তার সামনে পেশ করা হয়। তারপর দামেশকে পৌঁছে জনসাধারণের বাই'আত গ্রহণ করেন। খিলাফতের মসনদে আরোহনের সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। ১০৫ হিজরী থেকে ১২৫ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ধৈর্যশীল, সহনশীল ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তার শাসনামলে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিচক্ষণতার সাথে সব সমস্যা নিরসন করে সফলতা লাভ করেছিলেন। তাকে উমাইয়াদের উল্লেখ যোগ্য খলিফাদের একজন মনে করা হয়।

ইরাক ও খোরাসানে বিদ্রোহ

হিশাম খিলাফতের মসনদের আরোহন করার সাথে সাথে বসরা ও কুফার শাসনকর্তার পদ থেকে উমর বিন হুবাইরাকে পদচ্যুত করে তারে স্থলে খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসরীকের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন।

মুসলিম বিন সাঈদ

ঐ সময় খোরাসানে শাসক মুসলিম বিন সাঈদ তুর্কীদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। খালীদ কাসরী তাকে তার কাজ চালু রাখার নির্দেশ দেন। মুসলিম বিন সাঈদ ফারগানা পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, খাকান এক বাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসছে। মুসলমানদের ক্ষুদ্র এক বাহিনী খাকান বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তুর্কীরা তাদের ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ করে। আর মুসলমানদের কয়েক জন বাহাদুর সৈনিক তাদের মধ্যে মুসায়েব বিন বাশার রিবাহীও ছিলেন, তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। মুসলিম বাহিনী এ খবর জানার পর তারা অবশিষ্ট বাহিনীকে দুশমনদরে হাত থেকে মুক্ত করে নেয়। দুশমনদের সংখ্যা অনেক বেশী দেখে মুসলিম বিন সাঈদ মুকাবিলা করা সমীচীন মনে না করে গতি পরিবর্তন করে অন্যদিকে যাত্রা করেন। ধারাবাহিক ভাবে ৮দিন পথচলার পর নবম দিন এক নদীর তীরে এসে পৌঁছেন। নদীর অপর তীরে ফারগানাবাসী ও শাসকগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। মুসলিম বিন সাঈদ স্বীয় সৈন্যদের তরবারী উন্মুক্ত করার আদেশ দান করেন। মুহূর্তের মধ্যে তরবারীর প্রান্তর পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানগণ নদী অতিক্রম করে অপর তীরে পৌঁছে।

e-ilm.weebly.com

একদিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারে যে, খাকানের পুত্র ২ লাখ তুর্কীদের সাথে নিয়ে পেছনে ধাওয়া করে আসছে। মুসলিম বিন সাঈদ স্বীয় বাহিনীকে যাত্রা বিরতি করার নির্দেশ দেন। ওখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। হাতে গোনো কয়েক জন মুসলমান তুর্কীদের পংঙ্গ পালের মত বাহিনীকে নাস্তনাবুদ করে দেয়। তুর্কীও সাগাদের খ্যাতনামা অফিসার, যাদের মধ্যে খাকানে পুত্রও নিহত হয়।

যদিও মুসলমানগণ এ যুদ্ধে বিজয়ী ও সফলকাম হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে এ যুদ্ধে ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সেনাপতি মুসলিম বিন সাঈদের জন্য এক গ্লাস পানির ব্যবস্থা হলে কয়েক জন সৈন্য তা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। সেনাপতি মুসলিম এ অবস্থা দেখে বললেন, তাতে ক্ষতির কিছু নেই, তারা আমার চেয়ে বেশী তৃষ্ণার্থ। এ সময় মুসলমানগণ ভীষণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তারা খাজান্দায় অবস্থান করছিল। এদিকে দূত এসে খবর দেয় যে, আবদুল্লাহ কারী মুসলিম বিন সাঈদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে স্বীয় ভ্রাতা আসাদ বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানের শাসন কর্তা মনোনীত করেছেন। আর খেরাসানে নবনিযুক্ত শাসনকর্তা আসাদ আবদুর রহমান বিন নাঈমকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান মনোনীত করেছেন। মুসলিম এ খবর জানার বিন্দু মাত্র বিচলিত হননি। স্বেচ্ছায় আবদুর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেন। (ইব্নে আছীর– ৫/৪৮)

আসাদ বিন আবদুল্লাহ

আসাদ বিন আবদুল্লাহ অতি বাহাদুর ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে হিরাত পর্বতের নিকটবর্তী গোর আক্রমণ করেন। গোর বাসীগণ তাদের ধন-সম্পদ এক গভীর গর্তে গোপন করে নিজেরা অন্যত্র চলে যায়। আসাদ স্বীয় বাহিনীকে শিকল বেঁধে সিন্দুকের সাহায্যে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে সব ধনসম্পদ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ১০৮ হিজরীতে আসাদ পুনরায় খাত্তাল ও গোর আক্রমণ করে মুসলমানগণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

আসাদের চরিত্রে স্বজনপ্রীতির বিরাট এক দোষ ছিল। তিনি কাতহানের গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করে প্রকাশ্যে মুযার গোত্রের বিরোধীতা শুরু করেন। এমন কি তিনি নজর বিন সাইয়্যারাহ, আবদুল রহমান বিন নাঈম, সাওরাহ বিন হার, বুখতারী বিন আবু দরহামের মত মুযার গোত্রের নেতাদের বেত্রাঘাত করেন। তাদের মাথা কামিয়ে স্বীয় ভ্রাতা খালিদের নিকট ইরাকে পাঠিয়ে দেন। ১০৬ হিজরীতে বরতোয়ান নামক স্থানে কাতহান ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। আসাদের গোত্র প্রীতিতে জাতিগত শত্রুতা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। আর মুসলমানদের মধ্যে জাহিলীয়াতের যুগের মত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হিশাম এ

e-ilm.weebly.com

খবর জানার পর খালিদকে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করে যে, তোমার ভ্রাতাকে পদচ্যুত্য করে তার স্থলে আশরাস বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানের শাসন কর্তা নিয়োগ করো।

আশরাস

১০৯ হিজরীতে আশরাস খোরাসান আগমন করেন। তিনি ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তার আগমনে খোরাসানবাসী খুবই সন্তুষ্ট হয়। আশরাস সমরকন্দ ও মাওরাউন নাহারে ইসলাম প্রচারের জন্য আবু সাঈদা নামক জনৈক বুযুর্গকে নিয়োজিত করেন। আবু সাঈদার চেষ্টায় তুর্কীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। জিম্মিরা ইসলাম গ্রহণ করায় জিজিয়ার পরিমান কমতে শুরু করে। সমরকন্দের কর আদায়কারী ইব্নে আমরতাহ আশরাসকে জিজিয়া করের ঘাটতির বিষয় অবগত করে। আশরাস প্রতিউত্তরে বললেন, জিজিয়া হল মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ। আমি জানতে পেরেছি, জিম্মিরা দ্বীনের মহব্বতে নয় বরং জিজিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ, জিম্মি খাতনা করেছে, ইসলামের ফরযসমূহ আদায় করছে। আর কুরআনের যে কোনো সূরা মুখস্ত করে নিয়েছে। তাকে ছেড়ে দেবে আর অন্যদের থেকে ধার্য্যকৃত জিজিয়া নিয়মিত আদায় করবে।

আশরাসের এ আদেশে নও মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। আর তারা সাত হাজারের মত লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নেয়। অনেক খ্যাতনামা নেককার মুসলমান তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে আবু সাঈদাও ছিলেন। আশরাস মুহাশরকে তাদের মুকাবিলার জন্য পাঠান। অন্যান্য নও মুসলমানও তাদের সাহায্য কারী হয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছিল। মহাশর তাদেরকে প্রতারিত করে গ্রেফতার করে আশরাসের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আর তুর্কী নও মুসলিমদের নিকট থেকে তরবারীর সাহায্যে জিজিয়া কর আদায় করা হয়। তাদের সরদারদের অপমান করা হয়। মহাশরের এ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে সমরকন্দের নও মুসলিমগণ ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তারা তুর্কীদের সাহায্য কামনা করে। তুর্কীরা তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় এসে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে আশরাস নিজেই যুদ্ধের ময়দানে আসেন। নদীর ওপারে আমেলের নিকটবর্তী স্থান সাগাদ ও তুর্কীদের যৌথ বাহিনীর সাথে আশরাসের মুকাবিলা হয়। মুসলমানদের পরাজয়ের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আশরাসের বিচক্ষণতায় বিজয় হয়। তারপর আশরাস সমানে অগ্রসর হয়ে রায়কন্দ পৌঁছেন। এখানে তর্কীরা মুসলমানদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। সুতরাং ৭ শ' মুসলমান পিপাসায় মারা যায়। অবশেষে মুসলমানগণ প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে পানি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে তৃপ্তি লাভ করে। দুশমনদেরকে পেছনে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তাদের পরাজিত করে দেয়।

e-ilm.weebly.com

কামরাজার ঘটনা

তখনও যুদ্ধ চলছিল। এমতাবস্থায় খাকান ফরগানা আফসানা ও নসফদের সাথে নিয়ে খোরাসানের নব মুসলিম এলাকা কামরাজা চতুর্দিক থেকে ঘোরাও করে ফেলে। কামাজার মুলমানমানগণ শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরিখার পুল ভেঙ্গে দেয়। আর শহরে আবদ্ধ হয়ে কাফিরের মুকাবিলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তুর্কীরা শহরের নিরাপত্তা পরিখায় কোচী কাঠ দিয়ে রাস্তা তৈরীর চেষ্টা করে। মুসলমানগণ ভেতর থেকে শুকনা কাঠ ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তুর্কীদের সাত আট দিনের পরিশ্রম এক ঘণ্টায় পণ্ড হয়ে যায়। তুর্কীরা মুসলমানদের ভয় দেখানোর জন্য একশ মুসলমান কয়েদীকে শহরের প্রাচীরের নিকট নিয়ে হত্যা করে তাদের কর্তিত মাথা শহরের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ তত সংখ্যক তুর্কী কয়েদীদের মাথা কেটে নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মোটকথা মুষ্ঠিমেয় মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু আপদ মস্তক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দু' মাস যাবত পঙ্গপালের মত শত্রুদের দাঁত নাড়াতে শুরু করে।

অবরোধ চলাবস্থায় খাকান খবর পায় যে, ইসলামী বাহিনী ফারগানা এসে পৌঁছে গেছে। সে কামারাজার মুসলমানদের সংবাদ দেয়, এটা আমাদের অভ্যাস নয় যে, আমরা যে শহর অবরোধ করি, তা জয় না করে অবরোধ তুলে নিব। তবে আমরা তোমাদের স্বার্থে এতটকু করতে পারি যে, তোমরা শহর ছেড়ে চলে যাবে। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। কামরাজার মুসলমানগণ জবাবে বলল, আমাদের নীতি হল আমরা যে শহর দখল করি জীবন থাকতে তা আমরা হাত ছাড়া করি না। অবশেষে মুসলমান ও তুর্কীদের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর হয় যে, মুসলমান কামরাজা ছেড়ে চলে যাবে। আর তুর্কীরাও অবরোধ তুলে নিয়ে সরে যাবে। সুতরাং উভয় পক্ষ একে অপরের নিকট থেকে জামানত নিয়ে নেয়। আর মুসলমানগণ কামরাজা ছেড়ে বোসিয়া চলে যায়।

–ইব্নে আছীর ৫৬ পৃঃ ৫ম খণ্ড।

জুনাইদ বিন আবদুর রহামন

১১১ হিজরীতে হিশাম আশরাস বিন আবদুল্লাহকে পদচূত্য করে তার স্থলে জুনাইদ বিন আবদুর রহমান মুররীকে খোরাসানের শাসনকর্তা মনোনীত করে। জুনাইদ মুযার গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তার অধীনস্থ সব পদে মুযার গোত্রের লোক নিয়োগ করেন।

শোবের ঘটনা

১১২ হিজরীতে জুনাইদ তাখারিস্থান আক্রমণ করার ইচ্ছা করেন। তুর্কীরা এ খবর পেয়ে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সমরকন্দের শাসক সাওরা বিন হুর জুনাইদকে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করে যে, এত বিশাল সংখ্যক বাহিনীর মুকাবিলা করার সামর্থ আমার নেই। আপনি আমার

e-ilm.weebly.com

সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করুন। জুনাইদ ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ পৌঁছে সাওরাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন। তার সাথীরা তাকে বলে, পূর্বে খোরাসানের শাসকদের মধ্যে কেউ ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে কখনো জাইহুন নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। আপনি অতিরিক্ত শক্তির অপেক্ষা করুন। কিন্তু জুনাইদ বললেন, আমাকে সূরার সাহায্যে দ্রুত পৌঁছতে হবে। মোটকথা, জুনাইদ নদী অতিক্রম করে "ফাস" নামক স্থানে অবস্থান নেন। আর তুর্কীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। তারপর সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে সমরকন্দের নিকটবর্তী এক ঘাটিতে অবস্থান নেন। খাকান এ খবর জানার পর তুর্কী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান বীরত্বের সাথে তাদের মুকাবিলা করে তুর্কীদের বিষ দাঁত ভেংগে ফেলে। কিন্তু দু' দিন মুকাবিলা করার পর মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়।

জুনাইদ সমরকন্দের নিকবর্তী ছিলেন, তিনি সাওরাহকে সব বিষয় অবগত করে সাহায্য কামনা করেন। সূরাহ বার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন জুনাইদ ও সূরার মধ্যে এক ফরসখ ব্যবধান ছিল, তখন তুর্কীরা উভয়ের মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমূদ্রের নিকটবর্তী জংগলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সাওরা তুর্কীদের সরিয়ে দিয়ে জুনাইদের সাথে মিলিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাই মুসলমানগণ হঠাৎ কঠোর আক্রমণ করে। তাতে তুর্কীদের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে হয়ে যায়। তারা রণে ভংগ দিয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। যুদ্ধের সময় ধূলাবালি উড়ার কারণে আগুনের স্ফূলিঙ্গে চোখ ঝাফসা হয়ে যায়। মুসলমানগণ তুর্কীদের পেছনে ধাওয়া করার কারণে বহু মুসলমান ও তুর্কী অগ্নি স্ফূলিঙ্গে দগ্ধ হয়। এ দুর্যোগময় অবস্থায় সমরকন্দের আমীর সাওরারাহ অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান। এতে তার পায়ে হাড় ভেংগে যায়। সাওরারাহ আহত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। এ সুযোগে তুর্কীরা পাল্টা আক্রমণ করে বহু মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে।

এ বিপর্যয়ের খবর শুনে জুনাইদ সমরকন্দ ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু এখনও ঘাটি থেকে বের হতে পারে নি। ইত্যাবসরে তুর্কী বাহিনী এসে হাজির হয়। মুসলমানগণ এ অবস্থায় মুকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধ হযে দাঁড়িয়ে যায়। যেহেতু দুশমনদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম ছিল, তাই জুনাইদ যুদ্ধের পুর্বে এ ঘোষণা দিয়ে বসে যে, যুদ্ধে যে কৃতদাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে কৃতদাসরা মুক্তি লাভের আশায় প্রাণপণে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে দুশমনদের পায়ের তলার মাটি শূন্য হয়ে যায়।

e-ilm.weebly.com

এরপর জুনাইদ সমরকন্দে পৌছেন। আর পরিবেশ শান্ত দেখে মুসলমানদের পরিবার বর্গকে মার্ভ অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। জুনাইদ সমরকন্দে অবস্থানরত অবস্থায় জানতে পারেন যে, খাকান বুখারা আক্রমণের জন্য আসছে। জুনাইদও তাৎক্ষণিকভাবে বুখারা অভিমুখে যাত্রা করেন। রাস্তা বিপদজনক পাহাড়ী রাস্তা ছিল। তাই মুসলমানগণ অতি সতর্কতার সাথে রাস্তা অতিক্রম করে। কারমীনার নিকটবর্তী স্থানে খাকানকে স্বীয় বাহিনীসহ দেখতে যায়। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে মুসলমান তুর্কীদের পরাজিত করে দেয়। জুনাইদ নিরাপদে বুখারায় প্রবেশ করেন। বুখারা বাসীগণ খুশিতে তাদের স্বাগত জানায়। আর প্রত্যেক মুসলমান সিপাহীকে দশ দিরহাম পুরস্কার প্রদান করে। –ইবনে আছীর– ৫/৬৩।

আসেম বিন আবদুল্লাহ

১১৬ হিজরীতে হিশাম বিন আবদুল মালিক জুনাইদকে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের কন্যাকে বিবাহ করার অপরাধে পদচ্যুত করে। আর এর বদলায় আসেম বিন আবদুল্লাহ হেলালীকে খোরাসানের শাসন কর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। হিশাম আসেমকে এ উপদেশও দিয়েছিল যে, যদি তুমি জুনাইদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারো, তাহলে তাকে জীবিত ছাড়বে না। কিন্তু জুনাইদ দন্ত রোগে আক্রান্ত ছিল। আসেম পৌছার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আসেম জুনাইদের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সাথে ভীষণ রুঢ় আচরণ করেন।

হারেছ বিন সুরাইজের বিদ্রোহ

এ বছরই হারেছ বিন সুরাইজ খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। সে কালো পোশাককে তার নির্দশন নির্ধারণ করে। জনসাধারণকে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের রাসূলের স্বাধীনতা ও খলীফা মনোনীত করার নামে বাই'আত গ্রহণের আহবান শুরু করে। অনেক মুসলমান তার সঙ্গী হয়। সে বল্‌খ জোযজান, তালকান ও মারুজোর দখল করে নেয়। তারপর সে খোরাসানের রাজধানী মার্ভ অভিমুখে যাত্রা করে। আসেম মার্ভের সদর ফটকে হারেছের মুকাবিলা করে তাকে পরাভূত করে ফেলে। আর তার অনেক সংগী সাথী পালাতে গিয়ে নদীতে ডবে মারা যায়। হারেছ প্রাণ বাঁচিয়ে মার্ভের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। আসেম তার পেছনে ধাওয়া করা সমীচীন মনে করেনি।

এর পর আসেম হিশাম বিন আবদুল মালিককে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করে যে, খোরসানের শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের তাগিদে এদেশ ইরাকের গভর্নরের অধীনে ন্যাস্ত করা শ্রেয়। এতে প্রয়োজনে অতি দ্রুত সাহায্য পৌছানো সম্ভব হবে। নতুবা কেন্দ্রে থেকে দূরে অবস্থানের কারণে এখানে বিদ্রোহ-বিশৃংখলা চলতেই থাকবে।

e-ilm.weebly.com

আসাদ বিন আবদুল্লাহ কাসারী

হিশাস আসেমের এ অভিমত পছন্দ করে খোরাসান প্রদেশকে ইরাকের গভর্ণরের অধীনে ন্যাস্ত করে দেন। কিন্তু আসেমকে পদচ্যুত্য করে খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসারীর ভ্রাতা আব্দুল্লাহকে তার স্থলে নিয়োগ করে।

আসেম পদচুত্যির খবর পেয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। সে হারেছ বিন সুরাইজের নিকট দূত প্রেরণ করে এ মর্মে সন্ধি স্থাপন করে যে, হারেছ খোরাসানের যে স্থানে বাস করতে চায় বাস করতে পারবে। আর উভয়ে সম্মিলিতভাবে হিশামকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর আমলকারী হওয়ার আহবাহন জানাবে। আসেমের এ সন্ধি স্থাপনকে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডাররা অপছন্দ করে তাকে হারিছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। আসেম বাধ্য হয়ে হারিছের মুকাবিলা যাত্রা করে। যুদ্ধে হারেছ পরাজিত হয়ে মারুরোয অভিমুখে চলে যায়। এদিকে ঐ সময় আসাদ খোরাসান পৌছে যায়। সে আসেমকে বন্দী করে এবং তার নিকট বায়তুল মালের বাকী একলাখ দিরহাম দাবী করে। আসাদ জুনাইদের কর আদায় কারী, যাকে আছেম বন্দী করে ছিল, তাকে মুক্ত করে দেয়। আসাদ এক বিচক্ষণ, যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল। সে খোরাসান পৌছে রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপনে ভীষণ মনযোগী হয়।

১১৯ হিজরীতে আসাদ খাতালের বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করে সেখানকার সব চেয়ে শক্তিশালী ও মজবুত দূর্গ দখল করে নেয়। বিপুল পরিমান গণীমত ও অসংখ্য কয়েদী মুসলমানদের হাতে আসে। এর পর আসাদ খাতালের উপত্যকা সমূহে সৈন্য ডুকিয়ে দেয়। খাতাল নিজ একালা ত্যাগ করে চীনে পালিয়ে যায়।

খাকানকে হত্যা

ঐ বছর জুযজানের নিকটে আসাদের সাথে খাকানের সংঘর্ষ হয়। খাকানের সাথে হারেছ বিন সুরাইজ ছিল। আসাদ খাকানকে পরাজিত করে তার পেছনে তিন ফরসখ পর্যন্ত তাড়া করে। ঐ সংঘর্ষে অসংখ্য তুর্কী নিহত হয়। আর মুসলমানগণ বিপুল পরিমান গণীমতের মালিক হয়। আসাদ তার স্থায়ী শাসন কেন্দ্রস্থল বল্‌খে ফিরে আসে। চলে যায় খাকান তার এলাকায়। তার পর খাকান পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। সে লক্ষ্যে সুরাইজকে পাঁচ হাজার খচ্চর দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ খাকান ও বিখ্যাত তুর্কী নেতা কুরসুলের সাথে দাবা খেলা নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে যায়। কুরসুল খাকানোর হাত ভেঙ্গে দেয়। খাকান শপথ করে যে সে কুরসুলকে নিজ হাতে হত্যা করবে। কুরসুল খাকানের শপথের কথা জেনে যায়। তাই সে রাতে হামলা করে খাকানকে হত্যা করে ফেলে।

e-ilm.weebly.com

খাকানের মৃত্যুর পর তুর্কীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখা দেয়। তাদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আসাদ হিশামকে এ বিষয়ে অবগত করে। সে ভীষণ খুশি হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরীয়া আদায় করে। ১২০ হিজরীতে বল্‌খে আসাদের মৃত্যু হয়। ঐ বছর হিশাম বিন আবদুল মালিক খালিদ বিন আবদুল্লাহকে তার শত্রুদের চক্রান্তের কারণে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে ইয়ামনের কর আদায়কারী ইউসুফ বিন উমর সাকাফীকে ইরাকের শাসক নিয়োগ করে। ইউসুফ বিন উমর ইরাক পৌঁছে সর্বপ্রথম খালিদ ও তার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। ইউসুফ নছর বিন সায়্যারকে খোরাসানের শাসক নিযুক্ত করে।

নছর বিন সায়্যার

নছর বিন সায়য়ার একজন সুচতুর বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী সেনাপতি ছিল। সে ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে অত্যাচারের কারণ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। পর্যবেক্ষণে প্রমাণ হয় যে, ৩০ হাজার মুসলমান এরূপ আছে, যাদের থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হয়। আর ৮০ হাজার এরূপ অমুসলমান রয়েছে, যাদের জিজিয়া কর সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সে এক সপ্তাহের মধ্যে এ গর্হিত কাজ বন্ধ করে দেয়। তার পর খাজনা আদায়ের অনিয়ম দূর করে। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংঙ্খলা স্থাপন করে এবং একের পর এক তুর্কীদের এলাকায় সৈন্য পাঠাতে শুরু করে।

কুরসুলকে হত্যা

১২০ হিজরীতে যখন নছর তৃতীয়বার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে যাত্রা করে। তখন ঘটনাচক্রে তুর্কীদের প্রধান সেনাপতি কুরসূল, যে ৭২ বার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে ছিল, সে জনৈক মুসলমানের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নছর তাকে হত্যা করে সদর রাস্তায় তার লাশ ঝুলিয়ে রাখে। কুরসূল নিহত হওয়ার পর তুর্কীদের কোমর ভেংগে যায়। তারা তার শোকে নিজেদের কান, নিজেদের অশ্বগুলোর লেজের পশম কেটে ফেলে। এমনকি তারা তাদের বসত বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেয়।

হারেছ বিন সুরাইজের বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহ সর্বদা চলতে থাকে। এ যুদ্ধেও সে কুবসূলের সাথে ছিল। ইউসুফ বিন উমর নছরকে পত্র লিখে, সে যেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। নছর ইয়াহইয়া বিন হুছাইনকে হারেছের দৌরাত্ম দমন করার উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে প্রেরণ করে। হারেছ জনৈক তুর্কী সরদার আমরামের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। যুদ্ধে আজরাম নিহত হলে তুর্কীরা ময়দান ছেড়ে চলে যায়। এ পরাজয়ের পর শামের শাসনকর্তা নছরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। নছর এ শর্তে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয় যে, হারেছকে শাশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী হারেছ শাশ

e-ilm.weebly.com

থেকে বের হয়ে ফারইয়াব চলে যায়। অবশেষে কয়েক বছর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ১২৭ হিজরীতে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়। নছর শাশ থেকে বিদায় হয়ে ফারগানা অভিমুখে যাত্রা করে। ফারগানার শাসক নছরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তার বুদ্ধিমতি মাকে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে নছরের নিকট পাঠায়।

আমোনিয়া ও আজারবাইজান

আর্মোনিয়া ও আজার বাইজান দেশ দুটিও বছরের পর বছর মুসলমান ও তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এখানের শাসনকর্তা ছিলেন জাররাহ বিন আবদুল্লাহ হাকামী। জাররাহ বালজার পর্যন্ত বিজয় করেছিলেন। ১৭ হিজরীতে হিশাম জার্‌রাহকে পদচ্যুত করে তার স্থানে মাসলামা বিন আবদুল মালিককে শাসনকর্তা মনোনীত করেন। মাসলামা হারেছ বিন উমর তাঈকে তার প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করেন। হারেছ তুর্কীদের অনেক শহর দখল করে নেয়। আর তাদের মাঝে ভিতির সঞ্চার করে।

১১০ হিজরীতে মাসলামা সরাসরি বুদ্দান থেকে তুর্কী এলাকার দিকে অগসর হয়। খাকান বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করে। আর খাকান প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়।

১১১ হিজরীতে হিশাম মাসলামাকে পদচ্যুত করে পুনরায় জাররাহ বিন আবদুল্লাহকে তার স্থলে প্রেরণ করেন। জার্‌রাহ তিফলিসের দিক থেকে খাযার শহরে হামলা করে। বইযা শহর মুসলমানদের দখলে আসে। আর জাররাহ বিজয় গৌরব নিয়ে ফিরে আসে। মুসলমানগণ ফিরে আসার পর মুসলমানদের সাথে মুকিাবিলার জন্য খাযার জোরদার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। লান এলাকা থেকেও তুর্কীরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। জার্‌রাহ সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন। মারজে দাঁবিল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। তাতে জাররাহ বিন আবদুল্লাহ হাকামী নিহত হয়।

জাররাহ নিহত হওয়ার কারণে তুর্কীদের সাহস বেড়ে যায়। তাই তারা মুসলমান এলাকা অভিমুখে যাত্রা করে মসিলের নিকট পৌছে যায়। তুর্কীদের এ পদক্ষেপ মুসলমানদের জন্য ভীষণ বিপদজনক হয়। হিশাম এ খবর জানার পর সাঈদ হারশীকে তুর্কীদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। অন্যান্য মুসলমান অফিসারদেরকেও তাকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। সাঈদ তুর্কীদের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যান। আরজান পৌছার জার্‌রাহর অবশিষ্ট সৈন্য বাহিনী এসে তার সাথে মিলিত হয়। তারপর খালাত পৌছে। তরবারীর সাহায্যে তা দখল করে নেয়। তারপর ওখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে বহু দূর্গ ও শহর দখল করতে করতে বারজাআ পৌছে যায়।

e-ilm.weebly.com

খাকানের পুত্র ঐ সময় ওরছান অবরোধ করে রেখেছিল। হারশী ওয়ারাছানের অবরুদ্ধ মুসলমানদের নিকট সংবাদ পাঠান, ধের্য্য ও সাহসের সাথে কাজ চালিয়ে যাও। আমি অতিদ্রুত তোমাদের সাহায্যে আসছি। খাকানে পুত্র মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে অবরোধ তুলে পালিয়ে যায়। হারশী বিনা বাঁধায় শহর দখল করে নেন।

হারশী ওয়ারাছান থেকে আরদবিল পৌঁছেন। ওখান থেকে বাজরাওয়ান পৌঁছে জানতে পারেন, সামান্য দূরে খাযারের দশ হাজার সৈন্য অবস্থান নিয়েছে। তাদের সাথে ৫ হাজার বন্দী মুসলমানও রয়েছে। হারাশী রাতের অন্ধকারে অতর্কিত খাযারের বাহিনীর উপর হামলা করেন। খাযার অতর্কিত আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারেনি। সকল সৈন্যই নিহত হয়। আর বন্দী মুসলমানগণ মুক্তি পায়। ঐ পরাজায়ের পর খাযার স্বীয় হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করে। হারশীও তার বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। বরজন্দ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তুলুম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানদের পরাজয়ের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু খাযারের সাথে যে সব বন্দী মুসলমান ছিল, তারা হঠাৎ করে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করে। তাতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা এসে যায়। তাই পুনরায় পাল্টা আক্রমণ করে দুশমনদের যুদ্ধের মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঐ যুদ্ধে মুসলমান কয়েদী ছাড়াও মুসলমানদের হাতে বিপুল পরিমান গনীমতের মাল আসে।

খাযার এরপর তার বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে পুর্ণগঠিত করে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে মুসলমানদের মুকাবিলায় বের হয়ে আসে। বাইলাতান নদীর কাছে দু'দলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। অবশেষে মুসলমানদের জয় হয়। খাযারের অনেক সৈন্য নিহত হয়। অনেকে সমুদ্রে ডুবে মারা যায়। হারশী গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ ও বিজয়ের খবর হিশামের নিক প্রেরণ করেন। হিশাম এ খবর শুনে ভীষণ খুশি হন।

১১৩ হিজরীতে হিশাম সাঈদ হারশীকে ফেরৎ নিয়ে এসে তার স্থলে স্বীয় ভ্রাতা মাসলামাহ বিন আবদুল মালিককে পুনরায় আমেনিয়া ও আজার বাইজানের শাসক নিয়োগ করেন। মাসলামা এসেই খাকানের এলাকায় মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা অনেক শহর ও দূর্গ দখল করে নেয়। অসংখ্য তুর্কী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বালাঞ্জারের পুরো এলাকা মুসলমানদর দখলে এসে যায়।

ঐ সময় খাকানের পুত্র মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। খাযার ও অন্যান্য গোত্রের লোক প্রতিশোধ স্পৃহায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়াদানে এসে জড়ো হয়। ঐ সময় তুর্কীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। মুসলমানগণ তখন বালাঞ্জর অতিক্রম করছিল। স্বয়ং তারা নিরলস প্রচেষ্টায় স্বীয়

e-ilm.weebly.com

বাহিনীকে বিপদমুক্ত করে অতি দ্রুত বাবুল আবওয়াবে ফিরে আসে। মাসলামার গৃহীত কৌশল যদিও যুক্তিসংঘত ছিল, তথাপিও একে তার দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং ১১৪ হিজরীতের হিশাম মাসলামাকে ফেরত নিয়ে তার স্থলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদকে নিয়োগ করেন। মারওয়ান বিন মুহাম্মদ এক লাখ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে খাযারের এলাকায় আক্রমণ করেন। সারা এলাকা এক দিক থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদানত করেন এবং শহর ও অনেক দূর্গ দখল করে। আর মারকাজ, তাওয়ান, জিরকান, হামজান, সাকদান, লাকাজ ও শারওয়ানের শাসকের নিকট থেকে যে কোন অবস্থায় আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করেন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কর আদায়কারী নিয়োগ করে। মোটকথা, মারওয়ান বিন মুহাম্মদ আর্মোনিয়া ও আজার বাইজারে সমস্ত এলাকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সমুদ্রের নিকটবর্তী সমস্ত শহর মুসলমানদের দখলে এসে যায়। আর খাযারের শাসন কর্তা লজ্জিত হয়ে উপকূলীয় এলাকায় পালিয়ে যায়। –ইবনি আছীর।

এশিয়া ছোট

ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে মুসলমানদের ও রোমানদের সর্বদা ঝগড়া বিরোধ লেগেই থাকত। কেননা বিরাট রোম সাম্রাজ্যের সাথে মুকাবিলার বিষয় জড়িত ছিল। এ কারণে এ দিকে মুসলিম খলীফাদের মনোযোগ অনেক বেশী ছিল। সর্বদা শীত ও গ্রীস্মকালীন যুদ্ধ চলতে থাকত। আর ঐ সব বাহিনীর নেতৃত্ব দান করত খ্যাতনামা সেনাপতিগণ কিংবা শাহী বংশের উল্লেখযোগ্য বরেণ্য ব্যক্তিগণ। মারওয়ান বিন মুহাম্মদ, মাসলামা বিন আবদুল মালিক, মু'আবিয়া বিন হিশাম ও সুলাইমান বিন হিশাম এ অঞ্চলে ইসলামী শক্তির দুর্জয় সাহসীকতা প্রদর্শন করেন। কাউনিয়া, খারসানা, কায়সারীয়া ও অন্যান্য অনেক শহর রোমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন।

এছাড়া আবদুল্লাহ বাত্তাল, আবদুল ওহাব বাখত দুজন নিবেদিত প্রাণ সেনাধক্ষ সর্বদা শত্রুদের হতবিহবল করে রাখতেন। আবদুল্লাহ বাত্তাল রোমানদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার বীরত্বের কথা শুনলে ঐ এলাকার মানুষের চেহারা ভয়ে বিমুর্ষ হয়ে যেত। আবদুল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন, একবার গোপনে রোমানদের এক গ্রামে ডুকে পড়ে দেখি এক মাতা তার শিশুকে এ বলে কাঁদতে নিষেধ করছে যে, হে শিশু! যদি তুমি কান্না কাটি করো। তাহলে আমি বাত্তালকে ডেকে নিয়ে আসব। এর পরও তার বাচ্চা কান্নাকাটি করতে থাকে, তখন সে বাচ্চাকে কোল থেকে বের করে বলল, হে বাত্তাল! তুমি এসে একে নিয়ে যাও। বাত্তাল তাৎক্ষনিকভাবে তার গৃহে প্রবেশ করে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চুমু দিতে শুরু করেন। বাচ্চার মা এ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।আবদুল ওহাব বিন বখতও একজন খ্যাতনামা তাবেঈ

e-ilm.weebly.com

ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে বাত্তালের সাথে সাথে থাকতেন। ১১৩ হিজরীর যুদ্ধে বাত্তালের সাথীরা রোমানদের বিরুদ্ধে কোন এক ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করে পলায়নের ইচ্ছা করেছিল। আবদুল ওহ্হাব তার অশ্বকে চাবুক মেরে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যান। তারপর চিৎকার করে বলতে শুরু করেন– হে বাহাদুর গণ! এদিকে এসো! এটাই জান্নাতের রাস্তা। আফসোস! তোমরা জান্নাতের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে? তারপর যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। – আল বিদায় ওয়ান নিহায়া– ৯/৩০৪-৩২১

এ দুজন বাহাদুর সম্পর্কে আরো অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। তাছাড়া ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরাট নৌ-বহর ছিল। এ বাহিনীর সাহায্যে নৌপথে রোমান সাম্রাজ্যে হামলা চালানো হত। হিশামের শাসনকালে আবদুল রহমান বিন মু'আবিয়া বিন খাদিজ নৌ-সেনাপতি ছিলেন। আর আবদুল্লাহ বিন উকবা নৌ-বাহিনীর একজন খ্যাতনামা অফিসার ছিলেন।

হযরত যায়েদ বিন আলী রাযি. এর শাহাদত

বনী হাশেম খিলাফতের বিষয়ে বনী উমাইয়াদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তথাপি হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে কারবালার ময়দানে যে জঘন্য নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, সে কারণে বনী হাশেমগণ দীর্ঘ দিন নীরবতা অবলম্বন করে ছিল। হযরত ইমাম যয়নাল আবেদীন বিন আলী বিন হুসাইন রাযি. অন্যদের চক্রান্ত ও নিজেদের বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, তিনি কস্মিনকালেও খিলাফত লাভের চিন্তা ভাবনা করতেন না। কিন্তু নতুন প্রজন্মের মনে গোপনে এ বাসনা জাগ্রত হতে থাকে। তাদের এ দাবী ক্রমেই তাদের মুখ দিয়ে বের হতে শুরু করে।

হিশাম বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে খান্দানে নবুওয়াতের এক বুযুর্গ হযরত যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রাযি. ও এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেন। একবার তিনি তাঁর খান্দানী ওয়াকফ সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে দামেশকে গমন করেন। খলীফা হিশাম তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সাথে সৌজন্য মূলক আচরণ করা তো দূরের কথা বরং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাকে সাক্ষাত করার সুযোগই দেয়নি। পরে অবশ্য সাক্ষাত করার জন্য এক বিরাট উঁচু মহলে আহবান করেন। হযরত যায়েদ বিন আলী রাযি. স্থলদেহী হওয়ায় উক্ত মহলে প্রবেশ করতে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। অবশেষে উভয়ের মধ্যে আলোচনা শুরু হলে হযরত ইমাম যায়েদ রহ. কোনো এক কথা প্রসঙ্গে শপথ করে বসেন। হিশাম বললেন– আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। যায়েদ রহ. বললেন, "হে হিশামা! এত অহংকার ভালো নয়। পার্থিব ইজ্জত সম্মান অর্থ, প্রতিপত্তি মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির দলীল নয়।"

e-ilm.weebly.com

এর পর হিশাম ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন- হে যায়েদ আমি বুঝতে পারছি যে তুমি খিলাফত লাভের আকাঙ্খা পোষণ কর। অথচ তুমি একজন দাসীর গর্ভজাত সন্তান।" তার কথার প্রতিবাদ করে হযরত ইমাম যায়েদ রাযি. বললেন, হযরত ইসমাইল আ. ও দাসীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। আর তাঁর ভাই হযরত ইছহাক আ. প্রমুখ স্বাধীন নারীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর ভ্রাতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে হযরত খাতেমুল আম্বিয়া আ. কে তাঁর বংশে পাঠিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির মান-সম্মান এর চেয়ে আর কি হতে পারে যে, তাঁর নানা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাঁর পিতা হযরত আলী রাযি.?

উক্ত আলোচনার পর হিশাম তাঁকে মজালিস ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন।

এর পর হযরত যায়েদ বিন আলী রাযি. সিরিয়া থেকে কুফায় আগমন করেন। কুফা বাসীগণ তাদের পূর্বে অভ্যাস অনুযায়ী গোপনে তাঁর সাথে সাক্ষাত করত এবং তাকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দান করে খিলাফতের প্রতি উৎসাহ দিত। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আবু জাফরের সাথে পরামর্শ করেন। আবু জাফর বললেন, ইরাকীদের কথায় কখনো নির্ভর করা যায় না। তারা আমাদের বাপ দাদাকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু তারপরও হযরত যায়েদ রহ. কুফাবাসীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে যান। ১৫ হাজার কুফাবাসী গোপনে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। অধিকন্তু তারিখ নির্ধারন করে যে, সে দিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা দেবে।

কুফার শাসক ইউসুফ বিন উমর পূর্ব থেকে এ ষড়যন্ত্রের খবর জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি কুফার কর আদায় কারীকে কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। বাই'আত গ্রহণ কারীগণ যখন জানতে পারে যায়েদের উপর সরকারের কঠোর চাপ শুরু হয়েছে, তখন তারা ইমামের সাথে প্রতারণা করে ইমাম থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ইমাম যায়েদের নিকট গিয়ে তাকে প্রশ্ন করে, আবু বকর ও উমর রাযি. সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? ইমাম যায়েদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বীয় রহমতে স্থান দিয়েছেন। আমি আমার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের তাদের প্রশংসা করতে শুনেছি। বেশীর থেকে বেশী এ কথা বলতে পারি যে, আহলে বাইতে নবুওয়াত খিলাফতের বেশী হকদার। ঐ বুযুর্গগণ নিজেকে আহলে বাইতে নবুওয়াতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। তথাপি এটা কুফর ও ইসলামের কোনো ব্যাপার নয়। তারা তাদের যুগে আদল ও ইনসাফের সাথে কাজ করেছেন। আর কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমলকারী ছিলেন।

কাফাবাসীগণ বলল, তাহলে আমরা বনী উমাইয়াদের সাথে লড়াই করব কেন? তাদের অবস্থাও তাই।

ইমাম যায়েদ বললেন, তাদের অবস্থা ভিন্ন ধরনের। তারা নিজের ও অন্যদের উপর যুলুম করছে। আর আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর আমল করার আহবান করছি। তাই তোমাদের আমার সাহায্য করা উত্তম।

e-ilm.weebly.com

কিন্তু এ সব লোক নিজেদের বদনাম দূর করার জন্য এসেছিল। অতঃপর এই বলে চলে গেল যে, "যদি আপনার এ ধারনা হয় তাহলে আপনার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" অবশেষে তাদের আত্ম প্রকাশের চূড়ান্ত ঐ রাত এসে যায়। ঐ রাতে মাত্র ২১৮ জন সংগী-সাথী নিয়ে হযরত ইমাম যায়েদ রহ. ময়দানে উপস্থিত হন। এদিকে ইউসুফ বিন উমায়ার বিরাট একদল নিয়ে মুকাবিলার জন্য হাজির হন। হযরত যায়েদ রাযি. মুষ্ঠিমেয় কয়েক জন সংগী নিয়ে জীবন বাজী রেখে মুকাবিলা করেন। অবশেষে পবিত্র কপালে তীর বৃদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হন।

শহীদ হওয়ার পর ইউসুফ বিন উমর তাঁর পবিত্র দেহ কবর থেকে উঠিয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখেন। –ইবনি আছীর– ৮/৯১

আব্বাসীদের আহবান

হযরত আলী রাযি. এর ফাতেমী বংশধরগণ ছাড়াও বনী হাশেমের অন্যান্য উত্তরসূরীগণ খিলাফত লাভের আশাবাদী ছিল। তাদের মধ্যে হযরত আলী রাযি. এর গায়রে ফাতেমী বংশধর মুহাম্মদ বিন হানীফিয়া এবং হযরত আব্বাস বিন আবু তালেবের পরিবারবর্গও ছিল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল মালিকের সময় মুখতার সাকাফী ও অন্যান্য শী'আনে আলী হযরত ইমাম যয়নাল আবেদীন রহ. এর খিলাফতের দাবী অস্বীকার করার পর মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে ইমামতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। যদিও পরবর্তী সময় মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া আবদুল মালিকের বাই'আত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুসারীগণ তাঁকে ইমাম হিসেবে সমর্থন করতে থাকে। তাঁর ওফাতের পর তাঁর পুত্র আবু হাশেমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা হয়।

যদিও হযরত আব্বাস রাযি. হুযুর ﷺ অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী ছিলেন, তথাপি তিনি ও তাঁর সম্মানিত পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. কখনো খিলাফত লাভের আশা পোষণ করেন নি। কিন্তু হযরত আব্বাস রাযি. এর পৌত্র আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. মনে মনে খিলাফত লাভের আশা পোষণ করতেন। তিনি মদীনা ও দামেকের রাস্তায় " হামীমাহ" নামক একটি গ্রাম তাকে সরকারের পক্ষ থেকে জায়গীর হিসেবে দেওয়া হয়। তিনি ওখানে বসবাস করতেন।

১০০ হিজরীতে আবু হাশেম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে রাজধানী দামেশকে আগমন করেন। সুলাইমান তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানপ্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা দেখে তার ব্যাপারে আশংকাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি যখন দামেশকের সীমানা থেকে বের হন, তখন তাকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করা হয়।

e-ilm.weebly.com

আবু হাশেম নিজের অবস্থা বিপদজনক দেখে "হামীমা" নামক স্থানে আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট যাত্রা বিরতি করেন। এখানেই তার ইনতিকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে আবু হাশেম আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের পুত্র মুহাম্মদকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। আর তার ভক্তদের তাকে সাহায্য-সহায়তা করার উপদেশ দান করেন।

আবূ হাশিমের উপদেশ মুহাম্মদ বিন আলীর জন্য খুবই মঙ্গলজনক হয়। কাইসানীয়া দল (হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফীয়ার অনুসারীগণ) যাদের সংখ্যা ইরাক, খোরাসানে অনেক বেশী ছিল, তারা তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তাকে ইমামতের আসনে অধিষ্ঠিত করে। এভাবে ইমামত বনূ উমাইয়াদের থেকে আব্বাসী বংশধরদের হাতে চলে যায়।

মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বিচক্ষণ সংগঠক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি ইমামতের আন্দোলনের এক রূপরেখা নির্ধারণ করেন। আর কুফা ও খোরাসানকে ঐ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র মনোনীত করেন। তা হযরত আলী রাযি. অনুসারীদের ঘাটি নামে খ্যাত ছিল। খোরাসানকে এ কারণে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনারব বাদশাহদের রীতি অনুযায়ী ওখানে স্থায়ী বাসিন্দগণ খিলাফতের বিষয় উত্তাধিকারের নীতিকে সহজ করে নেয়। আর শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর যে কোন প্রকার আন্দোলকে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ মনে করত।

কুফায় মুহাম্মদ বিন আলীর গৃহভৃত্য মাইসারাকে কর্তা মনোনীত করা হয়। আর খোরাসানে আবু মুহাম্মদ সাদেক, মুহাম্মদ বিন বোনাইস, ও হাইওয়ান মাতাকে আবু মুহামাদের সাহায্যকারী মনোনীত করে। আবু মুহাম্মদ ১২ জন অভিজ্ঞ দাইকে খোরাসানের আন্দোলনের নেতা মনোনীত করে। আর ঐ ফিকহাবিদদের বিশেষ মজলিশ অধীনে ৭০জন দাঈদের সাধারণ মজলিশ গঠন করা হয়। মুহাম্মদ বিন আলী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য যুক্তিসংগত নিয়ম-কানুন তৈরী ও কার্যকর করে। যাতে গোপন রহস্য প্রকাশ হতে না পারে।

মোটকথা, বনী উমাইয়াদের শাসন ক্ষমতা উলটপালট করার উদ্দেশ্যে অতি গোপনীয়তার সাথে এই আন্দোলন শুরু হয়। বনী আব্বাসের সংগঠকগণ ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকের বেশ ধারন করে সারা ইরাক ও খোরাসানে ছড়িয়ে পড়ে। আর বনী উমাইয়াদের নিষ্ঠুরতা অত্যাচার ও বনী আব্বাসের অধিকার সমূহের প্রচার শুরু করে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর আন্দোলনের সূচনাতে হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের মত সৎ ও কোমল অন্তরের অধিকারী খলীফার যুগ পেয়ে যান। তাঁর গুণাবলী দ্বারা সে অবৈধ ফায়দা উঠায় এবং তার সময়ে এ আন্দোলন বিনা বাঁধায় প্রবল আকার ধারন করে।

e-ilm.weebly.com

ইয়াযিদ বিন আবদুল, মালিকের যুগে খোরাসানের আমীর সাঈদ খুযাইনা ঐ দলের কিছু লোককে বন্দী করে। কিন্তু তারা বলে আমরা সকলে ব্যবসায়ী! রাজনীতির সাথে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমীর কিতপয় সম্মানি ব্যক্তির জামানত নিয়ে তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন।

হিশামের শাসনামলে বুকাইর বিন মাহান ও অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণে এ আন্দোলন ভয়াবহরূপ ধারণ করে। আসাদ বিন আবদুল্লাহ কাসরী তার শাসনামলে একাধিক দাঈকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যাও করেন। কিন্তু এ কঠোরতা কোনো সুফল বয়ে আনেনি বরং আন্দোলনের নেতাদের জীবন উৎসর্গের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। আন্দোলন অব্যাহত চলতে থাকে।

বুকাইর বিন মাহান, যে মায়সারার মৃত্যুর পর কুফার আন্দোলনের নেতা মনোনীত হয়– যখন মুহাম্মদ বিন আলীকে এ সব জীবন উৎসর্গকারীদের বিষয় খবর দেওয়া হয়, তখন ওখান থেকে জবাব আসে,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যে, তোমাদের আহবান ও পয়গামের সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে হকের এ দাওয়াত আরো বেশী প্রাণ উৎসর্গ কারীর প্রত্যাশি হয়েছে। –ইবনি আছীর– ৫/ ৫১

১২৫ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মদ বিন আলীর ইনতিকাল হয়। তার জেষ্ঠ্য পুত্র ইবরাহীম ও পূর্ণোদ্যমে এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। তার সময়ের শুরুতে খ্যাতনামা প্রচারক আবু মুসলিম সময়ের সদ্ব্যহার করে এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হয়। আর সে এ নীরব আন্দোলনকে বিপদজনক আন্দোলনে রূপান্তর করে দেয়। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উত্তারাধিকারী মনোনয়ন

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক তারপর হিশাম বিন আবদুল মালিক ও তার জৈষ্ঠ্য পুত্র ওয়ালীদকে ধারাবাহিকভাবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। হিশাম ওয়ালীদ সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বীয় জৈষ্ঠ পুত্র মাসলামাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কোন কোন আমীর উমারাহদের বিরোধীতার কারণে হিশামের চেষ্টা সফল হতে পারেনি। তবে হিশাম ও ওয়ালীদের শত্রুতা শুরু হয়ে যায়। ওয়ালিদ তার জমীদারী এলাকায় চলে যায়। আর হিশাম মৃত্যু পর্যন্ত ওখানে বসবাস করতে থাকেন।

হিশামের মৃত্যু

৬ রবিউল আউয়াল ১২৫ হিঃ তে হিশাম বিন আবদুল মালিক রাছাকা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। প্রায় বিশ বছর তিনি শাসন কার্য করেছেন।

e-ilm.weebly.com

হিশাম বিন আবদুল মালিকের চরিত্র

বনী উমাইয়াদের তিনজন খ্যাতনামা খলীফার মধ্যে হিশাম বিন আবদুল মালিক একজন। যারা ইতিহাসের পাতায় স্ব-স্ব রাজনৈতিক বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ঐ তিন জনের মধ্যে প্রথম হলেন হযরত মু'আবিয়া রাযি. যিনি উমাইয়া শাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় হলেন আবদুল মালিক। যিনি উমাইয়া শাসনের নড়বড়ে প্রাচীরকে পুনঃনির্মান করতে সক্ষম হয়েছেন। তৃতীয় হলেন হিশাম বিন আবদুল মালিক, যিনি ঐ ইমারত পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, হিশাম দূরদর্শি মিতব্যয়ি সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী শাসক ছিলেন। রাজ্যের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয়েও নখ দর্পনে ছিল। তিনি সাহসীকতা ধৈর্য্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। -আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৯/৩১৫

সৌভাগ্যক্রমে বিশ বছরের মত সময় রাজ্য শাসন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি উক্ত গুণাবলীর সাহায্যে রাজ্য শাসন করে উমাইয়া শাসনের সূর্যকে অর্ধ দিন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

শত্রুরাও তার শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেছে। আবদুল্লাহ বিন আলী আব্বাসী বলেছেন, "আমি বনী উমাইয়াদের সব খলীফার শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেছি। কিন্তু হিশামের শাসনামল সাধারণ প্রজাদের জন্য সর্বোত্তম পেয়েছি।"

তিনি তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মাদায়েনী বলেছেন, "বনী উমাইয়াদের কোন শাসককে হিশাম থেকে বেশী কর্মকর্তা ও সরকারী দফতরের প্রতি সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখতে দেখিনি। অর্থনৈতিক বিষয়ে তার পরিকল্পনা ছিল ভীষণ কঠোর। অপব্যয় আদৌ সহ্য করতেন না। কিন্তু বৈধ খাতসমূহ বিশেষ সতর্কতার সাথে সমাধা করতেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে এত বেশী কঠোরতা আরোপের দরুণ জনসাধারণের নিকট তিনি কৃপণ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তার সামাজিক জীবন-যাপন অতি স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ খাবার ও সাধারণ পোশাক ব্যবহার করতেন। ইকাল বিন মুশবেহ বলেছেন, হিশাম যখন আমাকে খোরাসানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তলব করেছিলেন, তখন আমি তার পরিধানে সাধারণ এক সূতি জামা দেখছি। আমার স্মরণ হয় যে, খলীফা মনোনীত হওয়ার সময় তার পরিধানে এ ধরনের জামাই ছিল। হিশাম আমার দৃষ্টি বুঝতে না পেরে বলতে শুরু করলেন, কি ব্যাপার? আমি বললাম, খলীফা মনোনয়নের সময়ও আপনাকের এ ধরনের পোশাক পরিহিত দেখেছি। এটা সে জামা তো নয়? হিশাম শপথ করে বললেন, এটা সেই জামা-ই। এছাড়া আমার কোন জামা নেই।

- ইবনি আছীর-- ৯৬ ৫ম খণ্ড।

আচার-আচরণের দিক থেকেও তিনি স্বাভাবিক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার আচার-আচরণে রাজকীয় গর্ব ও অহংকার ফুঠে উঠত না। তিনি নির্দ্বিধায় স্বীয় ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে নিতেন। একবার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গালি

e-ilm.weebly.com

দিয়ে বসেন। সেই ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে বলল, যুগের খলীফা হয়েও কি আপনার গালি দিতে লজ্জা করে না? হিশাম ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলেন, তুমি আমার উপর থেকে এর চেয়ে আরো বেশী প্রতিশোধ নিয়ে নাও। ঐ সম্মানী ব্যক্তি বলল, এর অর্থ এই যে আমিও যেন আপনার মত নিকৃষ্ট হয়ে যাই। তখন হিশাম বলল, তুমি কিছু উপহার গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। ঐ ব্যক্তি বলল, আমি তাও করতে পারব না। তারপর হিশাম বলল, তাহলে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দাও। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, হাঁ এটা হতে পারে। আমি আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে হিশাম মস্তক অবনত করে অনুশোচনার সাথে বলল", আল্লাহ কসম! ভবিষ্যতে আর কখনো এরূপ আচরণ করব না।

–ইবনে আছীর– ৯৭ পৃঃ ৫ম খন্ড।

ভোগ বিলাশের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। একবার তিনি পিতাকে পত্র লিখে ছিলেন, আমার মহলে সোনালী দেহী ও অতি চিত্তাকর্ষক অপরূপা সুন্দরী দাসী রয়েছে। কিন্তু আমি তাদের কাউকে সম্ভোব করি না। অনুরূপভাবে নাচগান ও খেলাধুলার প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি বরং এ সব ঘৃণা করতেন। যাকে এ সব কাজে লিপ্ত দেখতেন, তাকেই কঠোর শাস্তি দিতেন। একবার এ অপরাধে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে তার সামনে হাজির করা হয়। সে গান বাজনাকে তার পেশা হিসেবে বেঁছে নিয়েছিল। হিশাম তার বাদ্যযন্ত্র তার মাথায় ভেংগে ফেলার নির্দেশ দান করেন। তার আদেশ পালন করার পর ঐ ব্যক্তি কাঁদতে শুরু করে। হিশাম বললেন, ধৈর্য্যের সাথে কাজ করো। ঐ ব্যক্তি বললেন, কষ্টের কারণে কাঁদছি না। বরং ঐ খারাপ কাজের জন্য কান্নাকাটি করছি। এজন্য কাঁদছি যে, আজ বারবাতকে ও তবলা বলা হচ্ছে।

–আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৫২ পৃঃ ৯ম খণ্ড

আকীদা ও আমলের দিক থেকে হিশাম একজন সত্যনিষ্ঠ ও পাকা মুসলমান ছিলেন। একদিন জুমার নামাযে তিনি স্বীয় পুত্রকে অনুপস্থিত দেখে তাকে এ সম্পর্কে জবাবদেহী করেন। শাহযাদা আপত্তি উত্থাপন করে বলে, আমার সাওয়ারী অকেজো হয়ে পড়েছিল। হিশাম বললেন, তুমি পায়ে হেটেও তো আসতে পারতে। তারপর তাকে এক বছর সাওয়ারী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা করেন।

– ইবনি আছীর– ৫/৯৬-৯৯

রোমান ও ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ এবং অন্যান্য বিজিত এলাকার লোকদের সাথে মুসলমানদের মিলিত হওয়ার কারণে পূর্বে মুসলমানদের ঈমান আকীদা যেরূপ সুদৃঢ় ও মজবুত ছিল, তা বহাল রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সর্বপ্রথম হিশামের শাসনামলে জাদ বিন দিরহাম خلق قران বা "কুরআন সৃষ্টি বস্তু" এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ হয়। হিশাম ইরাকের শাসক খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসরীর দ্বারা তাকে ঈদুল আযহার দিন হত্যা করে ফেলেন।

– ইবনি আসির ৯৬-৯৯ পৃঃ ৫ম খণ্ড।

e-ilm.weebly.com

অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম গাইলান বিন ইউনুছ হযরত উমর বিন আবদুল আযিজ রহ. এর শাসনামলে কাদরিয়া মতবাদ প্রকাশ করেছিল। হযরত উমর বিন আবদুল আযিজ রহ. তাকে বুঝানোর পর সে তাওবা করতে বাধ্য হয়। হিশামের শাসনামলে পুনরায় সে ঐ মনোভাব প্রকাশ করলে হিশাম তাকে হত্যা করে ফেলেন।

হিশামের শাসনামলে বিরাট বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে সর্বদা ইসলামের ঝাণ্ডা সমোন্নত ছিল। তুর্কীস্থান ও আজার বাইজানে তুর্কী ও তাতারিদের কোমর ভেংগে দেওয়া হয়। সিন্ধুর বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং তথায় নতুন করে মুসলমানদের বসতি স্থাপনা করে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা হয়। ছোট এশিয়ার অনেক দূর্গ মুসলমানগণ রোমান হাত থেতে ছিনিয়ে নেয়। উত্তর আফ্রিকায় বারবার বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে সেই বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেখান থেকে কয়েক বার ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনা করা হয়। মোটকথা, সব দিক থেকে হিশামের যুগকে স্বার্থক বলা যায়। কিন্তু আক্ষেপের ব্যাপার হল, উমাইয়া শাসনের উষার আলোর সৌন্দর্যের তৈল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। অবশেষে এক দিন সম্পূর্ণরূপে নিস্প্রভ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক
১২৫ হিঃ—১২৬ হিঃ

ওয়ালীদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান স্বীয় পিতা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের উপদেশ অনুযায়ী হিশামের ইনতিকালের পর ১২৫ হিজরীর রবিউছ ছানী মাসে জর্ডানে সিংহাসনে আরোহন করেন।

ওয়ালিদ একজন সংকীর্ণমনা উগ্রমেজাজী ও বিলাস প্রিয় শাসক ছিলেন। গান বাজনা ও জমজমাট আডডা ব্যতীত কোনো কিছু তার প্রিয় ছিল না। হিশাম পূর্বে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা থেকে বঞ্চিত করে স্বীয় পুত্র মাসলামাকে খলীফা মনোনীত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তার এ প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পূবের্ই হিশাম পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যান। হিশামের এ পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে ওয়ালীদ তার উপর ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। সে রাজধানী ত্যাগ করে স্বীয় জায়গীর জর্ডানে এক ঝর্ণার নিকট বসবাস শুরু করে। ওয়ালীদ ওখানে হিশামের মৃত্যুর খবর শুনে সর্বপ্রথম আব্বাস বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে আদেশ দেয়, তুমি অতি দ্রুত রাছাকা পৌছে হিশামের পরিবারের লোকদের নজর বন্দী করে ফেল এবং তাদের সমূদয় অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নাও। তবে সে মাসলামার সাথে নমনীয় আচরণ করার নির্দেশ দান করে। কেননা সে স্বীয়

e-ilm.weebly.com

পিতার সাথে ঐক্যমতে উপনীত হয়নি। আব্বাস বিন আবদুল মালিক রাছাকা পৌঁছে ওয়ালিদের আদেশ পালন করে।

ওয়ালীদ সম্পদশালী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও রেহাই দেয়নি, যারা ওয়ালীদের বিরোধীতা করে হিশামের পক্ষাপাতিত্ব করেছে। ওয়ালীদ তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাদেরেকে লাঞ্ছিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। হিশামের দুই মামা মুহাম্মদ ও ইবরাহীমকে পায়ে বেড়ী লাগিয়ে দামেশকে তলব করে। ওখানে তাদের বেত্রাঘাত করা হয়। তারপর তাদেরকে ইরাকের শাসন কর্তা ইউসুফ বিন উমরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ইউসুফ তাদেরকে কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে। সুলাইমান বিন হিশামকে গ্রেফতার করে একশ বেত্রাঘাত করা হয়। চুল-দাড়ি মুণ্ডন করে তাকে ওমানে বহিস্কার করা হয়। ইয়াযিদ বিন হিশামকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। রূহ বিন ওয়ালিদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। ওয়ালীদের একাধিক সন্তানকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

ইরাকের শাসনকর্তা খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসরী ইয়ামানী বংশধরদের খ্যাতনামা সরদার ছিল। ওয়ালীদ তার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে, তার পর তার দু পুত্র হাকাম ও উসমানের উত্তরাধিকারীর বাই'আত গ্রহণ করে নেবে। খালিদ এ আদেশ অমান্য করায় ওয়ালিদ তাকে তার জাত দুশমন ইউসুফের হাতে সোপর্দ করে। সে উলংগ করে তার উপর এক চাদর উড়িয়ে দেয়। আর তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে হত্যা করে। –ইবনে আছীর– ৫/১০২।

খালিদের সাথে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করার কারণে ইয়ামানবাসী ও কাযা গোত্রের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা শুরু হয়। অথচ এ গোত্রসমূহ বনী উমাইয়াদের ডান হাত ছিল।

ইয়াহইয়া বিন যায়েদের উত্থান ও শাহাদত লাভ

১২৫ হিজরীতে ইয়াহইয়া বিন যায়েদের শাহাদাতের ঘটনা সংঘঠিত হয়। বিস্তারিত ঘটনা হল, ইয়াহইয়া স্বীয় পিতা যায়েদ বিন আলীর শাহাদাতের পর খোরাসান চলে যান এবং বল্‌খে তার এক সমর্থক হুরাইশ বিন উমর নিকট অবস্থান করে। ইরাকের শাসক ইউসুফ বিন উমর খোরাসানের শাসক নছর বিন সাইয়ারকে খবর দেয় যে, তুমি ইয়াহইয়াকে বন্দী করে ফেল। নছর হুরাইশকে তলব করে ইয়াহইয়াকে তার নিকট সোপর্দ করার আদেশ দেয়। হুরাইশ অপরাগতা প্রকাশ করে। কিন্তু নছর যখন কঠোরতা আরোপ করে তখন হুরাইশের পুত্র ইয়াহইয়ার খবর জানিয়ে দেয়। আর নছর ইয়াহইয়াকে বন্দী করে ফেলে। ওয়ালিদ ইয়াহইয়ার গ্রেফতার হওয়ার খবর জেনে নছরকে সংবাদ দেয়, ইয়াহইয়াকে গ্রেফতার করার প্রয়োজন ছিল না। তবে তাকে খোরাসান থেকে সিরিয়াতে পাঠিয়ে দাও।

e-ilm.weebly.com

নছর ইয়াহইয়াকে দু হাজার দিরহাম দিয়ে তাকে সিরিয়া যাবার উপদেশ দেয়। ইয়াহইয়া সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে বুহাইক নামক স্থানে পৌঁছে তার সন্দেহ হয়, নাজানি কখন সে ধোঁকায় পড়ে যায়। সুতরাং সে নীশাপুরে ফিরে যায়। আর ওখান থেকে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

নীশাপুরের শাসক আমর বিন জাররাহ নছরকে সব বিষয় অবগত করেন। নছর তার মুকাবিলা করার আদেশ দেন। আমর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়াহইয়ার মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়ে। ইয়াহইয়া সত্তর জন সংগী-সাথী নিয়ে তাকে পরাজিত করে ফেলে। যুদ্ধে আমর বিন জাররাহ নিহত হয়। নছর এ বিপদের সংবাদ অবগত হয়ে সালেম বিন আহওয়াজকে তার মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। জুরজানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। হঠাৎ এক তীর এসে ইয়াহইয়ার কপালে বৃদ্ধ হয়। ফলে ইয়াহইয়া শহীদ হয়ে যায়। তার মৃত দেহ জুরজানের সদর রাস্তায় ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

– ইবনি আসির– ৫/৯৯।

ইয়াযিদের বিদ্রোহ

উল্লেখিত ঘটনাবলীর কারণেই সর্বস্তরের জনগণ ওয়ালিদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। শাহী খান্দানের লোকজনও তার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ স্বীয় স্বভাব চরিত্র ও সদাচারণের গুণে খ্যাত ছিল। তাকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করা হয়। ইয়ামানী গোত্র সমূহ যাদের উপর সরকারের সামরিক বাহিনীর শক্তি নির্ভরশীল ছিল, তারা গোপনে তার হাতে বাই'আাত গ্রহণ শুরু করে। মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান যে ঐ সময় আর্মোনিয়ায় অবস্থান করেছিল। সে এ ঘটনাবলী জানার পর এ সব পদক্ষেপ গ্রহণে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সে সাঈদ বিন আবদুল মালিককে পত্র লেখে যে, "জন সাধারণকে এ বিদ্রোহের আগুনে ঝাপিয়ে পড়া থেকে বারণ করো। আমার আশংকা হচ্ছে, আমাদের গৃহযুদ্ধের কারণে আমাদের শত্রুরা উপকৃত হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সাঈদের মনে এ আশংকা দেখা দেওয়ায় সে মারওয়ানের ঐ চিঠি আব্বাস বিন ওয়ালীদের নিকট পৌঁছে দেয়, যাতে সে তার ভ্রাতা ইয়াযিদ বিন ওয়ালীদকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাতে পারে। আব্বাস ইয়াযিদকে ডেকে তাকে আদ্যোপান্ত সব বুঝিয়ে গৃহযুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার পরামর্শ দেয়। ইয়াযিদ তার সফলতা লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। আব্বাসের কথায় সে বাহ্যিকভাবে এ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু গোপনীয়ভাবে সে তার কাজে লিপ্ত থাকে।

ওয়ালীদকে হত্যা

যখন ইয়াযিদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন সে রাজধানী দামেশক দখল করে নেয়। ওয়ালিদ ঐ সময় উমানের অন্তর্গত আযাফে অবস্থারত ছিলেন।

e-ilm.weebly.com

ইয়াযিদ আবদুল আযীয বিন হাজ্জাজ বিন আবদুল মালিককে বিরাট একবাহিনী নিয়ে ওয়ালিদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। ওয়ালিদের কোনো শক্তিশালী বাহিনী ছিল না। তিনি মুকাবিলা করেন বটে, কিন্তু নিরাশ হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে নিজগৃহে ফিরে এসে কুরআন তিলাওয়াতে বসে যান। আর ঐ অবস্থায় তিনি নিহিত হন। ওয়ালিদের ছিন্নমস্তক দামেশকে ইয়াযিদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনা জমাদিউস সানী ১২ হিজরীতে সংঘঠিত হয়। ওয়ালিদ ১ বছর তিন মাস শাসন কার্য পরিচালনা করেছিল।

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক,
ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

(১২৬ হিঃ –১২৭ হিজরী।)

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, তার মাতা শাহ করযন্দ বিনতে ফিরোজ বিন ইয়াজিদ ইরান সম্রাটের কন্যা ছিল। ওয়ালিদ নিহত হওয়ার পর জমাদিউল আখির ১২৬ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওয়ালিদ তার শাসনামলে সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি করে ছিল, ইয়াযিদ ঐ বাড়তি বেতন রহিত করে দেয়। এ কারণে তাকে অসমাপ্ত বলা হয়।

ইয়াযিদ যদিও ইবাদতকারী ও খোদাভীরু খলিফা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ওয়ালিদকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এতে ইয়ামানী সৈনিকদের সহায়তা লাভ করে সফল হয়েছিলেন। এ কারণে ওয়ালিদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও মিশরবাসীগণ যারা ইয়ামানীদের প্রতিপক্ষ ছিলো, তারাও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। এভাবে ইয়াযিদের সিংহাসনে আরোহণের পর তাৎক্ষণিকভাবে একদিকে শাহীমহলে বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আর অপরদিকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘুমন্ত গোত্রীয় শত্রুতা জাগ্রহ হয়ে যায়।

সাধারণ বিদ্রোহ

সর্বপ্রথম হিমছে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা ইয়াযিদের খিলাফতকে অস্বীকার করে। হিমছের গভর্নর মারওয়ান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিক তাদের সহায়তা করে।

হিমছবাসীগণ মু'আবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন হুসাইনকে তাদের নেতা মনোনীত করে। ইয়াযিদের মুকাবিলার জন্য দামেশক অভিমুখে যাত্রা করে। ইয়াযিদ এ খবর জানার পর ইয়াকুব বিন হানী ও অন্যান্য লোকদেরকে হিমছবাসীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি আরও বলে দেন যে, আমার খিলাফতের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। যদি আমাকে তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তোমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করে নাও। কিন্তু হিমছবাসীগণ

e-ilm.weebly.com

ইয়াযিদের এ প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করে এবং মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। ইয়াযিদ তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সুলাইমান ইবনে হিশামের নেতৃত্বে বিশাল একবাহিনী প্রেরণ করে। সুলাইমান দামেশক থেকে যাত্রা করে হাওয়ারিন পৌঁছে। মারওয়ান বিন আবদুল্লাহ হিমছ বাসীদের বলল, দামেশকে না গিয়ে হাওয়ারিন পৌঁছে সুলাইমানের মুকাবিলা করো। হিমছবাসীরা তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মারওয়ানকে ইয়াযিদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখার অভিযোগে করে হত্যা করে ফেলে। অন্তত তার স্থলে আবু মুহাম্মদ সুফিয়ানকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে হিমছবাসী দামেশকের দিকে অগ্রসর হয়। তখন সুলাইমানও তাদের বাঁধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সুলাইমানীয়া নামক স্থানে উভয়বাহিনী একত্রিত হয়। এদিকে ইয়াযিদ আবদুল আযীয বিন হাজ্জাজের নেতৃত্বে অপর একবাহিনী প্রেরণ করে। উভয় বাহিনী মিলে হিমছবাসীদের পরাজিত করে ফেলে। তাদের বহুসংখ্যক লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। হিমছবাসীরা আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পর ফিলিস্তিনের অধিবাসীগণ ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। তারা ফিলিস্তিনের রাজস্ব আদায়কারী সাঈদ বিন আবদুল মালিককে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইয়াযিদ বিন যুলাইমান বিন আবদুল মালিককে তাদের রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করে। ইয়াযিদ প্রথমে ফিলিস্তিনের নেতাদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে বশ করে নেয়। তখন জর্ডানবাসীগণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সুলাইমান বিন হিমশের নেতৃত্বে বিশাল একবাহিনী প্রেরণ করে। সুলাইমানের আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে জর্ডানবাসীগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়।

ইরাক ও খোরাসানে বিদ্রোহ

এ তো গেল সিরিয়ার অবস্থা। ইরাক ও খোরাসানের প্রত্যন্তাঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। ইয়াযিদ ইউসুফ বিন উমরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মনসুর বিন জুমহুরকে ইরাকের শাসক নিয়োগ করে। মনসুর ইরাক পৌঁছে ইউসুফের সময়ের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলে এবং স্বীয় ভ্রাতাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠায়।

খোরাসানের শাসনকর্তা নছর বিন সাইয়ার বিশাল প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি তার ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

এ বিরোধ তখনও চলছিল। ইত্যাবসরে ইয়াযিদ মনসুরকে ইরাকের শাসকের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীযকে প্রেরণ করে। আবদুল্লাহ বিন উমর নছরকে খোরাসানের শাসক পদে বহাল রাখেন। এদিকে খোরাসানেও ছিলেন ঘুমন্ত গোত্রীয় শত্রুতা; এ সুযোগে পুনরায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। জাদী বিন আলী আজদী কিরমানী ছিলেন এক ইয়ামানী নেতা

e-ilm.weebly.com

এবং নছর বিন সাইয়াবের পুরাতন বন্ধু। কোনো এক বিষয়ে সে নছরের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ইয়ামানী গোত্রসমূহের তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাদের দেখাদেখি মুযার গোত্রসমূহও নছরের সাহায্যে এগিয়ে আসে। নছর ছলনার আশ্রয় নিয়ে কিরমানীকে গ্রেফতার করে ফেলে। কিরমানীর সাহায্যকারীগণ তাকে মুক্ত করে নিয়েও যায়। কিরমানীর পলায়নের পর নছর তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে নছরের কথায় বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। বরং নছরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। কিরমানী রবিয়া ও ইয়ামানের জাহিলীয়াতের পুরাতন চুক্তিকে নবায়ন করে ঐ গোত্রসমূহকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়।

নছর ও কিরমানীর মতবিরোধ আব্বাসী আন্দোলনকারীদের জন্য খোরাসানে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয়। ঐ বছর ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ যিনি পিতার মৃত্যুর পর আব্বাসীয় আন্দোলনের ইমাম নিযুক্ত হন, তিনি আবু হাশিম বুকাইর বিন মাহানকে উপদেশনামাসহ খোরাসানে পাঠিয়ে দেয়। সে মার্ভে পৌঁছে আমির উমারাহগণকে সমবেত করে। মুহাম্মদ বিন আমির পর তার পুত্রের বাই'আত গ্রহণ করে ইমামতের ঘোষণাপত্র তাদের শুনিয়ে দেয়। আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন নবনিযুক্ত ইমামকে সমর্থনের লক্ষ্যে এক সম্মানজনক পরিমাণ অর্থ তার খেদমতে পেশ করার জন্য বুকাইরের হাতে দেয়।

ইবনি আসির– ৫/১১৪।

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদের মৃত্যু

মাত্র ৫ মাস ২২ দিন শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ইয়াযিদ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ১২৬ হিজরীর ২০ জিলহজ্জ ইহজগত ত্যাগ করে।

ইবরাহীমের মনোনয়ন ও ক্ষমতাচ্যুত

ইয়াযিদ তারপর তার ভ্রাতা ইবরাহীম বিন ওয়ালিদকে আর তার পর আবদুল আযীয বিন হাজ্জাজ বিন আবদুল মালিককে উত্তারাধিকারী মনোনীত করে। সুতরাং ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ইবরাহীম খলীফা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর্মেনিয়ার শাসক মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান ওয়ালিদকে হত্যা করায় ইয়াযিদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। সুতরাং সে ইয়াযিদের শাসনের শেষ দিকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জাজিরা দখল করে নেয়। ইয়াযিদ কৌশলে জাজিরাকে তার শাসনাধীন ন্যস্ত করে তার বিরোধীতা নিরসন করে ফলে।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান ইবরাহীমের খিলাফতকে সমর্থন করেনি। বরং বিপুলসংখ্যক জাজিরাবাসীকে সাথে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্নাসারীন ও হিমছ দখল করে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। এমতাবস্থায় 'আইনুল হারির' নামক স্থানে ইবরাহীমের বাহিনীর সাথে তার মুকাবিলা হয়। মারওয়ান ইবরাহীমকে খবর দিয়েছিল যে, ওয়ালিদের দু'পুত্র হাকাম ও উসমান যারা তার হাতে বন্দী আছে, তাদেরকে মুক্ত করে দিলে

e-ilm.weebly.com

সে মুকাবিলা করা থেকে বিরত হবে। ইবরাহীম তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উভয়পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে ইবরাহীমের বাহিনী পরাজিত হয়। আর মারওয়ান বিজয়ীর বেশে দামেশকে প্রবেশ করে। এ ঘটনা ১২৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

মারওয়ান ওয়ালিদের দু'পুত্রের মধ্যে যেকোনো একজনকে খলিফা মনোনীত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। কিন্তু তার দামেশকে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। এ কারণে সে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করে। ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ মারওয়ানের আগমনের খবর শুনে দামেশ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মারওয়ান তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরিয়ে আনে।

যেহেতু ইবরাহীমের শাসনামল অতিসংক্ষিপ্ত ছিলো, তদোপুরি তার এ সংক্ষিপ্ত শাসনামলও সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি পায়নি। বিধায় প্রাগৈতিহাসিক তাকে স্বতন্ত্র খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি।

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান

১২৭ হিজরী–১৩২ হিজরী।

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ মারওয়ান বিন হাকামের মাতা এক কুর্দী (উম্মে ওয়ালিদ) দাসী ছিল। ৭০ হিজরীতে তার জন্ম হয়। স্বীয় পিতার পরে আর্মেনিয়া উপদ্বীপে শাসক নিযুক্ত হয়। ইবরাহীমের পরাজিত হয়ে পলায়নপর ১২৭ হিজরীর সফর মাসে দামেশকে খিলাফতের মসনদে আরোহন করে।

মারওয়ান বাহাদুর, কষ্টসহিষ্ণু, বর্ষীয়াণ ও বিচক্ষণ শাসক ছিল। কিন্তু সে ঐ সময় খিলাফত লাভ করেছিলো, যখন উমাইয়া শাসকদের ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। ফলে তার সব ধরনের যোগ্যতা সেসব বিচ্ছিন্ন অবস্থাকে জোড়া-তালি লাগাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন মু'আবিয়ার উত্থান

তার সব ধরনের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণে নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। সর্বপ্রথম কুফাতে মু'আবিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব নামক জনৈক হাশেমী বুজুর্গের আবির্ভাব হয়। কুফার বিপুলসংখ্যক লোক তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। ঐ সময় ইরাকের শাসক ছিল আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীয। তার সম্মানীত বুজুর্গ পিতার কারণে লোকজন তাকে মহব্বত করত। তিনি স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আবদুল্লাহ বিন মু'আবিয়ার শক্তিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেন। ফলে কুফাবাসীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন মু'আবিয়ার স্বীয় প্রাণ রক্ষা করে অনারব ইরাকের দিকে পালিয়ে যায়।

সিরিয়ার বিদ্রোহ ঃ সিরিয়া যেটা নাকি ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথমে হিমছে বিদ্রোহের সূচনা হয়।

e-ilm.weebly.com

মারওয়ান সরাসরি ওখানে পৌঁছে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর হিমছবাসীগণ আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পাঁচ শতাধিক বিদ্রোহীকে প্রকাশ্যে রাজপথে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়। নগর প্রাচীরের কিছুঅংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়। মারওয়ান হিমছে থাকাকালে এ খবর জানতে পারে যে, গোতাবাসীগণ সম্মলিতভাবে দামেশকে হামলা করেছে। সে তাৎক্ষণিকভাবে আবুল আরদের নেতৃত্বে দশহাজার সৈন্যের একবাহিনী প্রেরণ করে। দামেশকবাসীগণ শহরের ফটক বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকে। শাহী ফৌজ আসার খবর শুনে তারা দরজা খুলে বের হয়ে আসে। গোতাবাসীগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে চলে যায়। তাদের নেতা ইয়াযিদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসুরী গ্রেফতার হয়ে নিহত হয়। ঐ সময় ফিলিস্তিন অধিবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাবেত বিন নাঈমকে তাদের নেতা মনোনীত করে তাবারিয়া আক্রমণ করে। মারওয়ান আবুল আরদকে দামেশক থেকে তাবারিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। দামেশক থেকে আবুল আরদের তাবারিয়া পৌঁছার পূর্বেই তাবারীয়াবাসীগণ দুশমনদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। আবুল আরদ তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

সুলাইমান বিন হিশামের বিদ্রোহ

এখনো এ বিদ্রোহ স্তিমিত হয়নি। এমতাবস্থাই দুশমনরা নতুন এক ফিত্না সৃষ্টি করে বসে। কতিপয় কুচক্রী লোক সুলাইমান বিন হিশামের নিকট গিয়ে তাকে সিরিয়াবাসীদের সাহায্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে খিলাফতের দাবীর জন্য প্রলুব্ধ করে। সুলাইমানও তাদের পরামর্শে রাজি হয়ে যায়। আর ৭০ হাজারের মতো লোক সমবেত করে। মারওয়ান ঐ সময় 'কাকীসা' নামক স্থানে অবস্থান করেছিল। সে মুকাবিলার প্রস্তুতিগ্রহণ করে কিন্নাসরীন অভিমুখে যাত্রা করে। 'সানাফ' নামক স্থানে উভয়বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলাইমান পরাজিত হয়। তার বাহিনীর প্রায় ত্রিশহাজার লোক নিহত হয়। সুলাইমান প্রাণভয়ে হিমছে পালিয়ে যায়। এখানে তার অবশিষ্টবাহিনী এসে তার সাথে মিলিত হয়। মারওয়ান তার পেছনে ধাওয়া করে হিমছ অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে মারওয়ানের ওপর সুলাইমানের কতিপয় নেতা রাতে আক্রমণ করে। কিন্তু মারওয়ান তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। সুলাইমান এ পরাজয়ের খবর শুনে তাদাম্মুর চলে যায়। মারওয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে হিমছ দখল করে নেয়।

ইরাকে খারিজীদের উত্থান

বনী উমাইয়াদেরকে এভাবে রিক্তহস্ত হতে দেখে তাদের পুরাতন প্রতিপক্ষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফায়দা লুটার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। খারিজীদল যাহ্হাক বিন কায়েস শাইবানীর নেতৃত্বে সংঘঠিত হয়ে কুফা আক্রমণ করে।

e-ilm.weebly.com

কুফায় শাসক আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীয তাদের মুকাবিলা করে। কিন্তু পরাজিত হয়। তাই সে কুফা ত্যাগ করে আওসাত চলে যায়। যাহ্হাক বিন কায়েস আবদুল্লাহ বিন উমরের পেছনে ধাওয়া করে আওসাত গিয়ে পৌঁছে। কয়েকমাস যুদ্ধ চলার পর আবদুল্লাহ যাহ্হাকের সাথে সন্ধি করে। আর আওসাত যাহ্হাকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ঐ সময় সুলাইমান বিন হিশামও মারওয়ানের আক্রমণের তীব্রতা প্রতিরোধ করতে না পেরে যাহ্হাকের সাথে মিলিত হয়।

ফলে যাহ্হাকের শক্তি বেড়ে যায়। সে মসুলও দখল করে নেয়। মারওয়ান তখন হিমছে অবস্থান করছিলেন। তিনি যাহ্হাকের সফলতার খবর শুনে সে স্বীয় পুত্র জাজিরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন মারওয়ানকে নির্দেশ প্রেরণ করেন। সে যেন যাহ্হাককে জাজিরায় প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়। আবদুল্লাহ বিন মারওয়ান সাতহাজার সৈন্যের একবাহিনী নিয়ে যাহ্হাককে বাঁধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নাসীবাইন নামক স্থানে এসে অবস্থান নেয়। যাহ্হাক মারওয়ানের আগমনের খবর পেয়ে অবরোধ তুলে নেয়। আর মারওয়ানের মুকাবিলার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। কিফরে তুসার নিকটবর্তী স্থানে উভয়দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে যাহ্হাক নিহত হয়। খারিজীরা সাঈদ বিন বাহদাল খাইবারীকে নেতা নিযুক্ত করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে।

খাইবারী মারওয়ানের বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করে দেয়। মারওয়ান মধ্যবর্তী স্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু খাইবারী যখন মারওয়ানের তাবুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, তখন মারওয়ানের কতিপয় প্রাণউৎসর্গকারী সৈনিক খাইবারীকে সাথীদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে ঘেরাও করে হত্যা করে ফেলে। মারওয়ান যুদ্ধের পটপরিবর্তনের খবর পেয়ে পুনরায় ফিরে এসে নতুন করে সৈন্যবিন্যাস করেন।

খারিজীদল খাইবারী নিহত হওয়ার পর শাইবান বিন আবদুল আযিয ইয়াশকুরীকে তাদের নেতা মনোনীত করে মসুল চলে যায়। মারওয়ানও তার পেছনে ধাওয়া করে মসুল পৌঁছেন। দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ চলে। ঐ সময় মারওয়ান ইয়াযিদ বিন উমর বিন হুবাইরাকে ইরাক থেকে খারিজীদের নির্মুল করার জন্য কুফায় প্রেরণ করে। ইবনে হুবাইরা প্রথমে কুফা ও পরে বসরা থেকে খারিজীদের তাড়িয়ে দেয়। ইরাকের বিষয় নিশ্চিন্ত হয়ে ইবনে হুবাইরা আমের বিন জারার নেতৃত্বে সাতহাজার সৈন্যের একবাহিনীকে প্রেরণ করে।

শাইবান আমের বিন জরার আগমনের খবর পেয়ে সে নিজেকে উভয় শত্রুর মাঝে বন্দী করে দেওয়া নির্বোধের কাজ মনে করে মসুল ত্যাগ করে। মারওয়ান আমেরকে তার পেছনে ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করে। 'জিকৃত' নামক স্থানে আমের শাইবানকে ধরে ফেলে। উভয়বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। শাইবান পরাজিত হয়ে সিজিস্তানে দিকে চলে যায়। সেখানেই ১৩০ হিজরীতে সে মৃত্যুবরণ করে।

e-ilm.weebly.com

বলাবাহুল্য, এসব বিপর্যয়ের সময় সুলাইমান বিন হিশাম সর্বদা খারিজী দলের সাথে ছিল। সে তাদেরকে সবধরনের সাহায্য-সহায়তা করেছে। খারিজীদের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবার পর সে তার পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে নৌ-পথে সিন্ধুতে চলে আসে। সরকার পরিবর্তনের পর সে বড় আশা নিয়ে সাককার দরবারে হাজির হয়ে তার হস্তচুম্বন করে। সাককারও তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে। এ সুযোগে যখন সাককার অনুগ্রহের দৃষ্টি তার প্রতি নিবন্ধ ছিল। তখন সাককার কৃতদাস সাদিক কতিপয় উত্তেজনাকর কবিতা আবৃত্তি করে। তখন সাককার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ফলে সে সুলাইমানের দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ফেলে।

ইবনি আসির– ৫/১৬১।

ইয়ামান ও হিজাজে খারিজীদের উত্থান

যে সময় যাহ্হাক ও তার অনুসারীগণ ইরাক ও জাজিরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, ঐ সময় অপর এক খারিজী নেতা আবু হামজা মুখতার বিন আউফ আযাদি হিজাজকে তার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কেন্দ্রে পরিণতি করে রাখে। আবু হামজা ১২৯ হিজরীতে স্বীয় সাতশ' সঙ্গীসাথী নিয়ে হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে আত্মপ্রকাশ করে। হাজীগণ তাদের কালো পতাকা ও বর্শার মাথায় কালো পাগড়ী বাঁধা দেখে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে। মক্কার শাসনকর্তা আবদুল ওয়াহিদ বিন সুলাইমান আবু হামজার সাথে পত্র মারফত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হজ্জের দিনহগুলোতে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হবে না। হাজীদের হজ্জের সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শান্তিপূর্ণভাবে পালনের সুযোগ দেওয়া হবে।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে আবদুল ওয়াহিদ বিন সুলাইমান নীরবে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যায়। আবু হামজা বিনাবাঁধায় মক্কা নগরী দখল করে নেয়। পবিত্র মদীনা নগরীতে পৌঁছে আবদুল ওয়াহিদ মদীনাবাসীদেরকে খারিজীদের ফিত্না সম্পর্কে অবহিত করে। আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ করার আহ্বান জানায়। সুতরাং মদীনাবাসীরা আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে খারিজীদের দমনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। মক্কানগরী দখল করার পর আবু হামজাও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'কাদির' নামক স্থানে উভয়বাহিনী মুখোমুখি হয়। খারিজীদল মদীনা বাসীদের নিকট খবর পাঠায় যে, মদীনাবাসীদের ওপর তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। সে শুধু বনী উমাইয়াদের মুকাবিলার জন্য আসছে। সুতরাং তরা যেন মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু মদীনাবাসীগণ দীর্ঘসময় থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। খারিজীরা ছিল রণবীর। মদীনাবাসীগণ শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। সহস্রাধিক মদীনাবাসী নিহত হয়। মদীনার এমন কোনো গৃহ ছিলো না যে, ঐ ঘরে শোকের মাতম প্রকাশ পায়নি। এরপর আবু হামজা মদীনাতে প্রবেশ করে দীর্ঘ এক ভাষণে বনী উমাইয়াদের কুৎসা ও নিজদলের সৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা

e-ilm.weebly.com

করে। আবদুল ওয়াহিদ মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। আবু হামজা মদীনা দখল করার পর মারওয়ানের মুকাবিলা করার জন্য সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। মারওয়ান এ খবর শুনে আবদুল মালিক বিন মুহাম্মদ বিন আতীয়ার নেতৃত্বে ৪ হাজার নির্বাচিত সৈন্য দিয়ে আবু হামজাকে দমন করার জন্য পাঠায়। 'ওয়াদিউল কোরা' নামক স্থানে উভয়বাহিনী মুখোমুখি হয়। সিরিয়াবাহিনী খারিজীদের পরাজিত করে দেয়। স্বয়ং আবু হামজাও নিহত হয়। খারিজীদলের অবশিষ্টবাহিনী পলায়ন করে মদীনাতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু আবদুল মালিক মদীনা পৌঁছে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে।

খারিজীদের অপর দলের নেতা আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া সত্যপন্থী ছিল। সে ইয়ামানের সানাতে অবস্থান করত। আবু হামজা তারই দলের প্রচারক ছিল। আবদুল মালিক একমাস মদীনাতে অবস্থান করার পর সানা অভিমুখে যাত্রা করে। আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল মালিকের আসার খবর শুনে তার সাথীদের নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। যুদ্ধে ইবনে ইয়াহইয়া নিহত হয়। আবদুল মালিক তার কর্তিত মাথা মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

ইবনি আসির- ১৪৬ পৃ/ ৫ খ

খোরাসানে পূর্ব শত্রুতার উত্থান

উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে যখন বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল, তখন খোরাসানের অবস্থা মারাত্মক বিপদজনক ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে পুরাতন ঘুমন্ত গোত্রীয় শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খোরাসানের শাসনকর্তা নছর বিন সাইয়ার মুযার গোত্রের নেতা ছিলেন। ঐ উভয় নেতার ছত্রছায়ায় মুযারী ও ইয়ামানী একে অপরকে অবজ্ঞা ও অপমান করতে লিপ্ত হত। সুতরাং জাহিলীয়তের যুগের প্রাচীন চুক্তি নবায়ন করা হয়। এ কারণে রাবিয়া গোত্রও ইয়ামানী গোত্রের মিত্রবন্ধন ছিল। তাদের নেতা ছিল শাইবান বিন সালমা হার্‌বী।

আবু মুসলিম খোরাসানী

মূলতঃ আবু মুসলিম খোরাসানী এক অনারব বংশধর ও ফাসী নবযুবক ছিল। খোরাসানের রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করে সে রাজনীতির অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। আবু মুসলিম কুফার শাসক বুকাইর বিন মাহানের কৃতদাস ছিল। বুকাইর তার যোগ্যতা দেখে তাকে আব্বাসী আন্দোলনের নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়। তারপর তাকে 'হামীমা' নামক স্থানে ইবরাহীমের নিকট উপহার হিসেবে প্রেরণ করে। ১২৮ হিজরীতে ইবরাহীম আবু মুসলিমকে নেতা মনোনীত করে খোরাসানে প্রেরণ করে। আর তাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দান করে।

"তুমি আমার পরিবারের লোক হয়েছ। আমার উপদেশ সঠিকভাবে স্মরণ রাখবে। ইয়ামনের গোত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আর তাদেরকে নিজের সাথে

e-ilm.weebly.com

মিলিয়ে রাখবে। তাদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করবে। তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনে তাদের সাহায্যে সফলতা লাভ করতে পারবে। রবিয়া গোত্রের ওপর আস্থা রাখবে না। আর নছরকে তোমার প্রাণের শত্রু মনে করবে। অধিকন্তু যার ওপর তোমার সন্দেহ হয়, তাকেই হত্যা করে ফেলবে। আর যখন যেখানেই হোক কোনো আরবী ভাষা ব্যবহারকারীকে, মুযার গোত্রের লোক হোক বা ইয়ামানী হোক, জীবিত রাখবে না। ইবনি আসির– ৫/১৩০।

আবু মুসলিম খোরাসানে পৌছে সর্বপ্রথম একবছর পর্যন্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। আর ঐ সময়ের মধ্যে সে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেয়। ১২৬ হিজরীতে ইমাম ইবরাহীমের পক্ষ থেকে তাকে 'জিল্ল' ও 'সাহাব' নামে দুটি পতাকা দেওয়া হয় এবং প্রকাশ্যে আব্বাসী আন্দোলনের ঘোষণাদানের জন্য আদিষ্ট হোন।

আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রকাশ্য আহ্বান

১২৯ হিজরীর ২৫ শাবান বৃহস্পতিবার দিনকে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আবু মুসলিম 'স্বাধীনতা দিবস'রূপে উৎযাপন করে। 'সফীদঞ্জ' নামক স্থানে সকল আন্দোলনকারী কালো পোশাক পরিধান করে সমবেত হয়। সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। আবু মুসলিম নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে 'জিল্ল' ও 'সাহাব'কে উপস্থিত জনতার মাঝে উত্তোলন করে বলেন–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

অর্থাৎ ঐ সব লোকদেরকে যারা কাফিরের সাথে লড়াই করছে তাদেরকে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

বিভিন্ন গোত্র ও রাজ্যে বসবাসকারী আব্বাসী বংশধর যারা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য দলে দলে সমবেত হয়েছিল, তারা সকলে সারারাত তাকবীর ধ্বনী দিতে থাকে। 'জিল্ল' ও 'সাহাব' পতাকাদ্বয় দ্বারা এ শুভলক্ষণ বের করা হয়েছে যে, আব্বাসী রাজত্বের ভিত্তি বৃষ্টির মতো সমস্ত ভূমি আবৃত করে নেবে। আর চারার মতো সব যুগে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর এ 'সফীদঞ্জ' শহরকেই আব্বাসী খেলাফতের অবস্থায়ী রাজধানী নির্ধারণ করা হয় এবং দূর্গ ও নগরীর প্রাচীর মেরামত করে মজবুত করা হয়।

ইবনি আসির– ৫/১৩৩-৩৪

এ সব প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর আবু মসুলিম নছর বিন সাইয়ারকে একটি পত্র লেখে, তাতে শুধু তাকে নছর বলে সম্বোধন করা হয়। আর কুরআনের কতিপয় আয়াত লেখা হয়। যাতে রাসূল অস্বীকারীদেরকে ভয়প্রদর্শন করা হয়েছে।

নছর ঐ সময় আবু মুসলিমের গুরুত্ব অনুভব করে। তার মুকাবিলার জন্য একবাহিনী নিয়ে যাত্রা করে। কিন্তু আবু মুসলিম তাকে পরাজিত করে বিতাড়িত

e-ilm.weebly.com

করে দেয়। তার এ সাফল্যে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মানুষ স্রোতের মতো এসে তার সাথে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে।

ঐ সময় মার্ভের নিকট নছর ও কিরমানীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আবু মুসলিম স্বীয় বাহিনী নিয়ে উভয়দলের মাঝখানে অবস্থান নেয়। তার পর সে কিরমানীকে সাহায্য করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়।

নছর কিরমানীর নিকট খবর পাঠায় যে, আবু মুসলিমের প্রতারনার ফাঁদে পা দেবে না। সে সব আরববাসীর দুশমন। তবে উত্তম হল আমাদের উভয়ের পরস্পরে সন্ধি চুক্তি করে নেওয়া। কিরমানী এ প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য এগিয়ে এলে নছর প্রতারণা করে তাকে হত্যা করে ফেলে। কিরমানী নিহত হওয়ার পর তার পুত্র আলী নছরের সাথে মুকাবিলার জন্য ময়দানে আসে।

আরব গোত্রসমূহের ঐক্য ও মতবিরোধ

ঐ সময় আবু মুসলিমের আহ্বান খুব দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ খোরাসানে এসে আব্বাসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অবগত হত। ঘটনাচক্রে একবার মার্ভ থেকে এক প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। তারা ফিক্‌হসংক্রান্ত কতিপয় বিষয় আবু মুসলিমকে জিজ্ঞেস করে। আবু মুসলিম বলল, ঐ সবের মধ্যে কী আছে? আমার সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাই কর্তব্য। প্রতিনিধিদল জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কী লাভ? এতদুভয় আমির যতক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, ততক্ষন আপনার আন্দোলন ঝলমল করবে। তারা উভয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়ে গেলে আপনার আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবু মুসলিমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, আমি তাদের উভয়কে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব। আগন্তুক প্রতিনিধিদল নছরের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে। শাইবান বিন মাসলামা রবিয়া গোত্রের সরদারের সাথেও আলোচনা করে। এরা তখনও কিরমানীর সাহায্যকারী ছিল। আবু মুসলিম তাদের দৃঢ়তা সম্পর্কে অবগত হয়ে ইয়াহইয়া বিন নাঈম শাইবানীর প্রচেষ্টায় নছর শাইবানী ও আলী বিন কিরমানী পরস্পরে সন্ধি চুক্তি করে নেয়।

আবু মুসলিমের মার্ভ দখল

আবু মুসলিম আরব গোত্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার খবর শুনে তার ধারণা হল, আমার পাতানো খেলা তো হয়ে যাচ্ছে। সে আলী বিন কিরমানীকে নছর থেকে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করে তোলে। আলী আবু মুসলিমের ফাঁদের পড়ে যায়। আর আরব গোত্রসমূহের ঐক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। ইবনি আসির– ৫/১৩৭-৩৮।

e-ilm.weebly.com

আবু মুসলিম আলী বিন কিরমানীকে সাথে নিয়ে নছর বিন সাইয়াবের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তার নতুন কেন্দ্র মাখওয়ান থেকে মার্ভ অভিমুখে যাত্রা করে। নছরকে পরাজিত করে আবু মুসলিম মার্ভ দখল করে নেয়। নছর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা ১৩০ হিজরীতে সংঘঠিত হয়।

মার্ভ দখল করার পর আবু মুসলিমের শক্তি আরো সুসংহত হয়। তখন না তার রবিয়া গোত্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে আর না ইয়ামানীদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং সে অতি দ্রুত প্রথমে শাইবান বিন সালামাহ হারুবীকে হত্যা করে ফেলে। তারপর আলী বিন কিরমানী নিকট আবেদন করে, সে যেন তার দলের খ্যাতনামা নেতাদের তালিকা প্রকাশ করে। তাহলে তাদেরকে সাফল্য লাভের স্বীকৃতিস্বরূপ পর্যাপ্ত উপহার দেওয়া হবে। আলী সকলের নাম প্রকাশ করে দেয়। আবু মুসলিম আলীসহ সকলকে আহ্বান করে ডেকে এসে হত্যা করে ফেলে। ইবনি আসির- ১৪৪/ ৫

খোরাসান ও ইরাক দখল

আবু মুসলিমের মার্ভ দখলের খবর শোনামাত্রই খোরাসানবাসীগণ তার পতাকার তলে এসে যায়। সে বিজীতএলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করে। আর কাহ্তাবা ইব্ন শাবীবকে অনারব ইরাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করে। কাহতাবা সামান্য বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে রায়, ইস্পাহান ও নাহাওয়ান্দ দখল করে নেয়। এরপর কাহতাবা আবু আউন আবদুল মালিককে শহ্‌ররোজের দিকে প্রেরণ করে।

মারওয়ানের পক্ষ থেকে ওখানে উসমান বিন সুফিয়ান নিযুক্ত ছিল। আবু আউন উসমানকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়ে মসুলে পৌঁছে অবস্থান নেয়। কাহতাবা আবু আউনের সাহায্যে আরো অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করে। তখন তার সৈন্যসংখ্যা ত্রিশহাজারে এসে পৌঁছে।

মারওয়ানের অক্ষমতা

এসব খবর মারওয়ানের অজানা ছিল না। যে সময় নছর ও কিরমানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে আর আবু মুসলিম স্বীয় বাহিনী নিয়ে উভয়বাহিনীর মাঝে অবস্থান নেয়, তখন নছর আবু মুসলিমের অবস্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে মারওয়ানকে অবহিত করে।

اری بن الرماد ومیض نار + واخشی ان یکون لها خرام -
فان النار بالعودین یذکی + وان الحرب مبداه کلام

فعلت من التعجب لیت شعری + اایقاظ امیة امر ینام

অর্থাৎ আমি মরুভূমির মাঝে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখছি ভয় হচ্ছে–, না জানি তা কখন জ্বলে ওঠে। দুটি কাঠ দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়। আর কথার মাধ্যমে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

e-ilm.weebly.com

আমি বিস্ময়ের সাথে বলছি, হায়! আমি যদি জানতাম, বনী উমাইয়াগণ জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু মারওয়ান তখন খারিজীদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কোনো সাহায্যই করতে পারেনি। ঐ সময় জনৈক দূত হামীমা থেকে ইমাম ইবরাহীমের চিঠি নিয়ে আবু মুসলিমের নিকট খোরাসান যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে গ্রেফতার হয়ে যায়। উক্ত পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ।

আবু মুসলিম নছর ও কিরমানীর মতবিরোধের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাবে আর খোরাসানে কোনো আরবীভাষীকে জীবিত রাখবে না।

ইবনি আসির– ১৩৬/৫; ওয়াল আখবারুল আউয়াল– ৩৪ পৃঃ

ঐ পত্র মারওয়ানের হস্তগত হবার পর সে ইমাম ইবরাহীমকে বন্দী করে ফেলে। এ বন্দী অবস্থায়ই তার ইনতিকাল হয়। ইমাম ইবরাহীম ইনতিকালের পূর্বে তার ভাই আবুল আব্বাস সাককাফে তার প্রতিনিধিত মনোনীত করে যায়। তাকে উপদেশ দেয়, সে যেন সকল বংশধরদের সাথে নিয়ে কুফায় চলে যায়। আবু আব্বাস তার উপদেশ পালন করে স্বীয় আহ্বায়ক আবু সালমা খালিদের নিকট গোপনে আশ্রয় নেয়।

ইরাক দখল

অনারব ইরাক দখল করার পর কাহতাবা আবু মুসলিমের 'আদেশে আরব ইরাকের প্রতি অগ্রসর হয়। তখন ঐ স্থানের শাসক ছিলো ইয়াযিদ বিন উমর বিন হুরাইরা সে তার বাহিনী নিয়ে কাহতাবাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। ফোরাত নদীর তীরে উভয়বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইবনে হুবাইরাহ পরাজিত হয়ে আওসাতে চলে যায়। ঐ যুদ্ধে কাহতাবা নিখোঁজ হয়ে যায়। তখন তার পুত্র হাসান বিন কাহতাবাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

আব্বাসী খলিফার সিংহাসনে আরোহণ

তখন কুফায় আব্বাসীদের পতাকা উড়ানো হয়। ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন আলী সাফ্‌ফাহের হাতে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়। তিনি কুফার জামে মসজিদে আব্বাসী খিলাফতের প্রথম খলিফা হিসেবে ভাষণ দেন।

ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাহতাবা আবু আউনকে মসুলে অবস্থান করার আদেশ করেছিল। মারওয়ান বিন মুহাম্মদ যখন দেখলেন, মস্ত বড় বিপদ মাথার ওপর এসে পৌঁছেছে। তখন তিনি ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যর বিশাল একবাহিনী নিয়ে হুলওয়ান থেকে অগ্রসর হয়ে জাব নদীর তীরে অবস্থান নেন।

e-ilm.weebly.com

বাইআত গ্রহণে অনুষ্ঠান শেষ করে আবুল আব্বাস সক্কাফী স্বীয় চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আলীর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী দিয়ে মারওয়ান বিন মুহাম্মদকে নির্মুল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আবু আউন প্রথমে মারওয়ানের মুকাবিলার উদ্দেশ্য সারিবদ্ধ হয়। ১৩২ হিজরীর ২ জমাদিউল আখির তারিখে উভয়বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে শুরু হয়। যুদ্ধে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ পরাজিত হয়। বহুসংখ্যক উমাইয়া বংশধর আব্বাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। যতলোক নিহত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি নদীতে ডুবে মারা পড়েছে।

মারওয়ানের পলায়ন ও হত্যা

ঐ যুদ্ধের ফলাফল উমাইয়া শাসকদের ভাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছে। মারওয়ান পলায়ন করে মসুলে এসে পৌছে। পরে মসুল থেকে হাব্‌রান, কিন্‌নাসরীন, হিমছ, দামেশক, জর্ডান ও ফিলিস্তিন হয়ে মিশর সীমান্তে এসে পৌছে। মারওয়ান যেখানে পৌছত আব্বাসী বাহিনীও তার পেছনে পেছনে সেখানে পৌছত। তাকে নিঃশ্বাস ফেলারও সুযোগ দিত না। অবশেষে মিশরের বুসীর নামক গীর্জায় তাকে ঘেরাও করে ফেলে। মারওয়ান বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে নিহিত হয়। এ ঘটনা ২৮ জিলহজ ১৩২ হিজরীতে সংঘঠিত হয়। তখন মারওয়ানের বয়স ছিল ৬২ বছর। সে ৫ বছর ১০ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল। মারওয়ানের মৃত্যুর সাথে সাথে উমাইয়া শাসনের নিভু নিভু চেরাগ চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে যায়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر -

সমাপ্ত

e-ilm.weebly.com